কিশোর থ্রিলার

তিন গোয়েন্দা

ভলিউম ৯৩

শামসুদ্দিন নওয়াব

সেবা প্রকাশনী

ভলিউম-৯৩

তিন গোয়েন্দা

শামসুদ্দীন নওয়াব

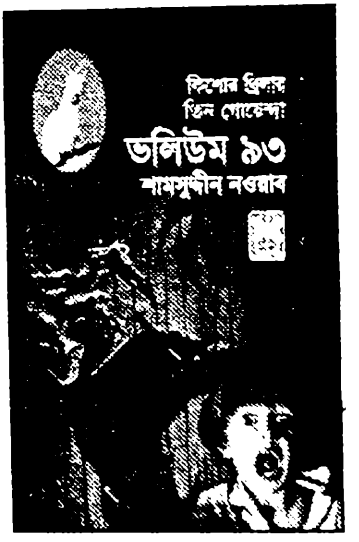

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ২০০৭

রচনা: বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
e-mail: sebaprok@citechco.net

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Volume-93
TIN GOYENDA SERIES
By: Shamsuddin Nawab

একচল্লিশ টাকা

তিন গোয়েন্দা

হ্যালো, কিশোর বন্ধুরা—
আমি কিশোর পাশা বলছি, আমেরিকার রকি বিচ থেকে।
জায়গাটা লস অ্যাঞ্জেলেসে, প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে,
হলিউড থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে।
যারা এখনও আমাদের পরিচয় জানো না, তাদের বলছি,
আমরা তিন বন্ধু একটা গোয়েন্দা সংস্থা খুলেছি, নাম:
তিন গোয়েন্দা।
আমি বাঙালী। থাকি চাচা-চাচীর কাছে।
দুই বন্ধুর একজনের নাম মুসা আমান, ব্যায়ামবীর,
আমেরিকান নিগ্রো; অপরজন আইরিশ আমেরিকান,
রবিন মিলফোর্ড, বইয়ের পোকা।
একই ক্লাসে পড়ি আমরা।
পাশা স্যালভেজ ইয়ার্ডে লোহা-লক্কড়ের জঞ্জালের নীচে
পুরানো এক মোবাইল হোম-এ আমাদের হেডকোয়ার্টার।

তিনটি রহস্যের সমাধান করতে চলেছি এবার—
এসো না, চলে এসো আমাদের দলে!

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া; কোনওভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা; এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

পিশাচের আস্তানা/শামসুদ্দীন নওয়াব ৭–৩৮
উড়ন্ত রবিন/শামসুদ্দীন নওয়াব ৩৯–১২৩
অন্য ভুবনের কিশোর/শামসুদ্দীন নওয়াব ১২৪–১৫৩

তিন গোয়েন্দার আরও বই:

তি. গো. ভ. ১/১ (তিন গোয়েন্দা, কঙ্কাল দ্বীপ, রূপালী মাকড়সা)
তি. গো. ভ. ১/২ (ছায়াশ্বাপদ, মমি, রত্নদানো) ৫৯/-
তি. গো. ভ. ২/১ (প্রেতসাধনা, রক্তচক্ষু, সাগর সৈকত)
তি. গো. ভ. ২/২ (জলদস্যুর দ্বীপ-১,২, সবুজ ভূত)
তি. গো. ভ. ৩/১ (হারানো তিমি, মুক্তোশিকারী, মৃত্যুখনি) ৫৩/-
তি. গো. ভ. ৩/২ (কাকাতুয়া রহস্য, ছুটি, ভূতের হাসি)
তি. গো. ভ. ৪/১ (ছিনতাই, ভীষণ অরণ্য ১,২) ৫০/-
তি. গো. ভ. ৪/২ (ড্রাগন, হারানো উপত্যকা, গুহামানব) ৪৮/-
তি. গো. ভ. ৫ (ভীতু সিংহ, মহাকাশের আগন্তুক, ইন্দ্রজাল) ৫৬/-
তি. গো. ভ. ৬ (মহাবিপদ, খেপা শয়তান, রত্নচোর) ৪৬/-
তি. গো. ভ. ৭ (পুরনো শত্রু, বোম্বেটে, ভূতুড়ে সুড়ঙ্গ) ৫৬/-
তি. গো. ভ. ৮ (আবার সম্মেলন, ভয়ালগিরি, কালো জাহাজ) ৫২/-
তি. গো. ভ. ৯ (পোচার, ঘড়ির গোলমাল, কানা বেড়াল)
তি. গো. ভ. ১০ (বাক্সটা প্রয়োজন, খোঁড়া গোয়েন্দা, অথৈ সাগর ১) ৫৪/-
তি. গো. ভ. ১১ (অথৈ সাগর ২, বুদ্ধির ঝিলিক, গোলাপী মুক্তো)
তি. গো. ভ. ১২ (প্রজাপতির খামার, পাগল সংঘ, ভাঙা ঘোড়া)
তি. গো. ভ. ১৩ (ঢাকায় তিন গোয়েন্দা, জলকন্যা, বেগুনী জলদস্যু) ৪৮/-
তি. গো. ভ. ১৪ (পায়ের ছাপ, তেপান্তর, সিংহের গর্জন)
তি. গো. ভ. ১৫ (পুরনো ভূত, জাদুচক্র, গাড়ির জাদুকর)
তি. গো. ভ. ১৬ (প্রাচীন মূর্তি, নিশাচর, দক্ষিণের দ্বীপ)
তি. গো. ভ. ১৭ (ঈশ্বরের অশ্রু, নকল কিশোর, তিন পিশাচ)
তি. গো. ভ. ১৮ (খাবারে বিষ, ওয়ার্নিং বেল, অবাক কাণ্ড)
তি. গো. ভ. ১৯ (বিমান দুর্ঘটনা, গোরস্তানে আতঙ্ক, রেসের ঘোড়া) ৫৬/-
তি. গো. ভ. ২০ (খুন, স্পেনের জাদুকর, বানরের মুখোশ) ৫০/-
তি. গো. ভ. ২১ (ধূসর মেরু, কালো হাত, মূর্তির হুঙ্কার)
তি. গো. ভ. ২২ (চিতা নিরুদ্দেশ, অভিনয়, আলোর সংকেত)
তি. গো. ভ. ২৩ (পুরানো কামান, গেল কোথায়, শুকিমুরো কর্পোরেশন) ৪৮/-
তি. গো. ভ. ২৪ (অপারেশন কক্সবাজার, মায়া নেকড়ে, প্রেতাত্মার প্রতিশোধ) ৪৫/-
তি. গো. ভ. ২৫ (জিনার সেই দ্বীপ, কুকুরখেকো ডাইনী, গুপ্তচর শিকারী)
তি. গো. ভ. ২৬ (ঝামেলা, বিষাক্ত অর্কিড, সোনার খোঁজে)
তি. গো. ভ. ২৭ (ঐতিহাসিক দুর্গ, রাতের আঁধারে, তুষার বন্দি)
তি. গো. ভ. ২৮ (ডাকাতের পিছে, বিপজ্জনক খেলা, ভ্যাম্পায়ারের দ্বীপ)
তি. গো. ভ. ২৯ (আরেক ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন, মায়াজাল, সৈকতে সাবধান)
তি. গো. ভ. ৩০ (নরকে হাজির, ভয়ঙ্কর অসহায়, গোপন ফর্মূলা)
তি. গো. ভ. ৩১ (মারাত্মক ভুল, খেলার নেশা, মাকড়সা মানব) ৪৭/-
তি. গো. ভ. ৩২ (প্রেতের ছায়া, রাত্রি ভয়ঙ্কর, খেপা কিশোর)
তি. গো. ভ. ৩৩ (শয়তানের থাবা, পতঙ্গ ব্যবসা, জাল নোট)

তি. গো. ভ. ৩৪ (যুদ্ধ ঘোষণা, দ্বীপের মালিক, কিশোর জাদুকর)	
তি. গো. ভ. ৩৫ (নকশা, মৃত্যুঘড়ি, তিন বিঘা)	
তি. গো. ভ. ৩৬ (টক্কর, দক্ষিণ যাত্রা, গ্রেট রবিনিয়োসো)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ৩৭ (ভোরের পিশাচ, গ্রেট কিশোরিয়োসো, নিখোঁজ সংবাদ)	
তি. গো. ভ. ৩৮ (উচ্ছেদ, ঠগবাজি, দীঘির দানো)	৪৪/-
তি. গো. ভ. ৩৯ (বিষের ভয়, জলদস্যুর মোহর, চাঁদের ছায়া)	
তি. গো. ভ. ৪০ (অভিশপ্ত লকেট, গ্রেট মুসাইয়োসো, অপারেশন অ্যালিগেটর)	
তি. গো. ভ. ৪১ (নতুন স্যার, মানুষ ছিনতাই, পিশাচকন্যা)	৪৮/-
তি. গো. ভ. ৪২ (এখানেও ঝামেলা, দুর্গম কারাগার, ডাকাত সর্দার)	৪৪/-
তি. গো. ভ. ৪৩ (আবার ঝামেলা, সময় সুড়ঙ্গ, ছদ্মবেশী গোয়েন্দা)	
তি. গো. ভ. ৪৪ (প্রত্নসন্ধান, নিষিদ্ধ এলাকা, জবরদখল)	৪৭/-
তি. গো. ভ. ৪৫ (বড়দিনের ছুটি, বিড়াল উধাও, টাকার খেলা)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৪৬ (আমি রবিন বলছি, উল্কি রহস্য, নেকড়ের গুহা)	৪১/-
তি. গো. ভ. ৪৭ (নেতা নির্বাচন, সি সি সি, যুদ্ধযাত্রা)	৪১/-
তি. গো. ভ. ৪৮ (হারানো জাহাজ, শ্বাপদের চোখ, পোষা ডাইনোসর)	
তি. গো. ভ. ৪৯ (মাছির সার্কাস, মঙ্কভীতি, ডীপ ফ্রিজ)	৪৪/-
তি. গো. ভ. ৫০ (কবরের প্রহরী, তাসের খেলা, খেলনা ভালুক)	
তি. গো. ভ. ৫১ (পেঁচার ডাক, প্রেতের অভিশাপ, রক্তমাখা ছোরা)	
তি. গো. ভ. ৫২ (উড়ো চিঠি, স্পাইডারম্যান, মানুষখেকোর দেশে)	৪০/-
তি. গো. ভ. ৫৩ (মাছেরা সাবধান, সীমান্তে সংঘাত, মরুভূমির আতঙ্ক)	
তি. গো. ভ. ৫৪ (গরমের ছুটি, স্বর্গদ্বীপ, চাঁদের পাহাড়)	
তি. গো. ভ. ৫৫ (রহস্যের খোঁজে, বাংলাদেশে তিন গোয়েন্দা, টাক রহস্য)	
তি. গো. ভ. ৫৬ (হারজিত, জয়দেবপুরে তিন গোয়েন্দা, ইলেক্ট্রনিক আতঙ্ক)	
তি. গো. ভ. ৫৭ (ভয়াল দানব, বাঁশিরহস্য, ভূতের খেলা)	
তি. গো. ভ. ৫৮ (মোমের পুতুল, ছবিরহস্য, সুরের মায়া)	
তি. গো. ভ. ৫৯ (চোরের আস্তানা, মেডেল রহস্য, নিশির ডাক)	
তি. গো. ভ. ৬০ (ওটকি বাহিনী, ট্রাইম ট্র্যাভেল, ওটকি শত্রু)	৩৬/-
তি. গো. ভ. ৬১ (চাঁদের অসুখ, ইউএফও রহস্য, মুকুটের খোঁজে তি. গো.)	৩৬/-
তি. গো. ভ. ৬২ (যমজ ভূত, ঝড়ের বনে, মোমপিশাচের জাদুঘর)	
তি. গো. ভ. ৬৩ (ড্রাকুলার রক্ত, সরাইখানায় ষড়যন্ত্র, হানাবাড়িতে তিন গোয়েন্দা)	
তি. গো. ভ. ৬৪ (মায়াপথ, হীরার কার্তুজ, ড্রাকুলা-দুর্গে তিন গোয়েন্দা)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৬৫ (বিড়ালের অপরাধ+রহস্যভেদী তিন গোয়েন্দা+ফেরাউনের কবরে)	৩৬/-
তি. গো. ভ. ৬৬ (পাথরে বন্দী+গোয়েন্দা রোবট+কালো পিশাচ)	
তি. গো. ভ. ৬৭ (ভূতের গাড়ি+হারানো কুকুর+গিরিগুহার আতঙ্ক)	
তি. গো. ভ. ৬৮ (টেরির দানো+বাবলি বাহিনী+ওটকি গোয়েন্দা)	
তি. গো. ভ. ৬৯ (পাগলের গুপ্তধন+দুখী মানুষ+মমির আর্তনাদ)	
তি. গো. ভ. ৭০ (পার্কে বিপদ+বিপদের গন্ধ+ছবির জাদু)	৪৬/-
তি. গো. ভ. ৭১ (পিশাচবাহিনী+রত্নের সন্ধানে+পিশাচের থাবা)	
তি. গো. ভ. ৭২ (ডিনদেশী রাজকুমার+সাপের বাসা+রবিনের ডায়েরি)	৪৭/-
তি. গো. ভ. ৭৩ (পৃথিবীর বাইরে+ট্রেইন ডাকাতি+ভূতুড়ে ঘড়ি)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৭৪ (কাওয়াই দ্বীপের মুখোশ+মহাকাশের কিশোর+ব্রাউনভিলে গণ্ডগোল)	৫১/-
তি. গো. ভ. ৭৫ (কালো ডাক+সিংহ নিরুদ্দেশ+ফ্যান্টাসিল্যান্ড)	৪১/-
তি. গো. ভ. ৭৬ (মৃত্যুর মুখে তিন গোয়েন্দা+পোড়াবাড়ির রহস্য+লিলিপুট-রহস্য)	৪১/-
তি. গো. ভ. ৭৭ (চ্যাম্পিয়ান গোয়েন্দা+ছায়াসঙ্গী+পাতাল ঘরে তিন গোয়েন্দা)	৫০/-

তি. গো. ভ. ৭৮	(চট্টগ্রামে তিন গোয়েন্দা+সিলেটে তিন গোয়েন্দা+মায়াশহর)	
তি. গো. ভ. ৭৯	(লুকানো সোনা+পিশাচের ঘাঁটি+তুষার মানব)	
তি. গো. ভ. ৮০	(মুখোশ পরা মানুষ+অদৃশ্য রশ্মি+গোপন ডায়েরি)	
তি. গো. ভ. ৮১	(কালোপর্দার অন্তরালে+ভয়াল শহর+সুমেরুর আতঙ্ক)	৪৭/-
তি. গো. ভ. ৮২	(বনদস্যুর কবলে+গাড়ি চোর+পুতুল-রহস্য)	৪৪/-
তি. গো. ভ. ৮৩	(খনিতে বিপদ!+গুহা-রহস্য+কিশোরের নোটবুক)	৪৪/-
তি. গো. ভ. ৮৪	(মৃত্যুগুহায় বন্দি+বিষাক্ত ছোবল+উটকি রাজকুমার)	৪১/-
তি. গো. ভ. ৮৫	(গুপ্তধনের সন্ধানে+শয়তানের জলাভূমি+সেরা গোয়েন্দা)	
তি. গো. ভ. ৮৬	(পাহাড়ে বন্দি+বারমুডা অভিযান+রহস্যের হাতছানি)	
তি. গো. ভ. ৮৭	(মমিরহস্য+ভাইরাস আতঙ্ক+তালিকা-রহস্য)	৪৯/-
তি. গো. ভ. ৮৮	(পিছনে কে?+খুনে তান্ত্রিক+কালো আলখেল্লা)	
তি. গো. ভ. ৮৯	(বোম্বেটের সিন্দুক+মারাত্মক বিপদ+হারানো তলোয়ার)	
তি. গো. ভ. ৯০	(হিমগিরিতে সাবধান!+সাগরে শঙ্কা+খেপা জাদুকর)	৪৪/-
তি. গো. ভ. ৯১	(ক্যামেরার চোখ+ভ্যাম্পায়ারের ছায়া+ভূতুড়ে বাড়ি)	৪১/-
তি. গো. ভ. ৯২	(জিন্দালাশের পিছে+অগ্নিগিরি অভিযান+গবলিনের কবলে)	৫০/-
তি. গো. ভ. ৯৩	(পিশাচের আস্তানা+উড়ন্ত রবিন+অন্য ভুবনের কিশোর)	৪১/-
তি. গো. ভ. ৯৪	(সময়সুড়ঙ্গে আবার+হিমপিশাচের কবলে+ছায়ামানবী)	৪১/-
তি. গো. ভ. ৯৫	(মরণসঙ্কেত+জলদস্যুর গুপ্তধন+গোলমাল)	
তি. গো. ভ. ৯৬	(সাগরতীরে তিন গোয়েন্দা+দ্বীপরহস্য+দুর্গরহস্য)	
তি. গো. ভ. ৯৭	(ভেল্কিবাজ+মঙ্গলের অতিথি+প্রেতচক্র)	
তি. গো. ভ. ৯৮	(ঝড়ের দ্বীপ+জিন্দালাশের মুখোমুখি+তুষারগিরি-রহস্য)	
তি. গো. ভ. ৯৯	(রুদ্র সাগর+মূর্তি চোর+মহাকাশের দূত)	
তি. গো. ভ. ১০০	(নিঝুমপুরের কাণ্ড+তুষারদানো+খুলিগুহার রহস্য)	
তি. গো. ভ. ১০১	(প্রেত বৈমানিক+ছায়া কালো কালো+বাতিঘরের পিশাচ)	
তি. গো. ভ. ১০২	(গুপ্তদূত+গ্রহান্তরের বন্ধু+জাদুঘরের দানব)	৩৭/-
তি. গো. ভ. ১০৩	(মাদক-রহস্য+গুপ্তধনের নকশা+ভয়ের মুখোশ)	
তি. গো. ভ. ১০৩/২	(অশুভ পাথর+দানবের চোখ+হারানো মমি)	৩৬/-
তি. গো. ভ. ১০৪	(নিখোঁজ মেয়ে+মৃত নগরী+বনের খাঁচায়)	৪৪/-
তি. গো. ভ. ১০৪/২	(গোরস্থানে সাবধান!+নেকড়ের বনে+খাবারচোর)	৪৪/-
তি. গো. ভ. ১০৫	(ভূতুড়ে ট্রেন+ইয়েতি-রহস্য+ক্যাপ্টেন কিডের গুপ্তধন)	৪৪/-
তি. গো. ভ. ১০৫/২	(রকেট-রহস্য+উটকির পেট শো+পান্না-রহস্য)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ১০৬	(ভূতুড়ে শহর+ রোবট-রহস্য+পান্না-রহস্য)	৪৭/-
তি. গো. ভ. ১০৬/২	(লাটসাহেব+পাজি বিড়াল+ভৌতিক দুর্গ)	৫৯/-
তি. গো. ভ. ১০৭	(যন্ত্রপিশাচ+বিভীষণের জাগরণ+কঙ্কাল-রহস্য)	৫০/-
তি. গো. ভ. ১০৭/২	(টেরোড্যাকটিনের থাবা+পাহাড়ী দানো+রাজকুমারের খোঁজে)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ১০৮	(অভিশপ্ত হোটেল+সবুজ মৃত্যু+হারকিউলিস-রহস্য)	৪১/-
তি. গো. ভ. ১০৮/২	(বনভূমির আতঙ্ক+বামন ভূত+ড্রাকুলার আলখেল্লা)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ১০৯	(ওয়াণ্ডারম্যান+খুনে রোবট+নেকড়ের গর্জন)	৪১/-
তি. গো. ভ. ১০৯/২	(আবার মায়ানেকড়ে+টি-রেক্স-রহস্য+বনের ডায়েরি)	৪১/-
তি. গো. ভ. ১১০	(বিদায়, মুসা!+বাক্স-রহস্য+মৃত্যু-মমির অভিশাপ)	৫৯/-
তি. গো. ভ. ১১০/২	(অদৃশ্য হাত+সার্কাসের তাঁবু+চাঁদের মানুষ)	৪১/-
তি. গো. ভ. ১১১	(ঠগবাজ+মৃত্যুর মুখোমুখি+হারানো ক্যামেরা)	৪৭/-
তি. গো. ভ. ১১১/২	(দুঃস্বপ্নের খেলা-১+দুঃস্বপ্নের খেলা-২+ডাইনোসরের উপত্যকা)	৫৩/-
তি. গো. ভ. ১১২	(জাদুকরের ভেল্কি+মিশর-রহস্য+হিম মৃত্যুর ফাঁদে)	৬২/-
তি. গো. ভ. ১১২/২	(ছায়ামূর্তি+গ্রহান্তরের দুঃস্বপ্ন+ভূতুড়ে খামার)	৪৪/-

পিশাচের আস্তানা

শামসুদ্দীন নওয়াব

প্রথম প্রকাশ: ২০০৫

'মেরি আন্টি, ম্যানহোলের ভিতরে কি অ্যালিগেটর আছে?' প্রশ্ন করল ডন। ও হচ্ছে মেরি চাচীর বোনের ছেলে।

মেরি চাচী মুখ তুলে চাইলেন।

'কিশোর ভাই বলেছে। খালি আমাকে ভয় দেখায়,' অনুযোগ করল ডন।

'তোকে নিয়ে আর পারা গেল না,' চাচী আমার উদ্দেশে বললেন।

'অ্যালিগেটর আছে তা কিন্তু বলিনি,' সাফাই গাইলাম।

'বলেছই তো–' ডন চ্যাঁ করে উঠল।

'হয়েছে, হয়েছে,' থামিয়ে দিলেন চাচী। 'এখন ডিনার খেয়ে সাহেবরা আমাকে উদ্ধার করো।'

ম্যানহোল সম্পর্কে ডনকে বলার কারণ আছে। আমি চাই না ও ওই কোনাটায় যাক। আমার বিশ্বাস ম্যানহোলের ভিতরে কিছু একটা আছে। প্রায়ই একটা টক-মিষ্টি দুর্গন্ধ পাই আমি। আর শব্দ। মনে হয় ড্রেনের ভিতরে বসে কেউ যেন কিছু খাচ্ছে। স্কুলে যখন হেঁটে যাই, শব্দটা অনুসরণ করে আমাকে। বোতল থেকে যেভাবে কেচাপ বেরিয়ে আসে, শব্দটা শুনলে মনে হয় ড্রেন থেকে বুঝি ছিটকে বেরিয়ে আসবে তেমনি কিছু একটা। চাচীকে বলে লাভ নেই, বিশ্বাস করবে না।

সেদিন রিকের বাসা থেকে ফিরছি, হাঁটার গতি কমিয়ে আনলাম। ঠাণ্ডা বাতাস কামড় বসাচ্ছে গালে, জ্যাকেটে কুলাচ্ছে না। কাঠ পোড়ার গন্ধ এল নাকে। মনে হলো আগুন জ্বেলে বসে থাকতে পারলে বেশ হত।

ফিফথ অ্যান্ড অরচার্ড অন্যান্য স্ট্রীট কর্নারের চাইতে আলাদা কিছু নয়। দেখে অন্তত তাই মনে হয়। কিন্তু আজকাল কেমন জানি অস্বস্তি হয় আমার এ-পথে চলাচল করতে।

চোখ পিটপিট করে আকাশের দিকে তাকালাম। গাছগুলো ন্যাড়া হয়ে এসেছে প্রায়। অল্প কিছু পাতা শুধু সেঁটে আছে নাছোড়বান্দার মত। দেখে মনে হচ্ছে, কেউ বুঝি পতাকা টাঙিয়ে সতর্ক করতে চাইছে

পথচারীদেরকে—দূরে থাকতে বলছে।

গাছের মাথা ছাড়িয়ে, ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘ উড়ে বেড়াচ্ছে আকাশে। ইস, কখন যে বাড়ি পৌঁছব! মেঘের একটা ভেলায় চেপে বসা গেলে দারুণ হত। দুই সেকেন্ডে পৌঁছে যেতাম বাড়িতে। তা হলে আর ফিফথ অ্যান্ড অরচার্ডের রহস্যময় শব্দ কিংবা গন্ধ আমার নাগাল পেত না।

কোনাটার কাছাকাছি পৌঁছে গেছি প্রায়। বুকের ভিতর শুরু হয়ে গেছে ধুকপুকুনি। শিস বাজাচ্ছি ভয় তাড়াতে। গলা শুকনো ঠেকল। ধীর হয়ে এল চলার গতি। ভারী হয়ে এসেছে দু'পা। জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে রাস্তার দিকে দৃষ্টি দিলাম।

চারটে স্টপ সাইন রয়েছে ফিফথ অ্যান্ড অরচার্ড স্ট্রীটে। সাদা অক্ষরে লেখা প্রত্যেকটা লাল সাইনের নীচে একটা করে ড্রেন কাটা হয়েছে। চারটে সাইন, সাইডওয়কের কাছে চারটে ড্রেন। লম্বালম্বি কেটেছে। বিশাল হাঁ করে রয়েছে সর্বক্ষণ, ঢাকনির বালাই নেই। আমাদের বয়সী কোন ছেলে-মেয়ে এর ভিতরে পড়ে গেলে নির্ঘাত উঠতে পারবে না। রাস্তার যে দিক দিয়েই হাঁটি না কেন, একটা না একটা ড্রেনকে পাশ কাটাতেই হবে। ভাবনাটা মাথায় আসতেই জ্যাকেটের নীচে শিউরে উঠলাম।

এ রাস্তায় গাড়ি-ঘোড়ার চলাচল খুবই কম। মানুষ-জন দেখতে পেলে মনে একটু সাহস পেতাম। এগিয়ে চলেছি সাইডওয়কের উদ্দেশে।

আজকাল রাস্তার দু'পাশে তাকিয়ে প্রথমে দেখে নিই গাড়ি-টাড়ি কিছু আছে কিনা। তারপর উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে পৌঁছে যাই রাস্তার মাঝখানে। কিন্তু এখন সেটা করাও উচিত হবে কিনা বুঝতে পারছি না। সেদিন ছলাৎ-ছলাৎ শব্দটা দ্রুততর হয়ে উঠেছিল, আমার দৌড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। মাঝ রাস্তায় ড্রেনের ধাতব ঢাকনিতে আমার পা ঠোকর খেতে, ঢাকনিটা সামান্য উঠে গিয়েছিল। কেউ ঠেলে তুলে দিলে যেমন হয় আরকি।

না, মাঝ রাস্তা নিরাপদ সে কথাও জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না। কিন্তু বাড়ি তো পৌঁছতে হবে এবং আজ হোক কাল হোক ভেদ করতে হবে এই রহস্য।

কাঁধের উপর দিয়ে চাইলাম। কোন গাড়ির দেখা পেলাম না। সামনেও একই অবস্থা।

ঝেড়ে দৌড় দেব কিনা ভাবছি, হঠাৎই চোখে পড়ল রবিনকে। মুহূর্তে খুশি হয়ে উঠলাম।

দুই

ফাঁকা, ছোট এক খণ্ড জমিতে, ধুলোর উপর বসে ও। দুটো বাড়ির মাঝখানের এ জমিতে বাড়ি উঠবে না কখনও। ধুলো-মাটি আর কয়েকটি ধাতব বাক্স পড়ে থাকে এখানটায়। গোটা গোটা কালো অক্ষরে 'ডেঞ্জার' লেখা রয়েছে বাক্সগুলোর গায়ে। এগুলো ড্রেনের কাজে লাগে হয়তো।

একটা দেয়ালের পিছনে বসে আছে রবিন। আগেই আমার চোখে পড়ত, যদি না ও দেয়াল ঘেঁষে, কোনাটার দিকে মুখ করে বসত।

রবিনের পরনে আজ জিন্স, নীল রঙের শার্ট আর প্লাস্টিক উইন্ডব্রেকার। হাঁটুর উপর একটা নোটপ্যাড ব্যালান্স করছে ও।

তারমানে রহস্যের টানে এখানে চলে এসেছে নথি। ভাল, খুব ভাল।

ও কোন্‌দিকে চেয়ে রয়েছে এবার নজরে এল আমার।

আমাকে দেখতে পায়নি, কেননা কোনাটার দিকে দৃষ্টি স্থির ওর। আমিও অনুসরণ করলাম ওর দৃষ্টিপথ। মাঝরাস্তার ধাতব ড্রেন কভারটার উদ্দেশে একদৃষ্টে চেয়ে বসে রয়েছে।

রবিনও কি টের পেয়েছে ব্যাপারটা?

নিশ্চয়ই তা-ই। তা না হলে এভাবে ড্রেনের দিকে চেয়ে বসে থাকত না ও।

ওর কাছে হেঁটে গেলাম। সাইডওয়েকে ঘষা খেয়ে শব্দ করল আমার স্নীকার্স। রবিন কিন্তু মুখ তুলে চাইল না।

'তুমি ঠিকই বলেছিলে, কিশোর,' চোখের কোণে আমাকে লক্ষ করে বলল রবিন। কণ্ঠস্বর গম্ভীর।

'জিনিসটা কি বুঝতে পারলে?' প্রশ্ন করলাম।

ঝট করে মুখ তুলে চাইল ও। তারপর আবার দৃষ্টি ফেরাল সিউয়ার ড্রেনের দিকে।

'এখনও পারিনি। তুমি কি কিছু দেখেছিলে?'

রবিনের পাশে উবু হয়ে বসলাম।

'না, গন্ধ পেয়েছি—মিষ্টি-মিষ্টি আর আঠাল ধরনের। গন্ধে মনে হয়েছে বহুদিন ধরে জিনিসটা আছে ওখানে।'

নোটবুকে কী সব টুকে নিল ও।

'আমি দেখেছি ওটাকে। গতকাল,' অবশেষে বলল।

'দেখেছ?' বলে উঠলাম। আমার কণ্ঠস্বরে প্রকাশ পেল বিস্ময়। ওর কথা বিশ্বাস করতে চাই না আমি। জিনিসটা ম্যানহোল থেকে উঠে এসে দেখা দিয়েছে, ব্যাপারটা রীতিমত আতঙ্ককর ঠেকল আমার কাছে। শব্দ আর গন্ধেই যারপরনাই ভীত আমি। কেঁপে উঠে জ্যাকেটের ভিতর ঘন হলাম।

রবিন মাথা ঝাঁকিয়ে ফের সিউয়ারের দিকে দৃষ্টি ফেরাল।

'কিন্তু ওটা আসলে কী তা বলতে পারব না।'

'মুসা জানে?'

'এখনও বলিনি।'

পায়ের পাতা ব্যথা করতে শুরু করেছে, তাই ওর পাশে বসে পড়লাম।

'তোমার কি ধারণা···' আরম্ভ করে থেমে গেলাম। কীসের শব্দ হলো? বাতাস হবে হয়তো। গলা নামিয়ে প্রশ্ন করলাম, 'ওটা কী খায় বলে তোমার ধারণা?'

মাথা নাড়ল রবিন।

'জানি না। তবে জিনিসটা ফাঙ্গাসের মত। মাশরুম যেমন হয় আরকি।'

মাশরুম চলে ফিরে বেড়ায় কখনও শুনিনি। কাজেই চুপ করে থাকলাম। এ জাতীয় জিনিসের জন্ম হয়তো ড্রেনের ভিতরে হয়, যেগুলো বাইরে কখনও বেরোয় না। আইডিয়াটা খারাপ লাগল না নিজের কাছে।

চুপচাপ বসে রইলাম দু'বন্ধু। আমি উৎকর্ণ। আবার শব্দটা শুনলাম বলে মনে হলো। কর্কশ, শোঁ-শোঁ শব্দ। ফুরিয়ে যাওয়া কোকের বোতলে স্ট্র ঢুকিয়ে শুষলে যেমন হয় অনেকটা তেমনি। কী শুষছে ওটা?

মুখ তুলে চাইলাম। আকাশ ঘন ধূসর রং ধরছে।

'সন্ধে হয়ে আসছে,' বলে উঠে দাঁড়ালাম। 'বাড়ি ফিরি চলো।'

রবিন উঠে পড়ল।

'জিনিসটা কী হতে পারে, কিশোর?'

সিউয়ার ড্রেনের দিকে তাকালাম। স্বচ্ছ কোন ধারণা নেই আমার। তবে জিনিসটা যাই হোক, নিঃসন্দেহে ভয়ঙ্কর কিছু একটা। কাঁপুনি অনুভব করতেই দু'পকেটে হাত ভরে দিলাম।

'বিপজ্জনক কিছু, তাই না?' গলা খাদে নামিয়ে বললাম।

'আমাদেরকে এ ব্যাপারে আরও জানতে হবে। স্টাডি করলে যে কোন লাইফ ফর্ম সম্পর্কে জানা সম্ভব।'

রবিন ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকের কোন ডকুমেন্টারি থেকে ডায়ালগটা ঝেড়ে দিল বলে মনে হলো। পকেটে পেন্সিল রেখে নোটবুক বন্ধ করল ও। তারপর আমার দিকে চাইল।

'আমরা দু'জনে দু'দিক বেছে নেব। তুমি এদিকটায় যেতে পারো।'

বুদ্ধিটা ভাল। জিনিসটা যদি কোনক্রমে বেরিয়েও আসে, কাকে তাড়া করবে ঠিক করে উঠতে পারবে না।

'ওটাকে কি তোমার খুব ফাস্ট মনে হয়েছে?' রবিন জিজ্ঞেস করল।

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলাম। শুধু দ্রুত নয় জিনিসটা, অসম্ভব দ্রুত। শব্দ শুনলে মনে হয় ভয়ানক ক্ষুধার্ত ওটা। বিশাল জালার মত পেট সর্বক্ষণ জ্বলছে খিদের আগুনে।

একটু পরে, রাস্তায় নেমে জগিঙের গতিতে দৌড় আরম্ভ করলাম। বুকের ভিতরে এতটাই ধড়ফড়ানি, মনে হচ্ছে সারাদিন বুঝি দৌড়েছি। চকিতে রবিনের উদ্দেশে চাইলাম। দু'পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে ও, হাতে নোটবুক। ভাবখানা এমন যেন রেসের জন্য তৈরি হচ্ছে। সাঙ্ঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ কোন রেস। কিন্তু কেন দৌড় দিচ্ছি আমরা নিজেরাও জানি না। উপলব্ধি করলাম, রেসে হেরে গেলে টেরটি পাব।

আমার উদ্দেশে হাত নেড়ে সবেগে দৌড় দিল রবিন। ওর দেখাদেখি দৌড়ের গতি বাড়ালাম আমিও। এতটাই জোরে ছুটছি, কানে বাতাসের সাঁ-সাঁ শব্দ ছাড়া আর কিছু ঢুকছে না।

ঠিক এমনি সময় রক্ত চলকে উঠল বুকের ভিতরে। ঘড়-ঘড় শব্দটা পিছু তাড়া করছে আমাকে। শুনতে পাচ্ছি রাস্তার নীচ দিয়ে ওটার ছুটে চলার শব্দ। পরিষ্কার টের পাচ্ছি পানির শব্দ নয় ওটা। পানি কখনও ভেবেচিন্তে এগোয় না। ওই জিনিসটা কিন্তু এগিয়ে যাচ্ছে, আবার থমকে দাঁড়াচ্ছে। স্থির করে নিচ্ছে কোন্‌দিকে যাবে, তারপর আবারও চলতে আরম্ভ করছে। সোজা কথা, আমাকে ধাওয়া করছে ওটা।

রবিনকে সাইডওয়ক ধরে দৌড়তে দেখলাম। রাস্তা আর ড্রেনগুলো থেকে যতটা সম্ভব দূরে থাকছে। মনে হলো বাতাসে উড়ে চলেছে যেন ও। জ্যাকেটটা পত-পত করে উড়ছে নিশানের মত।

একটু পরেই, কোনা ঘুরে দৃষ্টিসীমার আড়ালে চলে গেল ও। ছুটন্ত পায়ের শব্দ মিলিয়ে এল ক্রমেই। একা হয়ে গেলাম আমি। রাস্তায় জন-মানুষের চিহ্ন নেই। বাড়ি পৌঁছতে হলে সোজা নাক বরাবর যেতে হবে

আমাকে।

ঠাণ্ডা বাতাসের খোঁচা খাচ্ছি মুখে, ব্যথা করতে শুরু করেছে বুকটা। বারবার পিছু ফিরে তাকানোর ফলে গতি ধীর হয়ে এসেছে। তবে তাতে কোন ক্ষতি হয়েছে বলে মনে হলো না।

গতি আরেকটু কমিয়ে আনলাম। শ্বাস ফিরে পেতে হলে এ ছাড়া উপায় নেই। দৌড়ের কারণে পানি গড়াচ্ছে নাক দিয়ে। হাতা দিয়ে মুছে হাঁচি দিয়ে ফেললাম।

এবং মস্ত ভুল করলাম।

ভক করে নাকে এসে লাগল বাসী লাশের দুর্গন্ধ। বন্ধ হয়ে এল দম। টিপে ধরলাম নাক। বমি পাচ্ছে। চাপলাম কোনমতে। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে দৌড় দিলাম। পায়ে কেউ যেন দু'মণ ওজন বেঁধে দিয়েছে। গতি বাড়াতে চেষ্টা করেও পারছি না।

পরের কোনাটায় পৌঁছে, হাঁটুতে দু'হাত রেখে হাঁপাতে লাগলাম। মুহূর্তের জন্য দম বন্ধ করে কান পাতলাম।

ওই যে, কীসের জানি শব্দ!

তেমন কিছুই নয়। সামান্য এক গর-গর শব্দ, বেসিন থেকে পানি নেমে গেলে যেমনটা শোনা যায়। চকিতে পিছনে চোখ বুলিয়ে নিলাম। কিন্তু শব্দটা ওদিক থেকে আসেনি। তবে এল কোথা থেকে?

চোখ বুজে শুনছি।

ফট করে মৃদু এক শব্দ। সামনের দিক থেকে।

চোখ মেলে চাইলাম। সর্বনাশ, কোনার দিকে আরেকটা সিউয়ার ড্রেন। আর আমি আরেকটু হলেই ওটার উপর দিয়ে দৌড়তে যাচ্ছিলাম।

আড়াআড়ি রাস্তা পার হয়ে হাঁটা দিলাম হনহন করে। তলপেটের একটা পাশ ব্যথা করছে। করুকগে, পেট চেপে ধরে হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিলাম। কাঁধের উপর দিয়ে চেয়ে কিছু দেখতে পেলাম না। কিন্তু গন্ধটা ঠিকই পেলাম। পচা, অসম্ভব মিষ্টি একটু ঝাঁঝাল গন্ধ। দৌড় দিলাম আমি।

ওটাও কি গতি বাড়িয়ে দিল? দুর্গন্ধটা কি তীব্র হলো আরও? কতটা দ্রুত জিনিসটা? ওটার দৌড়ই বা কদ্দূর? হয়তো পিছে ফেলে এসেছি ওটাকে, শব্দটা নিছক আমার কল্পনা। আচ্ছা, গন্ধ কি কল্পনায় টের পাওয়া যায়? আপাতত এসব প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য অপেক্ষা করতে রাজি নই আমি।

বাতাসের জোর ঝাপ্টায় দৌড়তে কষ্ট হচ্ছে। মাথার উপরে একে-

একে জ্বলে উঠছে স্ট্রীটলাইট। দু'পাশের বাড়ি-ঘরগুলোকে কেমন যেন ফাঁকা আর অন্ধকার লাগছে। লোকজন এখনও কাজ থেকে ফিরতে শুরু করেনি। গতি শ্লথ করে কান পাতলাম আবারও। বুকের ভিতর ধড়ফড় করছে হৃৎপিণ্ড। মুহূর্তের জন্য মনে হলো, এ যাত্রা পার পেয়ে গেছি। সামনে অবশ্য আরেকটা সিউয়ার ড্রেন রয়েছে।

ওটার ভিতরে কোন শব্দ হলো কি? মৃদু ছলাৎ-ছলাৎ শব্দ? ওখানে কি ঘাপটি মেরে বসে অপেক্ষা করছে কেউ? বাগে পেলে কি আক্রমণ করে বসবে?

এক দৌড়ে রাস্তা পার হয়ে ঢুকে পড়লাম একজনের ইয়ার্ডে। যে খানাটা গিয়ে ড্রেনে মিশেছে, এড়িয়ে গেলাম সেটাকে। ঘাস মাড়িয়ে ছুটছি। ঝোপ-ঝাড় লাফিয়ে টপকাচ্ছি। কষ্টেসৃষ্টে দেয়াল ডিঙাচ্ছি। অবশেষে বাড়ি পৌঁছতে পারলাম।

টলতে টলতে ড্রাইভ ধরে এগোচ্ছি, কাঁধের উপর দিয়ে পিছনে চাইলাম। খড়-খড় শব্দটা কি শুনলাম? নাকি নিছকই আমার মনের ভুল? দুঃস্বপ্নেও এ শব্দটা আমাকে তাড়া করে ফিরবে মনে হচ্ছে।

কিন্তু আমি চাই না ওটা আমাকে অনুসরণ করে বাড়ি অবধি চিনে যাক। কিছুতেই না। মনে মনে শপথ নিলাম, এর শেষ দেখে ছাড়ব।

পরদিন মুসা আর রবিনের সঙ্গে দেখা হলো স্কুলে। সমস্ত ঘটনা নিয়ে আলোচনা করলাম আমরা।

'খাইছে! কীসের পাল্লায় পড়েছ তোমরা?' মুসার কণ্ঠে বিস্ময়।

'সেটাই তো জানতে হবে,' বললাম চিন্তিত সুরে।

টিফিন পিরিয়ডে মিসেস অ্যান্ডারসনের সায়েন্স ক্লাসে গিয়েছিল রবিন। খানিক বাদে আমি আর মুসাও গেলাম।

কামরার অপরপ্রান্তে অনেকগুলো জানালা। তার কাছেই দাঁড়িয়ে রয়েছে রবিন। এক কাউন্টারের উপর দুটো বড়সড় কাঁচের জার রাখা। একেকটার ভিতরে কয়েক হাজার করে পিঁপড়ে। রবিনের এক হাতে একটা আইড্রপার।

আমাদেরকে দেখে হাতছানি দিয়ে ডাকল নথি।

'আমার পিঁপড়েদেরকে খাওয়াতে চাও?'

হেঁটে গেলাম। রবিন কথা প্রসঙ্গে জানিয়েছিল, ও পিঁপড়ে নিয়ে গবেষণা করছে। মাটির চাইতে জারের ভিতর খুদে-খুদে কালো পিঁপড়ের সংখ্যা অনেক বেশি। মাটি খুঁড়ে সুরঙ্গ বানাচ্ছে কীটগুলো। বাঁ দিকের

জারটায় অবশ্য গাদা-গাদা লাল পিঁপড়ে দেখা গেল। মুসা আর আমি ঝুঁকে পড়লাম কাছ থেকে দেখার জন্য।

'খাইছে! কী খাওয়াচ্ছ এদেরকে?' মুসা প্রশ্ন করল।

'চিনির পানি।' একটা জারের মুখ খুলল রবিন। আইড্রপারটা টিপে দিল মাটির গায়ে। মুহূর্তে ঝাঁকে ঝাঁকে পিঁপড়ে পিল-পিল করে ছুটল। জার দুটোর গায়ে লেবেল সাঁটা রয়েছে।

'ফ্যামিলি ফোমিসিডে।' তারিখও লেখা দেখলাম কাগজটায়।

'বোলতা আর মৌমাছির মত একই গ্রুপের প্রাণী এই পিঁপড়ে,' জানাল রবিন।

'ন্যাশনাল জিওগ্রাফি?' আড়চোখে তাকিয়ে প্রশ্ন করল মুসা।

হেসে ফেলল নথি।

'ডিসকভারিও হতে পারে,' বলল।

একটু পরে, অন্য জারটার মুখ খুলে আইড্রপার টিপে দিল। তরল ফোঁটা পড়তেই যেন পাগল হয়ে উঠল খুদে প্রাণীগুলো।

'মুখটা লাগিয়ে দাও,' বলল রবিন। 'নইলে বেরিয়ে আসতে পারে।'

মুসা প্যাঁচ মেরে লাগিয়ে দিল বয়ামের মুখ।

'পিঁপড়ে সম্পর্কে এত কথা জানলে কোত্থেকে?' প্রশ্ন করলাম। ঝুঁকে দাঁড়িয়ে ওদের ছোটাছুটি দেখছি।

'লাইব্রেরি থেকে একটা বই ধার নিয়েছি,' জানাল ও। লেবেলটা আঙুল দিয়ে দেখাল। 'ওখান থেকেই নামটা জানতে পেরেছি।'

ওর দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করলাম।

'সিউয়ার ড্রেন সম্পর্কে কোন বই-টই পেলে?'

'খুঁজে দেখতে হবে,' জানাল ও।

ছুটির পর লাইব্রেরিতে গেলাম তিন বন্ধু। পে ফোন থেকে ফোন করলাম বাসায়। চাচীর সঙ্গে কথা হলো। আমাদেরকে ঘণ্টা খানেক পরে এসে গাড়িতে করে নিয়ে যাবে। লাইব্রেরি ওয়র্ক করছি শুনে চাচী খুব খুশি।

রবিন আমাদেরকে সিধে কম্পিউটারের কাছে নিয়ে এল।

'ম্যাগাজিন ঘেঁটে আর্টিক্‌ল্ খুঁজে বের করতে হবে,' বলল। 'তবে বেশি পুরানো যেন না হয়।'

'কোন্ বিষয়ের ওপর আর্টিক্‌ল্ খুঁজব আমরা?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'কোন্ বিষয় আর,' হালকা চালে বললাম, 'ময়লা-আবর্জনা, কার অয়েল, জুতো, টায়ার—মানে যেসব জিনিস সিউয়ারে গিয়ে পড়ে

আরকি।'

আমি কৌতুক করছি কিনা লক্ষ করল বন্ধুরা। আমার মুখের চেহারা কিন্তু গম্ভীর।

রবিন কম্পিউটার থেকে পাওয়া ম্যাগাজিন ও আর্টিক্‌লের নাম টুকে নিল। এরপর আমরা গেলাম লাইব্রেরিয়ানের কাছে।

ভদ্রমহিলা তালিকাটা এক পলকে দেখে নিয়ে, আমাদের দিকে মুখ কুঁচকে চাইলেন। ভাবখানা এমন যেন আমরা তাঁকে জোর করে খাটিয়ে নিচ্ছি।

'সায়েন্স প্রজেক্ট,' মহিলার মুখের ভাব লক্ষ করে বলল মুসা।

'হ্যাঁ, স্কুলের জন্যে,' যোগ করলাম আমি।

চলে গেলেন মহিলা। একটু পরে ফিরে এলেন এক গাদা ম্যাগাজিন নিয়ে। তিনটে করে ম্যাগাজিন দেওয়া হবে আমাদেরকে। ফেরত দিলে আবার নিতে পারব।

ঘণ্টা খানেক বাদে বিরক্ত হয়ে উঠলাম।

ফ্লোরিডার অ্যালিগেটর সম্পর্কে জানতে পারলাম। তাতে আমার কী? আমি ফ্লোরিডায় বাস করি না এবং যে প্রাণীটা সম্বন্ধে জানতে চাইছি সেটা অ্যালিগেটর নয়। এটা-সেটা অনেক বিষয়েই আর্টিক্‌ল্ দেখলাম, কিন্তু কোথাও সিউয়ার ড্রেনে বাস করে এমন কোন প্রাণীর কথা নেই।

মুসাকেও দেখলাম বেরনোর জন্য উসখুস করছে। রবিনের কাছে এসে দাঁড়ালাম আমরা।

ও মুখ তুলে চাইল।

মুহূর্তে ঠাণ্ডা হয়ে এল আমার সারা দেহ।

উজ্জ্বল দেখাচ্ছে নথির চোখজোড়া। নির্ঘাত কিছু জানতে পেরেছে ও।

তিন

'মন দিয়ে শোনো,' বলে একটা আর্টিক্‌লে আঙুল রাখল রবিন। তেল কূপের ছবি রয়েছে ওতে। পড়তে শুরু করল: 'বিজ্ঞানীরা আজকাল বিশ্বাস করেন, তাঁরা যেসব মাইক্রোঅর্গানিজম তৈরি...'

'মাইক্রো-কী?' মুসার প্রশ্ন।

'খুদে প্রাণী, জীবাণু বলতে পারো।'

'ও, আচ্ছা।'

আবার পড়তে আরম্ভ করল নথি।

'মাইক্রোঅর্গানিজম তৈরি করেছেন তারা তেল হজম করতে পারে। এ কাজে তারা এনযাইম ব্যবহার করে যা...'

'এন-কী বললে?' মুসা ফের বাধা দিল।

ম্যাগাজিনটা রেখে দিল রবিন।

'যেসব জীবাণু তেল খায়। শুনতে চাও?'

'নিশ্চয়ই, তুমি পড়ে যাও।' বলে ওর ডান পাশের চেয়ারে বসে পড়ল মুসা।

'ব্যবহার করে যা...' আঙুল বুলাচ্ছে ও লাইনটার উপর, 'অন্য কাজেও লাগে। জেনেটিক এঞ্জিনীয়ারিঙের...' পড়া থামিয়ে আমার দিকে চাইল রবিন। 'বিজ্ঞানীরা অনেক উদ্ভট কাজ-কর্ম করেন। যাকগে, বলতে চাইছে বিজ্ঞানীরা এগুলোর জন্ম দেন তেল আর আবর্জনা খাওয়ার জন্যে।'

এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে বললাম, 'বুঝলাম, কিন্তু ড্রেনের ভিতরে যেটা রয়েছে সেটাকে কিন্তু মোটেও ছোট-খাট জিনিস বলে মনে হয় না।'

'ওটা যদি আরও বড় আকার ধরে?' ম্যাগাজিনটা বন্ধ করে আমার দিকে ঘুরে বসল নথি।

'খাইছে!' মুসার অস্ফুট কণ্ঠস্বর।

'প্রচুর পরিমাণে জঞ্জাল খেয়ে খেয়ে ওটা যদি বিশাল দৈত্যে পরিণত হয়? ওটার একমাত্র কাজই যদি হয় আবর্জনা খাওয়া তা হলে তো ব্যাপারটা অসম্ভব নয়।'

চেয়ারটা হঠাৎ করেই শক্ত ঠেকল। নড়েচড়ে বসলাম।

'তোমাকে একটা জিনিস দেখাচ্ছি,' বললাম। আমার ম্যাগাজিনগুলো ঘেঁটে একটা খবরের কাগজ তুলে নিলাম। আমাদের শহরটা ল্যান্ডফিলের উপর গড়ে উঠেছে, এ বিষয়ে লেখা ছাপা হয়েছে ওখানে। রবিন দ্রুত দু'বার পড়ে নিল লেখাটা। ল্যান্ডফিল হচ্ছে এমন জায়গা যেখানে আবর্জনার স্তূপ জমা করা হয় এবং পরে ঢেকে দেওয়া হয় কাদা-মাটি এসব দিয়ে।

একটু পরে মুখ তুলল রবিন।

'বুঝে গেছি। ওটা বহু বছর ধরে আছে মাটির নীচে। গোল্ডফিশকে বড় পুকুরে রেখে যদি প্রচুর খাবার দেয়া যায় তা হলে রীতিমত দানব

হয়ে দাঁড়ায়।' দু'হাত বিস্তার করে দেখাল আমাদেরকে।

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা। মুখের চেহারায় আতঙ্কের ছাপ।

ঢোক গিললাম আমি। এই জীবাণুগুলো সিউয়ারের ভিতরে কতটা বিশাল আকার নিতে পারে?

একনাগাড়ে কথা বলে চলেছে রবিন। ক্রমেই কর্কশ হয়ে উঠছে কণ্ঠস্বর।

'ওটা মনে হয় রাবিশ খেয়ে দিনকে দিন বড় হচ্ছে। হয়তো বাড়তেই থাকবে, বাড়তেই থাকবে।'

'কে জানে,' বলল মুসা, 'এখন হয়তো রাবিশ খেয়ে আর মন ভরছে না। স্বাদ বদলাতে চাইছে।'

রবিন আর আমি ঝট করে ওর দিকে চাইলাম। মুসার কথাগুলো আঁতকে দিয়েছে আমাকে। রবিনের মুখের চেহারা বিবর্ণ। কারও মুখে কথা জোগাল না।

একটু পরে, গাড়ির হর্ন শোনা গেল। চলে এসেছে চাচী। ম্যাগাজিনগুলো আমরা জমা দিলাম লাইব্রেরিয়ানের কাছে। গাড়ি না এলে হেঁটে যেতে হত ফিফথ অ্যান্ড অরচার্ড দিয়ে। শিউরে উঠলাম নিজের অজান্তেই।

পরদিন লাঞ্চ করতে ক্যাফেটেরিয়াতে গিয়ে ঢুকলাম তিন বন্ধু। ডনের জ্বর হয়েছে, তাই চাচী ডাক্তার ডাকার পথে স্কুলে নামিয়ে দিয়েছে আমাকে। খেতে খেতে অবধারিতভাবেই সিউয়ারের প্রসঙ্গ উঠল।

'ওটা হয়তো শুধু জঞ্জালই খায়,' বলল রবিন।

ক্যাফেটেরিয়া পিৎযায় কামড় বসিয়ে চিবাতে লাগলাম। সাদা সুতোর মত গড়াচ্ছে পনির। আমার মনে হচ্ছে কারও চামড়া বুঝি উঠে আসছে চড়চড় করে। টমেটো সসটাও দারুণ, কিন্তু দেখতে লাগছে ঠিক রক্তের মত। আর রুটিটা যেন সাদা হাড়, চাপা পড়ে রয়েছে সব কিছুর নীচে। নাহ, মনটা মোটেই খোলতাই হচ্ছে না আমার। পিৎযা রেখে চকোলেট পুডিঙে চামচ ডোবালাম। দু'এক চামচ খেয়ে রেখে দিলাম ওটাও। মুসা অবশ্য গোগ্রাসে গিলছে।

লাঞ্চ ট্রে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে রবিনকে জিজ্ঞেস করলাম, 'পিঁপড়েরা চিনি-পানি ছাড়া আর কী খায়?'

শ্রাগ করল রবিন।

'প্রায় সবই খায়।'

'হাঙরের মত?' বললাম। 'সেদিন পড়লাম একটা হাঙরের পেট কেটে টিনের ক্যান, পুরানো বুটজুতো এসব পাওয়া গেছে।'

'ওরা মানুষও খায়,' মুখ ভর্তি খাবার নিয়ে বলল মুসা।

*

ছুটির পর বাড়ির পথ ধরলাম আমরা। মনের ভাবনার কথা মনেই আছে, কেউ টুঁ শব্দটাও করছি না।

শীতকাল আসছে। দিনগুলো ছোট হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। চারটে নাগাদ ডুব মারে সূর্য। বন্ধুরা সঙ্গে আছে বলে মনে জোর পাচ্ছি। এতদিন ভেবে এসেছি, শব্দ-গন্ধ সবই আমার মনের ভুল। কিন্তু রবিনের সঙ্গে কথা হওয়ার পর থেকে বুঝে গেছি, কিছুই মিথ্যে নয়–সব সত্যি।

'জিনিসটা দেখতে ঠিক কীরকম, রবিন?' মুসা জানতে চাইল। 'আগেও একবার শুনেছি। কিন্তু কল্পনায় ঠিক আনতে পারছি না।'

জ্যাকেটের পকেটে হাত ভরে দিল রবিন।

'বিদঘুটে। বৃষ্টির পর ভেজা রাস্তায় সূর্যের আলো পড়তে দেখেছ? অনেকটা সেরকম। কালো, চকচকে···দেখে মনে হয়েছিল ভেতর থেকে আলো চমকাচ্ছে।'

'রঙিন বাতি মিটমিট করে জ্বলার মত?' বলল মুসা। হাঁটার গতি কমিয়ে আনল।

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল রবিন।

ফিফথ অ্যান্ড অরচার্ডের কাছাকাছি চলে এসেছি। সামনের দিকে তর্জনী তাক করে তেল-মসৃণ কালো রাস্তাটা দেখালাম।

'ওরকম?'

চার

হাঁটা থামিয়ে দিতেই, খড়-খড় আওয়াজটা শুনতে পেলাম। কাছ থেকে। খুব কাছ থেকে। ভক করে নাকে এসে লাগল পচা ডিম আর টকে যাওয়া ক্যান্ডির দুর্গন্ধ।

আমাদের সামনে থাকা রাস্তাটাকে খানিকটা চকচকে দেখাচ্ছে। রোদ অবশ্য পড়ে গেছে। মেঘে ঢাকা পড়েছে আকাশ। বৃষ্টি নামবে যে কোন মুহূর্তে। মনে হচ্ছে কালচে এক তাঁবুর নীচে ঠাঁই নিয়েছি আমরা।

বৃষ্টি হয়নি, অথচ সিউয়ার ড্রেনের আশপাশের রাস্তাগুলোকে কেমন ভেজা-ভেজা লাগছে। মাটিতে সোঁদা গন্ধটা অবশ্য নেই, বৃষ্টির পর যেমনি হয় আরকি। তার বদলে বাসী, টক-টক এক গন্ধ পাচ্ছি।

রবিনের দিকে চাইলাম। মুখের ভিতরটা শুকনো ঠেকছে আমার। রবিন আমার চোখে চোখ ফেলল না। সোজা হাঁটা দিল নাক বরাবর।

'বিটকেল গন্ধ!' মন্তব্য করল মুসা।

নাক কুঁচকে মাথা ঝাঁকালাম। তারপর অনুসরণ করলাম রবিনকে। সাইডওয়ক ধরে হাঁটছি।

রবিন হঠাৎই ঘুরে দাঁড়াল আমাদের দিকে।

'দৌড় দাও!' বলেই ছুটতে শুরু করল।

আমরাও দৌড় লাগালাম। জিজ্ঞেস করলাম না কারণটা। শুধু জানি পালাতে হবে এখান থেকে। স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি, ড্রেন থেকে উঠে আসছে গরগরা করার মত রক্ত হিম করা এক শব্দ।

রাস্তার মাঝখানে পৌঁছে গেছি আমরা। ড্রেনগুলোর পাশ কাটানোর সময় জোরাল হলো শব্দটা। পিঠে ব্যাকপ্যাক নিয়ে প্রাণপণে ছুটছি। কোনদিকে তাকাচ্ছি না।

আমাদের খানিকটা সামনে রবিনের ছুটন্ত পদশব্দ পাওয়া যাচ্ছে। পিছনে আচমকা ঠং করে ধাতব এক শব্দ উঠল। মনে হলো কেউ বুঝি ড্রেনের ঢাকনিটা একবার তুলেই আবার ফেলে দিয়েছে।

অবশেষে পেরিয়ে আসতে পারলাম ড্রেনগুলো। পিছে ফেলে এসেছি শব্দটাকে। কিন্তু টক-মিষ্টি গন্ধটা বাসা পর্যন্ত পিছু ছাড়েনি।

শেষমেশ কোন দুর্ঘটনা ছাড়াই বাসায় পৌঁছনো গেল। ব্যাকপ্যাক রেখে, জ্যাকেট খুলে হাতদুটো ধুয়ে নিলাম। চাচীর রান্নার সুগন্ধে চারপাশ মৌ-মৌ করছে।

ফ্রিজ থেকে দুধের কার্টন বের করলাম। হাত কাঁপছে। দু'হাতে ধরে থাকতে হলো, চলকে যাতে পড়ে না যায়।

গ্লাসে দুধ ঢেলে, গালে হাত দিয়ে টেবিলে বসে থাকলাম। নানান চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে মগজের মধ্যে। বুকের ধড়ফড়ানি কমাতে চেষ্টা করলাম।

চাচা-চাচীকে কি জানানো উচিত? ওদেরকে জানালে ওরা হয়তো স্কুলে আনা-নেওয়া করবে আমাকে।

দুধের কার্টনের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে বসে বসে ভাবতে লাগলাম।

জিনিসটাকে একবারও দেখতে পেলাম না কেন কে জানে। রবিন

তো দেখেছে। এসব কথা মাথায় খেলছে, হঠাৎই চমকে উঠলাম ভূত দেখার মত।

নিখোঁজ!

দুধের কার্টনের উপর দিকে, নীল লেবেলের ঠিক নীচে একটা বাচ্চার ছবি। তার তলায় কিছু কথা লেখা।

শেষবার দেখা গেছে ফিফথ অ্যান্ড অরচার্ডের কাছে।

তারপর মেয়েটি সম্পর্কে আরও অনেক কথা লেখা হয়েছে। মেয়েটির সামনের একটি দাঁত নেই, লম্বা চুল লাল রিবনে বাঁধা। একটু পরে উঠে দাঁড়িয়ে অন্য কার্টনগুলো বের করলাম।

নিখোঁজ মেয়েটির ছবি ছেপেছে পরের কার্টনটিতেও। তৃতীয় কার্টনে এক ছেলের ছবি। ডনের বয়সী। ছোট করে ছাঁটা চুল, আর ঘন ভ্রূ। এদেরকে শেষবার দেখা গেছে ফিফথ অ্যান্ড অরচার্ডের কাছে–এ কথাটার উল্লেখ রয়েছে।

কতজনকে? কতজনকে ধরেছে ওটা? আমাদের তিনজনকেও কি ধরবে?

ফ্রিজে ঢুকিয়ে রাখলাম দুধের কার্টনগুলো। তারপর আবার বসে পড়লাম ডিনার টেবিলে।

চাচী এসময় কিচেনে এসে ঢুকল। ক্লান্ত।

'চাচী, ডন কেমন আছে এখন?' জানতে চাইলাম।

'ভাল, জ্বরটা কমেছে।'

ঠিক করেছি, ডিনারের আগে চাচীকে কিছুই জানাব না। কিন্তু চাচী আমার মাথায় হাত বুলিয়ে, চুলগুলো এলোমেলো করে দিতেই, মুহূর্তের মধ্যে কী যেন হয়ে গেল। হড়বড় করে কথা বলতে শুরু করে দিলাম।

'...কোনমতে দৌড়ে পালিয়ে এসেছি আমরা। ভয়ানক দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছিল ওটা। আমরা লাইব্রেরিতে গিয়ে মাইক্রোঅর্গানিজম সম্পর্কে জেনেছি। ওরা খেয়ে খেয়ে ঢোল হয়। যে বাচ্চাগুলো হারিয়েছে তাদেরকে...' একনাগাড়ে মনের সব কথা উজাড় করে দিয়ে তবে থামতে পারলাম। এবার চাচীর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম।

আমার জন্য ট্যাকো বানিয়েছে চাচী। চেয়ারে বসে ট্যাকো শেলে গরুর মাংসের পুর ভরতে লাগল। লেটুস পাতা আর পনিরও ঠেসে দিচ্ছে উপরদিকে।

'খেয়ে নে, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে,' ক্লান্ত হেসে বলল। 'তোর ওসব নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না।'

অগত্যা বসে পড়লাম। তবে খাবার মুখে রুচল না। চাচী আমার কপালে হাত রাখল।

'জ্বর-টর বাধাস না যেন,' বলে আমাকে ঘরে পাঠিয়ে দিল। বুঝতে পারলাম, বিশ্বাস করেনি আমার কথাগুলো।

ঘরে গিয়ে পাজামা পরে ব্রাশ করে নিলাম। তারপর মুখ ধুয়ে খানিকক্ষণ খুলে রাখলাম বেসিনের কল। পানি পাক খেয়ে ঘড়-ঘড় শব্দ তুলে নেমে গেল।

ড্রেন থেকে সিউয়ারে গিয়ে মিলবে এই পানি।

আচ্ছা, সিউয়ারে যা নেমে যায় তা কি আবার উঠে আসতে পারে? পিছিয়ে এলাম বেসিনটার সামনে থেকে। জিনিসটা যদি সরু আঠার রূপ ধরে, তা হলে কি ড্রেন পাইপ বেয়ে এখানে উঠে আসতে পারবে?

বেসিনের কল, বাথটাব ড্রেন, বাথটাবের নল, সিঙ্ক ড্রেন, কমোড, কিচেন সিঙ্ক—কোন কিছুই নিরাপদ নয়। পিশাচটা যে কোন পথে ঢুকে পড়তে পারে বাড়ির ভিতরে। তারপর কী ঘটবে? উত্তরটা জানা নেই আমার।

বেরিয়ে এলাম টয়লেট থেকে।

সে রাতে দুঃস্বপ্ন দেখলাম আমি।

*

পরদিন লাঞ্চের সময় মুসা আর রবিনকে হারানো বাচ্চাগুলোর কথা বললাম। পিশাচটার বাসায় সেঁধিয়ে পড়ার সম্ভাবনা আছে, একথাটা বলতে গিয়েও চেপে গেলাম শেষ মুহূর্তে। কেননা, ফিফথ অ্যান্ড অরচার্ড ছাড়া আর কোথাও তো দুর্গন্ধটা পাইনি আমরা। আর রবিন ওটাকে দেখেওছে ঠিক ওখানটাতেই। ওটার হয়তো অন্য কোথাও হানা দেওয়ার ক্ষমতাও নেই। হয়তো।

আমি কথা বলে গেলাম, বন্ধুরা টিউনা স্যান্ডউইচ আর পটেটো চিপস খেল আর মন দিয়ে শুনে গেল। একটু পরে ঘণ্টা বেজে উঠল। ছুটির পর কথা হবে, ঠিক করলাম আমরা।

স্কুল শেষে, মিসেস অ্যান্ডারসনের সায়েন্স ক্লাসে গিয়ে ঢুকলাম আমরা। টীচার তখন চকবোর্ডে ব্যস্ত ছিলেন। রবিন তার পিঁপড়েদের খাবার দিতে গেল।

'আমাদেরকে কিছু একটা করতে হবে,' খানিক পরে বলল ও। চকিতে মিসেস অ্যান্ডারসনের দিকে চাইল। শুনতে পাননি উনি। 'আর কেউ হারিয়ে যাওয়ার আগেই করতে হবে যা করার।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ফিসফিস করে বলল মুসা, 'যারা হারিয়ে গেছে তাদের কী হবে?'

ভ্রূ কুঁচকাল রবিন।

'কে জানে।' জারের ঢাকনি লাগিয়ে দিল ও। তারপর টীচারকে বলে বেরিয়ে এল। খেলার মাঠে চলে এলাম তিন বন্ধু। বাতাসে ভাপসা গন্ধ।

'একটা তালিকা করতে হবে। ভেবে বের করতে হবে কীভাবে ওটার হাত থেকে চিরতরে নিস্তার পাওয়া যায়।'

মাটিতে পাশাপাশি বসে পড়লাম আমরা। নোটবুকের নতুন এক পাতা উল্টাল রবিন।

'প্রথম কথা, আমরা কতটা জানি ওটার সম্পর্কে?'

'এটুকু জানি ওটা দিনকে দিন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে,' বলল মুসা।

'হ্যাঁ, কিন্তু কেন?'

'শীতকাল বলে?' মুসা অনুমান করে বলল।

'হতে পারে, কিন্তু শীতকালের বিশেষত্বটা কী?' প্রশ্ন করলাম।

শ্রাগ করল মুসা।

'দিন ছোট থাকে। আর ঠাণ্ডা

খুদে-খুদে অক্ষরে টুকে নিল রবিন।

'ছোট দিন। এমন হতে পারে ওটা হয়তো আলো সইতে পারে না।'

মাথা ঝাঁকালাম।

'হ্যাঁ, আলো কম থাকলে শব্দ আর গন্ধ দুটোই বেড়ে যায়।'

'শীতকালে ঠাণ্ডাও থাকে। ওটা হয়তো গরম পছন্দ করে না।' নোটবুকে হিজিবিজি অক্ষরে সব কথা লিখে নিচ্ছে নথি। 'গরমকালে আর কী কী হয়?'

'জানি না,' বললাম শ্রাগ করে।

'আচ্ছা, আমরা ওটার সম্পর্কে আর কী জানি?'

'মাঝে মাঝে পানি ঝরার মত শব্দ পাই। মনে হয় জিনিসটা ভেজা ধরনের।'

'ভেজা?' নোটবুক থেকে মুখ তুলল রবিন। 'হ্যাঁ, হতে পারে।'

'কীরকম?' মুসার প্রশ্ন।

'তাপ আর আলো অনেক সময় শুষে নেয় তরল।'

মাঠের চারদিকে নজর বুলালাম। কেউ খেলাধুলা করছে না।

'রবিন, সবই কিন্তু আমাদের অনুমান। কোন ব্যাপারেই শিয়োর নই আমরা।'

'ও কথা বলছ কেন?' বলল ও। 'আমরা তো দেখেছি ওটাকে। ডিরেক্ট অবজার্ভেশন।'

'তুমি দেখেছ। আমরা এখনও দেখিনি। কিন্তু গরমকালে আরও অনেক কিছুই ঘটে। হয়তো সামারে শুকিয়ে যায় ওটা। কিংবা এমনও তো হতে পারে অন্য কিছু দাবিয়ে দেয় ওটাকে? আমরা কোন ভুল করছি না তো?'

রবিন ওর নোটবুক বন্ধ করল।

'তুমি চুপচাপ হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে চাও? কিশোর পাশা ভয় পাচ্ছে?'

আলোচনাটা উত্তপ্ত হয়ে ওঠার সুযোগ দিল না মুসা।

'আমাদেরকে কী করতে হবে বলো।'

'চেষ্টা করতে হবে। পরীক্ষা করে দেখতে হবে। আলো আর তাপ নিয়ে ওটাকে আঘাত করতে হবে। তাতেই বোঝা যাবে জিনিসটা উবে যায় কিনা, কিংবা আকারে ছোট হয়ে আসে কিনা। আমাদেরকে অন্তত চেষ্টা তো করে দেখতে হবে।'

'খাইছে! আঘাত করতে হবে?' গুঙিয়ে উঠল মুসা, 'তারচেয়ে বড়দেরকে সব কিছু খুলে বললে হয় না? যা করার তারাই করুক?'

'কিশোর, তুমি চাচা-চাচীকে জানিয়েছ?' রবিন জিজ্ঞেস করল।

কী আর করব, স্বীকার করতে হলো। চাচী যে আমার কথা বিশ্বাস করবে না সেটা যেন জানাই ছিল রবিনের। ডনকেও আবার নিষেধ করেছি রাস্তাটার আশপাশে না যেতে। ছোঁড়া আমার কথা কানেই তুলছে না। একদিন বিকেলে হয়তো মাতবরী মেরে ঠিকই গুটি-গুটি গিয়ে হাজির হবে ফিফথ অ্যান্ড অরচার্ডে। খুদে দস্যিটাকে মাঝে-মাঝে যদিও কানমলা দিতে ইচ্ছে করে, তাই বলে আমি চাই না ওর ছবি হোক দুধের কার্টনে।

'আমি রাজি। কখন?' অবশেষে বললাম।

'মুসা?' প্রশ্ন করল নথি।

'মরলে তিনজনে একসাথে মরব,' দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করল মুসা।

চোখজোড়া দপ করে জ্বলে উঠল রবিনের।

'কালকে ঠিক সূর্য ওঠার আগ দিয়ে।'

উঠে পড়লাম তিন বন্ধু। একসঙ্গে হাঁটা দিলাম। ফিফথ অ্যান্ড অরচার্ডে পৌঁছে, আমাদের উদ্দেশে মাথা নাড়ল রবিন। চোখের পলকে ঝেড়ে দৌড় দিলাম তিনজন। পিছনে আজকে আর কোন সাড়া-শব্দ

পেলাম না। মুহূর্তের জন্য মনে হলো পিশাচটা দূরে কোথাও চলে গেছে, বুঝি। কিন্তু আমি জানি যায়নি। এখানেই রয়েছে ওত পেতে।

বাসায় ফিরে নিজেকে মনে মনে প্রস্তুত করে নিলাম। আজ পর্যন্ত কম ঝামেলায় তো জড়াইনি আমরা, বিপদ দেখে কখনও পিছিয়ে আসিনি–এর শেষ দেখে ছাড়ব এবারও।

পরদিন সকালটা এসে গেল যেন চোখের পাতা ফেলতে না ফেলতেই। আমাকে অত সকালে উঠতে দেখে কাজ চাপিয়ে দিল চাচী। গার্বেজ-ক্যানটা রাস্তায় নিয়ে গিয়ে রাখতে বলল, ট্র্যাশম্যান তুলে নেবে। কাজটা সেরে এসে বিছানা তুলে ফেললাম। ডন ভিডিও টেপগুলো অগোছাল করে রেখেছিল, সব সাজালাম। আহা, আজকে চাচীর ফুট-ফরমাশ খাটতে কী ভালই না লাগছে! চাচী আমাকে সারাদিন খাটিয়ে নিলেও আজ বোধহয় অখুশি হব না আমি। মনে হচ্ছে ডেন্টিস্টের রিসেপশন রূমে গিয়ে বসে আছি, এবং অন্য ছেলেদের ডাক পড়ছে একে একে। এক সময় আমার পালাও আসবে–একটু আগে হোক আর পরে। কিন্তু বুঝতে পারছি না কোন্‌টা ভাল, তাড়াতাড়ি ঝামেলা চুকে যাওয়া নাকি ঝামেলাটা দেরি করে আসা?

খানিকক্ষণ পরে দেখা গেল, চাচীর আর করিয়ে নেওয়ার মত কাজ বাকি নেই। সুতরাং এবার যেতেই হচ্ছে আমাকে। রবিন আর মুসা পৌঁছে গেছে নাকি ইতোমধ্যে?

বাড়ি-ঘরের মাথা টপকে সূর্য সবে উঁকি দিচ্ছে, এমনিসময় ফিফথ অ্যান্ড অরচার্ডে হাজির হলাম আমি। গার্বেজ ক্যান, কিছু প্লাস্টিক, কয়েকটা ধাতব জিনিসপত্র ডাঁই করে রাখা রয়েছে রাস্তার ধারে–ট্র্যাশ ট্রাক এসে তুলে নেবে। গাছগুলো সব ন্যাড়া হয়ে গেছে। মেঘলা আকাশের পটভূমিতে মরা দৈত্যের মত দেখাচ্ছে ওদেরকে। আমার পায়ের তলায় মচ-মচ করে ভাঙছে শুকনো, ঝরা পাতা।

মুসা আর রবিনকে দেখতে পাচ্ছি না, কাজেই হাঁটার গতি কমে এল আমার। অদ্ভুত এক ধরনের অস্বস্তি বোধ করছি। তবে এ-ও উপলব্ধি করতে পারছি, ভয়কে জয় করতে হবে।

হাঁটার গতি দ্রুত হলো আমার। কোনাটা পেরিয়ে স্কুলে চলে যেতে ইচ্ছে করছে। ওরা হয়তো এখানে না এসে স্কুলে চলে গেছে। বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলে অন্য কোন প্ল্যান তৈরি করা যেতে পারে। গরমকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারি আমরা। হ্যাঁ, বুদ্ধিটা ভাল। দড়ি-দড়া, আলো আর ক্যাম্পিং ল্যান্টার্ন হাতে নিজেদেরকে দেখতে পাচ্ছি

কল্পনায়। ততদিনে অস্বাভাবিকতাটা হয়তো আর কারও নজরে পড়বে তারা ব্যবস্থা নেবে যা ভাল বুঝবে।

কালো টিউবটা চোখে পড়তেই পলকে আমার দিবাস্বপ্ন ভেঙে গেল।

ফাঁকা জমিটার ঠিক সামনে, পয়োনালীর ভিতর পড়ে আছে নলটা। ধীর পায়ে এগিয়ে গেলাম ওটার উদ্দেশে। সতর্ক আমি, যেন ঝট করে উঠে দাঁড়িয়ে জিনিসটা ছোবল মারবে আমাকে। কয়েকটা বড়-বড় লাল পিঁপড়েকে দেখলাম ছোটাছুটি করছে ওটার গায়ে। প্রাণীগুলোকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে তুলে নিলাম জিনিসটা।

আমার কনুই থেকে হাত অবধি লম্বা এক ফ্ল্যাশলাইট। পরিচিত লাগল। কালো বোতামটা টিপে দিলাম। জ্বলে উঠল হলদে আলো।

মুহূর্তে মনে পড়ে গেল, এটা মুসার।

রাস্তার দিকে দৃষ্টি মেলে দিলাম।

রাস্তার মাঝখানে, কালো এক গোলাকার গর্তের পাশে শুইয়ে রাখা সিউয়ার ড্রেনের ধাতব ঢাকনি। তারমানে মুসা নেমেছে গর্তের ভিতর—ফ্ল্যাশলাইট ছাড়াই। রবিনও কি রয়েছে ওর সঙ্গে?

ড্রেনটার কাছে চলে এলাম দ্রুত পায়ে। পানিতে সেই অদ্ভুত শব্দটা নেই। তবে বুকের ভিতরকার ধড়াস-ধড়াস শব্দটা জোর বাড়ি মারছে কানে।

মুসা হয়তো আসেইনি, আপন মনে বললাম। ড্রেন কভারটাও সরায়নি। আশা করলাম, ওকে কিছুতে টেনে নিয়ে যাওয়ার সময় হাত থেকে খসে পড়েনি ফ্ল্যাশলাইট।

কিন্তু সত্যিটা আমিও জানি। আমার আসতে দেরি হচ্ছে দেখে ওরা আর অপেক্ষা করেনি।

নীচের ঠোঁটে চিমটি কাটলাম। কল্পনায় ভেসে উঠল বীভৎস, আঠাল প্রাণীটার ছবি। রাস্তায় ঘাপটি মেরে পড়ে ছিল শিকারের অপেক্ষায়। মুসা কিংবা রবিন কখন নাগালের মধ্যে আসবে সেই ক্ষণ গুণছিল। ভোর রাতে ওত পেতে শুয়ে ছিল আলো চমকানো পিশাচটা। বাসী টক-মিষ্টি দুর্গন্ধ ছড়িয়ে ওটা হামলে পড়ে সম্ভবত মুসার উপর, এবং ওকে টেনে নিয়ে যায় গভীর, কালো গহ্বরে। বেচারা না জানি কত চিৎকার ছেড়েছে, ছটফট করেছে পিশাচটার হাত থেকে নিস্তার পেতে। এমন হতে পারে, ওকে উদ্ধার করতে নীচে নেমেছে রবিন।

ড্রেনটার উপর ঝুঁকে গলা ছেড়ে ডাকলাম ওদের নাম ধরে। প্রতিধ্বনি তুলে স্তব্ধ হয়ে গেল আমার কণ্ঠস্বর। মনে হলো শব্দটাকে

গিলে খেল ভয়ঙ্কর কোন এক প্রাণী।

ঠিক এমনিসময় সিউয়ার থেকে উঠে এল ছলাৎ-ছল প্রতিধ্বনি।

পাঁচ

ফ্ল্যাশলাইটটা এতটাই জোরে চেপে ধরেছি, আঙুল ব্যথা করছে। পানির শব্দটা কি জোরদার হলো? সিউয়ারের গভীরে তাক করে ধরলাম ফ্ল্যাশলাইট। চকচকে কোন কিছুর গায়ে বাড়ি খেয়ে, ছিটকে সরে গেল হলদে আলোর বিন্দু।

কার্পেট গুড়ি মেরে এগোলে যেমন দেখাবে, চকচকে জিনিসটা এবার সেভাবে নড়েচড়ে উঠল।

সভয়ে চেঁচিয়ে উঠে এক পা পিছু হটলাম। এতটাই কাঁপছে হাত, কষ্ট হচ্ছে ফ্ল্যাশলাইট ধরে থাকতে। ঠিক এসময় অদ্ভুত গন্ধটা নাকে এসে ঝাপটা মারল। টক-মিষ্টি, ধাতব এক গন্ধ।

ঘুরে দাঁড়িয়েই দৌড় লাগালাম। ফ্ল্যাশলাইটটা হাতে ধরা।

আমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটছে আরেকটা কী যেন। ভীতিকর গরগর, শোঁ-শোঁ শব্দ করে রাস্তা ধরে তাড়া করছে আমাকে। বন্ধুদের কথা ভুলে প্রাণপণে ছুটছি।

শেষমেশ স্কুলে পৌঁছে ছোটা থামালাম। হাঁটুতে দু'হাত রেখে মুখ হাঁ করে শ্বাস টানছি।

এবার পালাতে পেরেছি ওটার হাত থেকে। কিন্তু এভাবে কতবার? ব্যাপারটা ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠছে।

স্কুলের বারান্দায় বসে পড়লাম। দৃষ্টি মুসার ফ্ল্যাশলাইটটার দিকে।

কেন অপেক্ষা করল না ওরা?

চিন্তাটা ঘুরপাক খাচ্ছে মাথার মধ্যে। আলোটা কি তা হলে কাজ করেনি? মুসা কি ফ্ল্যাশলাইট জ্বেলে তাপ দিতে চেষ্টা করেছিল পিশাচটাকে, নাকি চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে? শত্রু সম্পর্কে আমাদের চিন্তা-ভাবনা সবই কি ভুল?

বারেবারে চোখের পর্দায় ভেসে উঠছে একটাই দৃশ্য, খানার ভিতর পড়ে রয়েছে ফ্ল্যাশলাইট, আর পিঁপড়েরা চলেফিরে বেড়াচ্ছে ওটার গায়ে।

ওরা অপেক্ষা করল না কেন আমার জন্য? আচ্ছা, আমি বার বার কেন ভাবছি দু'জনই হাজির হয়েছিল সময় মত? রবিন তো না-ও এসে থাকতে পারে, তাই না? মুসার ফ্ল্যাশলাইট প্রমাণ দিচ্ছে ও আমার আগে পৌঁছেছে ওখানে।

হঠাৎই আমার মনে পড়ে গেল রবিনের চিনি-পানি খাওয়া পিঁপড়েদের কথা। মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিলাম ফ্ল্যাশলাইটটার গায়ে চরে বেড়ানো প্রাণীগুলোর ছবি।

সটান উঠে দাঁড়িয়ে মিসেস অ্যান্ডারসনের ক্লাসরুমের কাছে হেঁটে গেলাম। জানালা ভেদ করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখলাম রুমের জারগুলোর দিকে।

রবিন জিজ্ঞেস করেছিল, গরমকালে আর কী কী ঘটে। চোখ বুজে ভাবতে লাগলাম গভীর মনোযোগে।

গরমের তাপ। পাতায় মর্মরধ্বনি। কাটা ঘাসের ঘ্রাণ। লম্বা দিন। লেমোনেড। মেঘমুক্ত আকাশ। পাখি। লেডিবাগ। অন্যান্য নানা ধরনের পোকা-মাকড়।

এবং পিঁপড়ে।

সবখানে পিঁপড়ে। রান্নাঘরে পিঁপড়ের সারি। পার্কে পিকনিকের খাবারে ওদের হামলা। উঠনের এখানে-সেখানে ঢিবি। চিমটি কাটলাম নীচের ঠোঁটে। হঠাৎই মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল।

মিসেস অ্যান্ডারসনের জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো। উনি এলে পরে জানালাম, রবিন আমাকে পিঁপড়ের জার দুটো নিয়ে যেতে বলেছে। মিসেস অ্যান্ডারসন খুশি মনে রাজি হয়ে গেলেন। ব্যাক পকেটে ফ্ল্যাশলাইট ঢুকিয়ে, দু'বাহুতে জার নিয়ে বেরিয়ে এলাম।

ফিফথ অ্যান্ড অরচার্ডে পৌঁছতে দীর্ঘ সময় লেগে গেল। হেঁটে আসার ফলে ঘেমে নেয়ে গেছি একেবারে।

জার দুটো মাটিতে নামিয়ে রেখে ঘড়ি দেখলাম। স্কুল বসতে আর আধ ঘণ্টা বাকি।

পকেট থেকে মুসার ফ্ল্যাশলাইট বের করে অন করলাম।

সিউয়ার ড্রেনের ঢাকনিটা তেমনি পড়ে আছে। কেউ আর ঢাকা দেয়নি। সূর্য উঠে গেছে, কিন্তু সিউয়ারের ভিতর এখনও আলো পড়েনি। মেঘের আড়াল ছেড়ে যেই বেরিয়ে এল রোদ, সিউয়ারের কিনারা ঘেঁষে এলাম আমি।

টক-মিষ্টি গন্ধটা কিন্তু ঝুলে রয়েছে বাতাসে, আলো ফেললাম নীচে।

দেয়ালে ধাতব এক মই দেখতে পাচ্ছি। পিঁপড়ের জার দুটোর জন্য ফিরে গেলাম। জ্যাকেট খুলে জার দুটোর গায়ে পেঁচিয়ে দিলাম। এবার কোমরে কষে বেঁধে নিলাম জ্যাকেটের হাতা দুটো। জার দুটো গ্যাঁট মেরে বসে রইল বুকের কাছে।

পেভমেন্টে বসে পড়ে, দু'পা ঝুলিয়ে দিলাম গর্তের ভিতরে।

একবার ওখানে নামলে আর কি উঠে আসতে পারব? যা হয় হবে, বন্ধুদেরকে বিপদের মুখে ফেলে রেখে আমি বসে বসে আঙুল চুষতে পারি না।

ভক করে নাকে এসে বাড়ি মারল বাসী এক দুর্গন্ধ।

ঘুরে, মই বেয়ে নামতে শুরু করলাম।

ছয়

নেমে যাচ্ছি, জার দুটো মৃদু বাড়ি খাচ্ছে আমার বুকের সঙ্গে। পিচ্ছিল আর ঠাণ্ডা লাগছে ধাতব মইটাকে। এক হাতে মই ধরে নীচে নামতে হচ্ছে আমাকে। অপর হাতে ধরে রেখেছি ফ্ল্যাশলাইট। লাইটটাকে নীচের দিকে খাড়া তাক করে ধরে সিঁড়ি গুণছি।

এক। ঠিক ফিরে আসব।

দুই। বন্ধুদেরকে উদ্ধার করবই করব।

তিন। চার।

পা হড়কে গেল। আমার তৈরি করা ব্যাকপ্যাক থেকে খসে পড়ল একটা জার। ওটার চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়ার শব্দ বাড়ি খেয়ে ফিরল সিউয়ারের দেয়ালে। ফ্ল্যাশলাইট ধরা হাতের বাহুতে অন্য জারটা জড়িয়ে ধরে রেখেছি। ঝুলে রয়েছি, ডান পা ঝটকাচ্ছি মইয়ের ধাপ নাগাল পাওয়ার জন্য। অপর জারটা ঘুরে গেল পিছলে। আঙুলগুলোয় ঢিল পড়তে শুরু করেছে আমার। অবশেষে ডান পায়ের পাতাটা খুঁজে পেল পরের ধাপ।

মই বেয়ে একেবারে নীচে নেমে এসে বুক ভরে শ্বাস টানলাম।

গভীর, আঠাল পদার্থে দেবে গেল দু'পায়ের পাতা। নিমেষে সাদা জুতো বাদামি হয়ে গেল। দুর্গন্ধে তিষ্ঠানো দায়। জ্যাকেটের হাতা খুলে দ্বিতীয় জারটা নামিয়ে রাখলাম।

সিউয়ারের নীচে অন্ধকার। রাতের মত। শ্বাস চেপে রেখে কান

পাতলাম। পানি কিংবা তরল কিছু টপ-টপ করে ঝরে পড়ার শব্দ পাচ্ছি। যথেষ্ট আলো দিচ্ছে না ফ্ল্যাশলাইট। মাত্র ক'ফুট দূরেই ঘন অন্ধকার। হলদে আলো ঝাঁকি খাচ্ছে উপরে-নীচে। দু'হাতে ফ্ল্যাশলাইট চেপে ধরে আলোর লাফালাফি বন্ধ করতে হলো।

'মুসা? রবিন?' চাপা গলায় ডাক দিলাম।

এক পা আগে বাড়লাম। দুটো সুরঙ্গের সামনে, এক 'Y'-এর নীচে দাঁড়িয়ে আমি। আরেক কদম এগোতেই পা গেল হড়কে। দেয়াল ধরে ভারসাম্য রাখতে গেলাম, কিন্তু পারলাম না। ঠিকই পড়ে গেলাম, আর হাত থেকে ছুটে গেল ফ্ল্যাশলাইটটা। কাঁচ ভাঙার শব্দ। সবেধন নীলমণি জারটা চুরমার হয়ে গেল ফ্ল্যাশলাইটের বাড়ি খেয়ে। আঠাল, দুর্গন্ধময় আবর্জনার স্তূপে চিতিয়ে পড়ে গেছি আমি। ফ্ল্যাশলাইটটা ভাঙেনি। এমনভাবে পড়ে রয়েছে, ওটার আলো সরাসরি আমার মুখে এসে লাগছে। রীতিমত চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। ডান হাত তুলে চোখ ঢাকলাম।

শব্দটা কোনখান থেকেই আসছে না, আবার সবখান থেকেই আসছে। খুব কাছে, কানের ভিতর যেন শুনতে পাচ্ছি। বাহু আর ঘাড়ের রোম দাঁড়িয়ে গেল। মুমূর্ষু রোগীর মরণশ্বাসের মত শোনাচ্ছে আওয়াজটাকে।

উঠে দাঁড়াতে গিয়ে আরেকটু হলেই পিছলে পড়ে যাচ্ছিলাম। ফ্ল্যাশলাইটের হলদে আলোয় রঙিন বিন্দুর নাচানাচি—এ ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ছে না। এক হাতে মইয়ের ধাপ আঁকড়ে ধরলাম। কোন ভাবনা-চিন্তা না করেই মই বাইতে শুরু করলাম।

অর্ধেকখানি উঠবার পর মনে পড়ল বন্ধুদের কথা। কী করছি আমি!

ওঠা থামিয়ে ঝুলে রইলাম। মনে হচ্ছে হাত ছেড়ে দিলে নির্ঘাত মারা পড়ব। মুখ তুলে গোল গর্তটার দিকে চাইলাম। দিনের আলো আমাকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। যাও, উঠে যাও—কে একজন মনের মধ্যে তাগাদা দিচ্ছে। কিন্তু পারলাম না। বন্ধুদেরকে এখানে ফেলে রেখে পালাতে পারি না আমি।

গুঙিয়ে ওঠার শব্দ পেলাম আবারও। পিশাচটা কি গিলে খাচ্ছে ওদেরকে? কী করছে ওদেরকে নিয়ে কুৎসিত জীবটা? এর জবাব যে করে হোক জানতেই হবে আমাকে।

ধড়াস-ধড়াস লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ড, নেমে যাচ্ছি আবার।

ফ্ল্যাশলাইট তুলে নিতে গিয়ে টের পেলাম হাত কাঁপছে। সিউয়ারের উদ্দেশে তাক করে ধরলাম আলোটা।

সবুজাভ আঠাল পদার্থে লেপ্টে রয়েছে দেয়ালগুলো। কংক্রিট থেকে লম্বা তারের মত ঝুলে রয়েছে আঠা-আঠা জিনিসটা।

আলোটা চারপাশে ঘুরালাম। একটা টিনের ক্যানে আলো পড়ে ঝিকিয়ে উঠল। জঞ্জালের স্তূপে অর্ধেকটা দেবে আছে একটা উল্টানো কলার খোসা। চোখে পড়ল একটা বাঁকা ডালও মাথা জাগিয়ে রেখেছে আবর্জনার বুক চিরে।

হঠাৎ নিভু-নিভু হয়ে এল হলদে আলোর রেখা। একটা পাশে চাপড় দিতে আলো ফিরল, তবে আগের মত উজ্জ্বল নয়। আশা করছি, মুসা রাতে নতুন ব্যাটারি ভরেছিল। আবারও চারধারে ঘুরিয়ে আনলাম আলোটা।

আবছা আলো চকচকে বাম্প চারটায় আড়াআড়ি ছায়া ফেলল। প্রায় আমার মাথার সমান উঁচু একেকটা বাম্প। ওগুলোকে এখানে ঠিক যেন মানাচ্ছে না। তীক্ষ্ণধার কোনা নেই। নেই ডায়াল কিংবা নব। সিউয়ারে এ ধরনের জিনিসের প্রয়োজন কীসের?

আচমকা নড়ে উঠল একটা বাম্প।

জমে গেলাম আমি, গলার কাছে উঠে এল হৃৎপিণ্ড, ওই যে ওটা, নড়েচড়ে এগিয়ে আসছে আমার উদ্দেশে।

সাত

এক চুল নড়তে পারলাম না। নিথর দাঁড়িয়ে পিণ্ডগুলোর দিকে চেয়ে রইলাম। নড়ে উঠল আরেকটা। দেখে মনে হলো বুকে পাঁক ঠেলে এগোচ্ছে। চোখ পিটপিট করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালাম, উঁচিয়ে ধরেছি ফ্ল্যাশলাইট।

আটকা পড়েছে পিণ্ডগুলো। শুঁয়াপোকা প্রজাপতিতে পরিণত হওয়ার আগে দেহের চারপাশে যেরকম আবরণ তৈরি করে, এগুলোকেও ঠিক তেমনি দেখাচ্ছে। একটা ব্যতিক্রম অবশ্য রয়েছে–প্রায় ভিতর অবধি দেখা যাচ্ছে পিণ্ডগুলো। ধীর পায়ে সামনে এগোলাম।

পিণ্ডগুলোকে ছুঁতে চাই না, তাই দু'হাত পিছনে রাখলাম। কিন্তু যথেষ্ট কাছাকাছি হতেই ফ্ল্যাশলাইট তাক করে ধরলাম সবচেয়ে কাছেরটাকে লক্ষ্য করে।

তিন কি চার ফুট লম্বা, কিংবা আরেকটু বেশি হবে হয়তো। দেখে মনে হচ্ছে ভিতরে কিছু একটা আছে এটার। ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় পিণ্ডের মাঝখানটা আবছা চোখে পড়ছে।

ভিতরে কী যেন ভরে রেখেছে ওটা।

মুসাকে!

রবিন কোথায়?

থপ-থপ করে এগিয়ে গিয়ে, পুঁতে থাকা ডালটা আঁকড়ে ধরলাম এক হাতে। তারপর হিঁচড়ে নিয়ে এলাম মুসার কাছে। ফ্ল্যাশলাইটটা এমনভাবে আবর্জনার গাদার উপর রাখলাম, আলোটা যাতে সরাসরি মুসার উপর পড়ে। এবার ডালটাকে চেপে ধরলাম পিণ্ডটার গায়ে। শরীরের সমস্ত ওজন চাপিয়ে ঝুঁকে পড়লাম। অথচ সামান্য একটুখানি ভেদ করা গেল। বিকট দুর্গন্ধে মুখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হলাম। ডালটা বের করে নিতেই ফের বুজে গেল ক্ষতস্থান।

হঠাৎই মনে পড়ে গেল পিঁপড়েগুলোর কথা।

দৌড়ে ফিরে গেলাম যেখানে ভাঙা জার দুটো পড়ে আছে। একবার পা পিছলে মুখ থুবড়ে পড়লাম। উঠে দাঁড়ালাম সারা দেহে আঠাল জঞ্জাল নিয়ে, ঠাণ্ডায় কাঁপুনি উঠে গেছে–জিন্স আর সোয়েটশার্ট উৎকট দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে।

ঝাঁকে ঝাঁকে পিঁপড়ে জার ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। জ্যাকেট খুলে জারের খানিকটা মাটি আর কিছু পিঁপড়ে ওতে মাখিয়ে নিলাম। লাল পিঁপড়ে তীব্র কামড় বসাল আঙুলে। মনে হলো কেউ বুঝি পিন ফোটাচ্ছে। দু'হাতে জ্যাকেট আর মাটি বয়ে আনলাম পিণ্ডটার কাছে, চাপিয়ে দিলাম ওটার মাথায়।

আবার ফিরে গেলাম আরও মাটি আর পিঁপড়ে নিয়ে আসার জন্য। প্রতিটা পিণ্ডের উপর কিছু কিছু করে পিঁপড়ে ছেড়ে দিলাম। এবার ফ্ল্যাশলাইট উঁচিয়ে ধরলাম মুসাকে দেখার উদ্দেশ্যে।

পিণ্ডটার গর্ভে গুটিসুটি মেরে আটকা পড়ে রয়েছে ও।

পিঁপড়ের দল কাজে লেগে পড়েছে। দ্রুত খেয়ে সাফ করছে মুসাকে ঘিরে থাকা আঠার বর্ম। মুসার মাথার কাছে অনেকগুলো সুরঙ্গ খুঁড়ে ফেলেছে। হাত ঢুকিয়ে আঠাল পদার্থ সরাতে পারব এখন। কুৎসিত অনুভূতি জাগছে আমার আঙুলে, অসাড় ঠেকছে। বিকট দুর্গন্ধে মুখ ফিরিয়ে নিতে হলো। এবার জ্যাকেট দিয়ে মুসার নাক-চোখ মুছিয়ে দিলাম। গুঙিয়ে উঠল ও, আরেকটা শব্দও কানে বাজল এসময়। কোন

একটা সিউয়ার টানেল থেকে এসেছে।

কাজের গতি দ্রুততর হলো আমার। মুসার কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে ঘুম ভাঙাতে চাইছি।

'মুসা! মুসা! উঠে পড়ো। চলে এসো!'

চোখজোড়া খুলে গেল ওর। 'খাইছে!' চিৎকার ছাড়ল। সঙ্গে সঙ্গে চেপে ধরলাম মুখ।

ওর কাঁধ আর বাহু থেকে ঝেড়ে ফেলে দিলাম আঠা। ওর পরনে জ্যাকেট নেই, কিন্তু বুক পরিষ্কার করে দিতে গিয়ে ধাতব, লম্বা এক যিপার খসে পড়তে দেখলাম আবর্জনার স্তূপে। জিনিসটা কোত্থেকে এল সে সব কথা ভাবার সময় নেই। আঠা সাফ করে চলেছি প্রাণপণে।

'এসো,' জরুরী তাগিদ ফুটল আমার কণ্ঠে। হাত কাঁপছে তখনও। 'রবিনকে বাঁচাতে হবে। অন্যদেরকে উদ্ধার করতে হবে।'

মুসা এমনভাবে মাথা নাড়ল, ঘুম যেন ভাঙেনি পুরোপুরি। টলতে টলতে আঠার স্তূপ থেকে বেরিয়ে এল। নিজেকে মুক্ত করার সময় ওর দু'পা শোঁ-শোঁ শব্দ করল। দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে দেখে বাহু দুটো চেপে ধরলাম।

সেই টক-মিষ্টি দুর্গন্ধটা নাকে আসছে। জিভে ধাতব স্বাদ অনুভব করছি। ফ্ল্যাশলাইটের হলদে আভায় রীতিমত ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে মুসাকে। তবু মুসা পালোয়ান বলে কথা, নিজেকে ঠিক সামলে নিল ও। একটু পরে উদ্ধার কাজে হাত লাগাল আমার সঙ্গে।

রবিনকে মুক্ত করলাম প্রথমে। পিঁপড়ের দল ইতোমধ্যে ওকে ঘিরে থাকা আবরণ অনেকটাই সাবাড় করেছে। কিন্তু ওর ভাব-ভঙ্গি দেখে মনে হলো ও সজাগ হতে চাইছে না। বারবার চোখ বুজে আসছে। স্টাফ করা পুতুলের মত পিছনে হেলে পড়ছে মাথাটা। মুসাকে ওর পিছনে লাগিয়ে দিয়ে আমি গেলাম লম্বা চুলের মেয়েটিকে উদ্ধার করতে।

জোরাল হলো ছল-ছল শব্দটা। আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে সুরঙ্গ বেয়ে পানির স্রোত হড়-হড় করে নেমে আসছে বুঝি। আমাদেরকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে না তো? তা হলে আর রক্ষা নেই। এখানে কে খুঁজতে আসবে আমাদের?

খুব দ্রুত এগোচ্ছে না ওটা, হয়তো তার প্রয়োজনও নেই। ওটা জানে শিকার হাতের মুঠোতেই আছে।

'জলদি,' হিসিয়ে উঠলাম মুসার উদ্দেশে। 'রবিনকে বের করো।' রবিন সবে জাগতে শুরু করেছে। মেয়েটিকেও জাগিয়ে তুলতে পেরেছি

আমি।

খাটো চুলের ছেলেটি চোখ মেলেছে, কিন্তু ঠিক মত নড়াচড়া করতে পারছে না। হাত দুটো মরা সাপের মত অসাড়। অন্য কোন পরিবেশে দৃশ্যটা হয়তো হাসির খোরাক জোগাত।

হাত ধরে টান দিয়ে ছেলেটিকে বের করে আনলাম আঠার কারাগার থেকে। লক্ষ করলাম, ছেলেটির জুতোর শুকতলা হাওয়া। স্রেফ ফিতে আর উপরের অংশ লেপ্টে আছে। সজাগ হতে শুরু করল ছেলেটা।

বাচ্চা দুটো মইয়ের কাছে যেতে না যেতেই, খুব কাছ থেকে কানে বাজল ভীতিকর শব্দটা, ভয় হলো, শেষ রক্ষা হলো না বুঝি। সবাই হয়তো পার পাব না আমরা। মেয়েটি টলমল পায়ে যেন ঘুমের ঘোরে হাঁটছে। মুসা, রবিন আর ছোট ছেলেটির ঘোর অনেকটাই কেটে গেছে। কিন্তু মই বেয়ে উপরে ওঠা খুব সহজ কাজ নয়। তার উপর, একে-একে উঠতে হবে।

ফ্ল্যাশলাইটটা আঁকড়ে ধরে ভাঙা জার দুটোর উপর ঘুরিয়ে আনলাম। মাটির দুটো গাদা আর ভাঙা কাঁচ ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না। খুদে প্রাণীগুলো সটকে পড়েছে। আলোটা এবার ঘুরিয়ে এনে মইয়ের উপর ফেললাম।

রবিন পৌঁছে গেছে প্রায় মইয়ের মাথায়। ছেলেটি প্রায় হুমড়ি খেয়ে রয়েছে ওর গায়ের উপর। মেয়েটি ইতোমধ্যেই বেরিয়ে গেছে। বাকি শুধু মুসা আর আমি। আবারও দৃশ্যটা নজর কাড়ল আমার—জুতোর তলা গায়েব ছেলেটির। কেন? মুসার জ্যাকেটবিহীন যিপারটার কথাও মনে এল। ওর বাহু চেপে ধরলাম।

'প্লাস্টিক কীসে তৈরি?'

চোখ পিটপিট করে চাইছে মুসা।

'কীসে তৈরি?'

'তোমার জ্যাকেটটা এক ধরনের প্লাস্টিকে তৈরি, তাই না?' টক-মিষ্টি কটু গন্ধটা তীব্র হচ্ছে। 'প্লাস্টিকটা কি তেল থেকে তৈরি?' চেঁচিয়ে উঠলাম।

মাথা ঝাঁকিয়ে মই বাইতে লাগল মুসা।

চরকির মত ঘুরে দাঁড়িয়ে স্নিকার্স খুলে ফেললাম। মুসার জ্যাকেটের মত জুতোজোড়াও সস্তা প্লাস্টিকের। গায়ের জোরে দুই সুরঙ্গ লক্ষ্য করে দু'পাটী জুতো ছুঁড়ে মারলাম। পিশাচটাকে হয়তো খানিকক্ষণ ব্যস্ত রাখবে ও দুটো। ফ্ল্যাশলাইটটার দিকে দৃষ্টি দিলাম। এটাও প্লাস্টিক।

ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। দেয়ালে বাড়ি খেয়ে নিভে গেল ওটা।

মুসাকে অনুসরণ করে মই বাইতে শুরু করলাম।

তড়িঘড়ি করতে গিয়ে পা ফসকে গেল। হাতও পিছলে যাচ্ছে। মইটাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে ত্রস্ত ভঙ্গিতে উঠে যাচ্ছি। প্রতি পদক্ষেপে ওটার তাড়া করে আসার শব্দ শুনতে পাচ্ছি–ক্রমেই কমে আসছে দূরত্ব। দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে সবখানে।

মাথার উপরে আলোকিত আকাশ দেখতে পাচ্ছি। মুসা বেরিয়ে যেতে পেরেছে। সবাই পেরেছে, শুধু আমি বাকি।

মইয়ের শেষ ধাপটায় হাত রাখতে যাচ্ছি, কীসে যেন গোড়ালি পেঁচিয়ে ধরল আমার।

আট

আর্তনাদ করে উঠলাম। মুসা আর রবিনের নাম ধরে চেঁচাচ্ছি। পা ঝাড়া দিয়ে ছুটতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হলাম।

পিশাচটা পা ধরে টানছে, ধাপ থেকে যে জন্য হড়কে গেল অপর পা-টা। মই জড়িয়ে ধরে ঝুলে রইলাম নাছোড়বান্দার মত। কিছুতেই হার মানব না। টানাটানির ফলে নেমে এলাম ইঞ্চি তিনেক।

'মুসা! রবিন! আমাকে ধরে ফেলেছে!' গলা ফাটিয়ে চেঁচালাম। চারপাশের দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হলো আমার কণ্ঠস্বর।

ওরা কি আমার চিৎকার শুনতে পাচ্ছে না? তবে বাঁচাতে আসছে না কেন? ঘুম-ঘুম ভাবটা কি এখনও কাটেনি ওদের?

অনবরত পিছন দিকে টেনে চলেছে আমাকে পিশাচটা। মনে হচ্ছে পরীক্ষা চালাচ্ছে, কতক্ষণে হাল ছেড়ে দিই আমি।

মই থেকে খসে যাচ্ছে বাহু দুটো। অসাড়, দুর্বল আঙুলগুলো দিয়ে আঁকড়ে ধরলাম ঠাণ্ডা, ধাতব ধাপ। আস্তে আস্তে ঢিলে হয়ে আসছে আঙুলের বাঁধন। এভাবে বেশিক্ষণ ঝুলে থাকা সম্ভব হবে না।

'বাঁচাও!'

মাথায় বাড়ি খেলাম।

উপরে মুখ তুলে চেয়ে দেখি, একটা প্লাস্টিকের ফুটো বালতি নেমে আসছে। শরীর কাত করলাম। কাঁধে আঘাত করে ছিটকে সরে গেল

বালতিটা। বাঁ হাত ছুটে গেল মই থেকে। শুধু ডান হাত দিয়ে ঝুলে রয়েছি।

'খাইছে! সরে যাও,' মুসার চিৎকার।

তাকিয়ে দেখি ও একদৃষ্টিতে চেয়ে আমার দিকে।

'পারছি না!' গলা বুজে এল।

প্লাস্টিকের বড়সড় এক মিল্ক কার্টন পড়ল এরপর। আঘাত করল কাঁধে। তারস্বরে চেঁচাতে লাগলাম আবার।

হঠাৎই টের পেলাম পা ছেড়ে দিয়েছে পিশাচটা।

এক হাতে ঝুলে থেকে যেন সার্কাসের কসরত দেখাচ্ছি। টনটন করছে চারটে আঙুল, আর বুড়ো আঙুলটা বুঝি খসেই পড়বে।

হাত বাড়িয়ে মই ধরতে পারছি না। পা ছুঁড়ে দোল খেতে চেষ্টা করলাম। পিশাচটার পেট ভরে গেলে আবারও হামলে পড়বে আমার উপরে।

এসময় কব্জিতে চেপে বসল কারও হাত।

মুখ তুললাম। মুসার দু'হাত আর মাথা ঝুলছে গর্তের ভিতরে।

'শক্ত করে ধরো!' চেঁচাল ও।

আবারও পা ঝাড়া দিয়ে শরীর দোল খাওয়ালাম। আমার ডান হাত মইয়ের ধাপ থেকে ছুটে যেতেই বাঁ হাত চেপে ধরল ও। দু'হাতে বাঁ হাত আঁকড়ে ধরেছে মুসা।

'আমাদেরকে টেনে তোলো,' ঘাড় কাত করে চিৎকার ছাড়ল মুসা।

উঠে যেতে লাগল ও, আর সে সঙ্গে আমিও।

পিছনে শোঁ-শোঁ শব্দ করছে পিশাচটা। তরতর করে উঠে আসবে নাকি? প্রমাদ গুণলাম।

শেষমেশ দিনের আলোয় বেরিয়ে এলাম আমি পিশাচের আস্তানা ছেড়ে।

রাস্তার উপর চিত হয়ে পড়ে রইলাম, কষ্ট হচ্ছে শ্বাস নিতে। ছেলে-মেয়ে দুটোর দিকে চাইলাম। মড়ার মত ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে ওদেরকে। জঞ্জালের স্তূপ ঘিরে বসেছে ওরা। প্রত্যেকটা ট্র্যাশক্যান হাতড়ে প্লাস্টিকের ভাঙা ল্যাম্প, ছেঁড়াখোঁড়া গ্রোসারি ব্যাগ, সোডা পপ বোতল—এসব বের করেছে।

ঠিক এসময় সিউয়ার বেয়ে উঠে আসতে লাগল ছল-ছল শব্দটা। নাক কুঁচকে গেল দুর্গন্ধে। মনের চোখে দেখলাম, গা থেকে ময়লা-আবর্জনা খসে-খসে পড়ছে পিশাচটার।

'আমরা এখনও নিরাপদ নই। চলো, চলে যাই এখান থেকে।' কষ্টেসৃষ্টে উঠে দাঁড়ালাম। খাটো চুলের ছেলেটি তুলে নিচ্ছিল কিছু ভাঙা প্লাস্টিক। ওর বাহু চেপে ধরলাম। 'ফেলে দাও! আমাদেরকে পিঁপড়ে খুঁজে বের করতে হবে!'

টলমল পায়ে ছুটতে শুরু করলাম আমরা। প্রায়ই কেউ না কেউ পড়ে যেতে লাগল হোঁচট খেয়ে। কনুই আর হাঁটু ছড়ে গেল আমার। দুর্গন্ধটা তাড়া করে আসছে আমাদেরকে। শোঁ-শোঁ শব্দটাও জোরদার হয়েছে ভয়ানক রকম। আত্মা উড়ে গেছে আমার।

কোনার বাড়িটার কাছে পৌঁছে থমকে দাঁড়াতে হলো সবাইকে। বাচ্চা মেয়েটি কাঁদতে শুরু করেছে। ও আর দৌড়তে পারছে না। ছেলেটি ঘাসের উপর এলিয়ে পড়েছে। হাপরের মত হাঁফাচ্ছে।

রবিনের দিকে চাইলাম।

'ওটাকে খাইয়ে বড় করে তুলেছি আমরা।'

সায় জানাল ও। ঘুরে দাঁড়ালাম তিন বন্ধু।

'ওটা কিন্তু ধাওয়া করে আসছে,' শান্ত শোনাল রবিনের কণ্ঠ।

ওর বাহুতে হাত রাখলাম।

'পিঁপড়েগুলোকে কোত্থেকে জোগাড় করেছিলে?'

ফাঁকা জমিটার দিকে আঙুল তাক করল ও, যেখানে সেদিন দেখা হয়ে গিয়েছিল আমাদের।

রাস্তা পেরিয়ে আমাকে পৌঁছতে হবে ওখানে।

'সবাই তোমরা যত দূরে পারো সরে যাও,' দৌড়নোর ফাঁকে চেঁচালাম।

পাথুরে রাস্তায় ছুটতে সাঙ্ঘাতিক কষ্ট হচ্ছে। নিজের অজান্তেই অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠছি। পিছনে চেয়ে দেখি, রবিন আর মুসা ছেলে-মেয়ে দুটোকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করছে। অরচার্ড স্ট্রীট ধরে একটু পরে এগোতে লাগল ওরা।

কতটা দূরে গেলে পুরোপুরি নিরাপদ? জানি না।

একটা ধাতব বাক্সের কাছে পিঁপড়ের এক ঢিবি আবিষ্কার করলাম। চারধারে নজর বুলালাম। খুঁড়ব কী দিয়ে? চরকির মত ঘুরে দাঁড়ালাম। দাঁড়াও, অন্য ব্যবস্থা করছি।

ঢিবিটার পাশে দাঁড়িয়ে থেকে পা বদল করে লাফাতে লাগলাম। অবশ হয়ে আসা হাত দুটো দস্তুরমত ঝাঁকাচ্ছি। রবিনকে দিয়ে কাজটা করাতে পারলে ভাল হত। পিঁপড়েদের সঙ্গে দোস্তি আছে ওর। কিন্তু

বিধি বাম। ওদেরকে তো পালাবার সুযোগ করে দিতে হবে।

সিউয়ারের নীচে, আঠায় ঢাকা পড়া মূর্তিগুলোর ছবি ভেসে উঠল মনের পর্দায়। পিশাচটা ওর আস্তানায় আমাকেও ঘুম পাড়িয়ে রাখতে চেয়েছিল। চিরদিনের জন্য। শয়তানটা গোগ্রাসে গেলে। যেটা খাবে না সেটাকে বন্দী করে রেখে দেয়। দপ করে আগুন জ্বলে উঠল মাথার মধ্যে। ওটাকে খতম করতে হবে যে করে হোক। যা ভোগান্তি ভুগিয়েছে, ওটার মাফ নেই।

টয়লেট ছাপিয়ে যেন ময়লা পানি উঠে আসছে, এমনিভাবে গর্ত থেকে চুইয়ে বেরোতে লাগল কালো, অথচ রঙিন আলো চমকানো চকচকে তেল–শোঁ-শোঁ শব্দ করে এগোচ্ছে।

আমি জানি, একটু পরেই সটান খাড়া হয়ে দাঁড়াবে পিশাচটা। আমি ভুল ভেবেছিলাম। এটা আঠা ছাড়া কিছু নয়। হাজার হাজার, হয়তো লক্ষ লক্ষ প্লাস্টিকখেকো জীবাণুর সমষ্টি। তেল থেকে প্লাস্টিক বানানো হয়। গরমকালে পিঁপড়েরা গর্ত ছেড়ে বেরিয়ে এসে টক-মিষ্টি আঠা খায়। ঠাণ্ডা কিংবা বৃষ্টির মৌসুমে মাটির তলায় গিয়ে লুকায় পিঁপড়েরা, আর তখন মনের সাধ মিটিয়ে খাওয়ার সুযোগ পায় ওটা–এবং আকারে বাড়তে থাকে ক্রমেই।

'আয়, পারলে ধর আমাকে!' চিৎকার করে আমন্ত্রণ জানালাম। থমকে দাঁড়াল ওটা। শুনতে পেয়েছে যেন। 'আয়, কত খাবি খা!'

সহসাই শূন্যে ভেসে উঠে শরীর বিস্তার করে দিল পিশাচটা। দেখে মনে হলো উড়তে পারে। যা ভেবেছিলাম তার চাইতে দ্রুত এল ওটা। দৌড়ে পালাবারও সুযোগ দিল না। সভয়ে পিছু হটে গেলাম। পরক্ষণে মেজাজ উঠে গেল সপ্তমে। সামনে দু'কদম এগিয়ে গেলাম, হাত দুটো মুঠো করা।

'কই আয়, ময়লাখোর পিশাচ! ধর আমাকে!'

আমাকে চারপাশ থেকে যেন ঘিরে ধরল কালো পর্দা। মুখ তুলে চেয়ে দেখি আকাশ জুড়ে ভাসছে ওটা। টলে পড়ে গেলাম পিছন দিকে, বুকে হেঁটে সরে যাচ্ছি। পিশাচটা আছড়ে পড়ল আমার মুখের উপর, কাঁধে, বাহুতে আর পায়ে।

কীসের দংশনে জানি জ্ঞান ফিরল আমার। সারা গায়ে সুঁই ফোটাচ্ছে যেন কেউ। পিটপিট করে চাইলাম। মাথার উপরে অপূর্ব সুন্দর আকাশ–মেঘাচ্ছন্ন, ধূসর বর্ণ। মাথা তুললাম।

সাইডওয়কে টেনে আনা হয়েছে আমাকে। সারা শরীরে মহানন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে বড় বড় লাল পিঁপড়ে। ফুলে উঠেছে এখানে সেখানে।

'উফ!' বাহুতে চাপড় মারলাম। পরমুহূর্তে মনে পড়ল, আঠায় মাখামাখি আমার সর্বাঙ্গ। পিঁপড়েরা যত খুশি চরে বেড়াক, বললাম মনে মনে। আমার জীবন বাঁচিয়েছে ওরা।

পিঁপড়েদের দীর্ঘ সারি বয়ে চলেছে সিউয়ার ড্রেনের উদ্দেশে। খুশিতে হেসে উঠতে গিয়ে তীক্ষ্ণ খোঁচা খেলাম পেটের একপাশে।

হাত ঝাড়া দিয়ে পিঁপড়েগুলোকে ফেলে দিয়ে, সটান উঠে দাঁড়ালাম। সারা শরীরে ব্যথা। তাও ভাল, বেঁচে তো আছি।

এখনও নিশ্চিত নই আমি, পিশাচটা চিরতরে নিপাত গেছে। হয়তো পিঁপড়েদের ভয়ে কোথাও গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে। হয়তো আকারে কমে এসেছে ওটা। সবই অনুমান। কোন ঝুঁকি নিতে রাজি নই আমি।

আমরা তিন বন্ধু ছেলে-মেয়েদের নিয়ে একটা দল করেছি। সিউয়ার ড্রেনে যাতে কিছু ফেলা না হয় সে ব্যাপারে মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা করছি। বিশেষ করে তেল জাতীয় জিনিস।

নিখোঁজ বাচ্চাগুলোকে কীভাবে উদ্ধার করেছি বলতে গিয়ে ঝামেলায় পড়ে যাই আমরা। বড়রা অনেকেই বিশ্বাস করেনি আমাদের কথা। তাতে বয়েই গেল। ছোটরা সবাই বিশ্বাস করেছে। ফলে ওদেরকে নিয়ে ড্রেন ওয়াচ গ্রুপ বানাতে কোন সমস্যাই হয়নি আমাদের। খুশি মনে কাজটা করছে ওরা। বীর হয়ে গেছি আমরা ওদের চোখে।

রবিন আর মুসার ধারণা, পিশাচটা আর বিপদ ঘটাতে পারবে না। এখন অবশ্য গরমকাল। তাই নিশ্চিত হওয়ার উপায় নেই। তবে আর কোন বাচ্চার ছবিও দেখা যাচ্ছে না দুধের কার্টনে। বরঞ্চ এ বছর দেখতে পাচ্ছি ফিফথ অ্যান্ড অরচার্ডের কাছে, ফাঁকা জমিটায় ক্রমেই বড় হচ্ছে পিঁপড়ের ঢিবি। দেখে সাহস পাচ্ছি মনে।

***

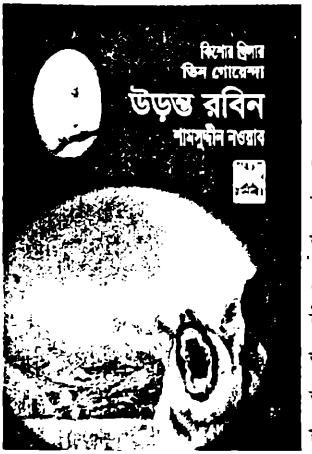

উড়ন্ত রবিন

শামসুদ্দীন নওয়াব

প্রথম প্রকাশ: ২০০৬

গভীর রাতে তাঁবুর বাইরে খসখস আওয়াজ শুনে চকিতে ঘুম ভেঙে গেল মুসার। কীসের আওয়াজ? চোর নাকি? মুহূর্তে চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলল ও মাথা থেকে। এখানে, ক্যালিফোর্নিয়ার উত্তর সীমান্তে, এই দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে চোর আসবে কী করতে? ওদের চারজনের কাছে আছেই বা কী চুরি করার মত? তা হলে কোনও জন্তু-জানোয়ার?

সারাটা দিন ঘোড়ায় চেপে চড়াই-উতরাই ডিঙিয়ে ক্লান্ত হয়ে এখন স্লিপিং-ব্যাগের ভিতর গভীর ঘুমে অচেতন ওর তিন সঙ্গী—কিশোর, রবিন ও ফারিহা।

কী ওটা? আরে! তাঁবুর ফ্ল্যাপটা সরে যাচ্ছে কেন একপাশে? বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রয়েছে মুসা। কাউকে জাগাবে নাকি? আড়চোখে একবার চাইল কিশোরের দিকে। দেখল কিশোরের এক চোখ খোলা, ভুরু নাচাল মুসার উদ্দেশে। ডানহাত বের করে আনল স্লিপিং-ব্যাগের ভিতর থেকে, মুঠোয় ধরা তাঁবুর খুঁটি গাড়বার হাতুড়িটা। আস্তে আস্তে সরে গেল ফ্ল্যাপ।

ভয়ার্ত একটা মুখ দেখা দিল তাঁবুর ভিতর। ওদের ইন্ডিয়ান গাইড, ট্রেফর। একমাথা এলোমেলো পাকা চুল, আর বুক-সমান অগোছাল দাড়ি নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকছে তাঁবুতে। থরথর করে কাঁপছে ওর সর্বাঙ্গ।

উঠে বসল কিশোর ও মুসা।

'কী ব্যাপার, ট্রেফর? কী হয়েছে?'

হড়বড় করে নিজের ভাষায় একগাদা দুর্বোধ্য শব্দ উচ্চারণ করল লোকটা কাঁপা গলায়। তার মধ্য থেকে বোঝা গেল কেবল একটা ইংরেজি শব্দ, 'নয়যেস্!' কীসের শব্দ, জানা গেল না বার বার জিজ্ঞেসা করেও, নিজের নোংরা কাঁথাটা টেনে নিয়ে ডিম্পল আর রবিনের মাঝখানে চলে এল সে, 'হিয়ার আই স্লিপ।'

আরে! গত দু'দিন অনেক সাধাসাধি করেও এই হাবাগোবা লোকটাকে তাঁবুর ভিতর শোয়ানো যায়নি, খোলা আকাশের নীচে না শুলে

নাকি ঘুম আসে না; মাঝরাতে আজ সে নিজেই এসে হাজির, শোবে–ব্যাপারটা কী?

'কীসের নয়েয, কিশোর?'

'আমরা তো কিছু শুনলাম না,' বলল কিশোর। 'হয়তো স্বপ্ন-টপ্ন দেখে থাকবে। জানা যাবে কাল সকালে।'

যে-যার স্লিপিং-ব্যাগে সেঁধিয়ে চেইন টেনে দিল কিশোর ও মুসা। ঘন কুয়াশা তো আছেই, অসম্ভব শীতও পড়েছে আজ। রবিন ও ফারিহা ঘুমাচ্ছে বেখবর।

পরীক্ষার পর দীর্ঘ একমাস ছুটি। আঙ্কেল ডিকের আমন্ত্রণে তাঁর সঙ্গে গাড়িতে চেপে রকি বিচ থেকে প্রায় এক হাজার মাইল দূরে ক্যালিফোর্নিয়ার উত্তর প্রান্তে টিলা-টক্করের রাজ্যে তাঁর এক আত্মীয়র খামার-বাড়িতে বেড়াতে এসেছে ওরা। বাবা-মার সঙ্গে ইউরোপে বেড়াতে গেছে বলে জিনা আসতে পারেনি ওদের সঙ্গে।

স্যান ফ্র্যান্সিস্কোকে বামে রেখে, স্টকটন-স্যাক্রামেন্টো ছাড়িয়ে আরও উত্তরে চলে এসেছে ওরা। তারপর রেডিং-এর ডাইনে সিয়েরা নেভাডার পাহাড়ি রাস্তা ধরে এঁকেবেঁকে আরও উত্তর-পুবে। শহর-গ্রাম ছাড়িয়ে পাহাড়ের মধ্য দিয়ে আঁকাবাঁকা, সরু পথ ধরে পৌঁছেছে ছবির মত সুন্দর এক ফার্ম-হাউসে।

ওখান থেকে চোদ্দো হাজার একশো বাষট্টি ফুট উঁচু মাউন্ট শাস্তা দেখা যায় পরিষ্কার, মনে হয়, এই তো হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে বুঝি।

মিস্টার ও মিসেস হ্যারল্ড এবং হাসিখুশি কাজের লোক ইভান্সের খাতির-যত্নে তিন দিনেই ওরা যখন টের পেল কয়েক কেজি করে বেড়ে গেছে ওজন, তখন ঘোড়ায় চেপে তিরিশ মাইল দূরের প্রজাপতি-উপত্যকা থেকে বেড়িয়ে আসবে বলে বেরিয়ে পড়েছে ওরা। ওখানে হরেক জাতের ফুল আর প্রজাপতি তো আছেই, পাখিরও নাকি সীমা-সংখ্যা নেই। আঙ্কেল ডিকেরও যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু রওয়ানা হওয়ার আগের সন্ধ্যায় উঠোনে পুঁতে রাখা গরু বাঁধবার খুঁটিতে হোঁচট খেয়ে পড়ে বাম হাতের কনুই মচকে গেছে তাঁর। বিশ মাইল দূরের একটা প্রাইভেট ক্লিনিকে এক্স-রে করিয়ে দেখা গেছে সামান্য চিড় ধরেছে হাড়ে। তিনদিন পর আসছেন বলে ওদের রওনা করিয়ে দিয়ে মোটা হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি সত্ত্বেও রয়ে গেছেন আঙ্কেল খামার বাড়িতেই।

সাতটা ঘোড়ার অর্ডার দেওয়া হয়েছিল, সক্কাল বেলা ওগুলো নিয়ে

হাজির হয়ে গেল ঘোড়ার মালিক থুথুরে বুড়ো ইন্ডিয়ান, ট্রেফর। ঘোড়াগুলো মোটাসোটা, শক্তিশালী—পাহাড়ে চলাচলের জন্য খুবই উপযোগী, কিন্তু আকারে খুব ছোট। কোনওটাই সাড়ে-তিনফুটের বেশি উঁচু না। একটা মাদি ঘোড়ার সঙ্গে পুতুলের মত, সুন্দর, ধবধবে সাদা, ছোট্ট একটা বাচ্চাও আছে—সোজা হয়ে দাঁড়ালে, বড় জোর আঠারো ইঞ্চি উঁচু হবে। বাচ্চাটার খুরের কাছে ইঞ্চি তিনেক জায়গা আর কপালের তিলকটা কালো হওয়ায় দারুণ সুন্দর দেখাচ্ছে। ওটার দুই গালের হালকা দাগ দেখলে মনে হয় টোল পড়েছে। দেখামাত্র ওটার নাম রেখে দিল রবিন ডিম্পল। অল্পক্ষণেই ভাব হয়ে গেল ওদের দুজনে। বেশ কিছুদিন যাবৎ লক্ষ করছে কিশোর, যে-কোনও জানোয়ারের সঙ্গে খুব সহজেই বন্ধুত্ব হয়ে যায় রবিনের। কেন যেন আজকাল দেখা-মাত্র ওর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে জন্তু-জানোয়াররা।

আঙ্কেল যেতে পারছেন না দেখে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে গাইড হিসাবে যেতে বলা হলো ট্রেফরকে। কিন্তু ওকে রাজি করানো কঠিন হলো। একে মানুষটা ইংরেজি বোঝে না, তার উপর একেবারেই হাবাগোবা কিসিমের। প্রথমে বলল প্রজাপতি-উপত্যকা চেনে, তারপর বলল চেনে না; শেষে ওর হাতে মিস্টার হ্যারল্ড একটা ম্যাপ ধরিয়ে দেওয়ায় নিমরাজি হয়ে মাল-সামান তুলে ফেলল দুটো ঘোড়ার পিঠে, তারপর চড়ে বসল একটায়। কিশোর-মুসা-রবিন আর ফারিহাও উঠে পড়ল যার যে-ঘোড়াটা পছন্দ হলো তার উপর। রবিনের সঙ্গে এরই মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব হয়ে গেছে বাচ্চা-ঘোড়া ডিম্পল-এর, মা-টা মালপত্র নিয়ে সবার আগে থাকলেও বাচ্চাটা চলল রবিনের পাশাপাশি। তিন গোয়েন্দার মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে বলে ডিম্পলের উপর খুবই অসন্তুষ্ট হলো মুসার প্রিয় কাকাতুয়া কিকো, কিন্তু কঠোর ভাষায় বকা-ঝকা দিয়েও ওকে তাড়াতে পারল না কিছুতেই।

দশদিন চলার মত খাবার ওদের সঙ্গে দিয়ে দিয়েছেন মিসেস হ্যারল্ড, কিপটেমি না করে পেট ভরে খেতে বলেছেন সবাইকে। বলে দিয়েছেন, ভয় নেই, আঙ্কেল ডিকের সঙ্গে আরও খাবার পাঠাবেন তিনি, কম পড়বে না।

দু' রাত দু' জায়গায় ক্যাম্প করেছে ওরা নির্বিঘ্নে, আজ এই তৃতীয় রাতে কী দেখল ট্রেফর, কীসের আওয়াজ শুনল যে এমন ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে তাঁবুতে এসে ঢুকল?

দুই

সকালে ঘুম থেকে উঠে অবাক হয়ে গেল ছেলেমেয়েরা। পাহাড়-পর্বত, গাছ-পালা ঝিকমিক করছে রোদ লেগে। গতকাল বিকেলে এমনই ঘন কুয়াশা পড়েছিল যে পাঁচহাত সামনের ঘোড়াটাকেও ভালমত দেখা যাচ্ছিল না। শেষে সন্ধ্যার আগেই থেমে তাঁবু গাড়তে বাধ্য হয়েছিল ওরা। অথচ আজ সব পরিষ্কার।

ঘোড়ার পরিচর্যা সেরে নাস্তা খেতে এল ট্রেফর। ওকে চেপে ধরল মুসা, 'কী হয়েছিল কাল রাতে, ট্রেফর? অত ভয় পেয়েছিলে কেন?'

'নয়যেস্,' বলল ট্রেফর সংক্ষেপে।

'কী ধরনের আওয়াজ?' এবার জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'কই, আমরা তো কিছুই শুনতে পেলাম না?'

মুখের খাবারটুকু কোঁত করে গিলে নিয়ে চোখ-মুখ পাকিয়ে ঐমন বিকট আওয়াজ করে উঠল ট্রেফর যে, চমকে উঠল সবাই। ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল রবিনের পাশে বসা ডিম্পল, মুসার কাঁধ ছেড়ে গাছের ডালে গিয়ে বসল কিকো। অবাক হয়ে চেয়ে রয়েছে তিন গোয়েন্দা ও ফারিহা বুড়োর মুখের দিকে।

হাত-পা নেড়ে, নানান অঙ্গভঙ্গি করে অনেক কথা বলে গেল ট্রেফর নিজের ভাষায়। তার মধ্যে এক-আধটা ইংরেজি শব্দও আছে। সব মিলিয়ে মোটামুটি বোঝা গেল: ঘোড়াগুলো ঠিক-ঠাক মত বাঁধা আছে কি না দেখতে গিয়েছিল সে গত রাতে। ওখানেই এইরকম আওয়াজ শুনতে পেয়ে দৌড়ে পালিয়ে এসেছে তাঁবুতে।

'সেইজন্যেই কিছু শুনতে পাইনি আমরা,' বলল কিশোর। 'ওর মুখে শুনে তো মনে হচ্ছে ভয়ঙ্কর হিংস্র কোনও জানোয়ার।'

ফ্যাকাসে হয়ে গেল ফারিহার মুখ। জিজ্ঞেস করল, 'কিশোর, তোমার কি মনে হয়, এরকম হিংস্র কোনও জানোয়ার এই অঞ্চলে থাকতে পারে?'

'আমি যতদূর জানি, নেই। কিন্তু ট্রেফরের কথা পুরোপুরি উড়িয়েও দিতে পারছি না।'

'ঠিক কী ধরনের জন্তু ওই রকম আওয়াজ করতে পারে?' এবার জিজ্ঞেস করল রবিন।

'খুব সম্ভব কাল্পনিক কোনও জানোয়ার,' বলল মুসা। 'হয়তো দুঃস্বপ্নও দেখে থাকতে পারে। কাল রাতে ওর চেহারাটা যদি একবার দেখতে!'

ক্যাম্প গুটানোর পর হাব-ভাব দেখে বোঝা গেল, আর এগোতে চায় না ট্রেফর, এখান থেকেই ফিরতে চায়; বারবার খালি আঙুল তুলে পিছনটা দেখায়। ওর কথা না বোঝার ভান করে দুই হাত দু' পাশে তুলে প্রজাপতির অনুকরণে ঝাপটাল, তারপর সামনে এগোল কিশোররা।

মুখ কালো করে ঘোড়ায় চাপল ট্রেফর, অনিচ্ছাসত্ত্বেও এগোল সবার আগে আগে। ওর কাছ থেকে ম্যাপটা চেয়ে নিয়েছে কিশোর, কিন্তু ওটা দেখে কিছুই বোঝা গেল না। প্রজাপতি-উপত্যকার অবস্থান দেখানো নেই ম্যাপে।

ট্রেফরের পিছু পিছু সারাটা দিন চলার পরও পৌঁছতে না পেরে ওদের মনে হলো আসলে ওরকম কোনও উপত্যকা নেই, মরীচিকার পিছনে ছুটছে ওরা।

হঠাৎ মুসা বলল, 'খেয়াল করেছ, কিশোর, গতকাল বিকেল পর্যন্ত আবছা হলেও একটা ট্র্যাক ছিল, এখন নেই।'

'তাই তো!' ঘোড়া থেকে নেমে চারদিকে ভাল করে নজর বুলাল রবিন। 'মনে হচ্ছে, কাল কুয়াশার মধ্যে পথ হারিয়ে ভুল পথে নিয়ে এসেছে ব্যাটা আমাদের। এভাবে চললে কোনওদিনই পৌঁছতে পারব না আমরা প্রজাপতি-উপত্যকায়।'

'আর এগোলে ফিরে যেতে পারব বলেও মনে হচ্ছে না,' বলল ফারিহা। 'কী মনে হয়, কিশোর?'

'এসো, আগে তাঁবুটা টাঙিয়ে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিই,' বলল কিশোর। 'তারপর ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে।'

একটা উঁচু পাহাড়ের মাঝামাঝি উচ্চতায় পৌঁছেছে ওরা। এখানে খাড়া উঠে গেছে পাহাড়ের গা, বেয়ে উপরে ওঠার কোনও উপায় নেই। কাছাকাছি একটা ঝরনা দেখে এখানেই ক্যাম্প করবে বলে ঠিক করল কিশোর। অনিচ্ছুক ট্রেফর ঘোড়ার পিঠ থেকে মাল-পত্র নামিয়ে দিল, তারপর ওগুলোকে কিছুটা দূরে লম্বা রশি দিয়ে গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে এল।

খাওয়া-দাওয়ার পর মনে হলো আজও তাঁবুর ভিতরেই শোবার ইচ্ছে ট্রেফরের। কিন্তু বেশ গরম পড়েছে বলে তাঁবুতে ঢোকার মুখেই খোলা আকাশের নীচে কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল সে। যদিও চেহারা দেখে যথেষ্ট শঙ্কিত মনে হলো ওকে।

অনেক রাতে তাঁবুর বাইরে ফোঁস-ফোঁস শ্বাস ফেলার শব্দে জেগে উঠল ফারিহা। ভয়ে কলজে শুকিয়ে গেল ওর। সেই ভয়ঙ্কর হিংস্র জানোয়ারটা না তো? মাথাটা স্লিপিং-ব্যাগের ভিতর ঢুকিয়ে নিয়ে চেইন টেনে দিল ও। পরমুহূর্তে লম্বা একটা ডাক ভেসে এল কিছুটা দূর থেকে।

জেগে গেল তিন গোয়েন্দা, এক লাফে উঠে বসেছে। দেখা গেল তাঁবুর ভিতর ফ্ল্যাপের কাছে দাঁড়িয়ে ভয়ে কাঁপছে ট্রেফর। ফ্ল্যাপ সরিয়ে দেখল কিশোর, বাইরেটা ভেসে যাচ্ছে চাঁদের রূপালি আলোয়। ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে মুসা ও রবিন।

ট্রেফরের আঙুল বরাবর তাকিয়ে চাঁদের আলোয় যা দেখল তাতে সর-সর করে মাথার চুল দাঁড়িয়ে গেল তিন গোয়েন্দার।

নেকড়ে! একপাল নেকড়ে বাঘ! চোখ রগড়াল তিন গোয়েন্দা, তার পরেও ওগুলো নেকড়েই থাকল। অবিশ্বাস্য ব্যাপার। একশো বছর আগেই এই এলাকা থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে নেকড়ে। এগুলো যদি নেকড়ে না হয়, তা হলে কী? ঘোড়াগুলোর কাছে কী করছে ওরা?

আবার একটা লম্বা ডাক ভেসে এল বাইরে থেকে। মুখ দিয়ে 'কেঁউ' করে একটা বিদঘুটে আওয়াজ করেই কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ল ট্রেফর মাটিতে। নিজের ভাষায় অনর্গল কী সব আবোলতাবোল বকছে নিচু গলায়। বাচ্চা ঘোড়াটাও কাঁপছে ওর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। ওদের ভয় দেখে কাঁপন ধরে গেল তিন গোয়েন্দার বুকের ভিতরও।

নির্বিকার রয়েছে একমাত্র কিকো। মুসার কাঁধে বসে ও-ও দেখেছে নেকড়েগুলোকে। 'দুষ্টু ছেলে!' বলে মুসার কাঁধ ছেড়ে উড়ে চলে গেল সে ব্যাপার কী তদন্ত করে দেখবে বলে।

সব কটা চোখ ফিরল এদিকে। চাঁদের আলো পড়ে ধক্ করে জ্বলে উঠল জানোয়ারগুলোর সবুজ চোখ।

ওদের মাথার উপর একপাক ঘুরেই ধমক মারল কিকো, 'পা মুছে ঘরে ঢোকো, গাধা কোথাকার!'

মানুষের গলা শুনে দৃশ্যতই চমকে উঠল জানোয়ারগুলো। পর-মুহূর্তে টানেলে ঢোকা রেল ইঞ্জিনের বিকট শব্দ শুনে পায়ের ফাঁকে লেজ দাবিয়ে নিচু হয়ে গেল ওরা। নিঝুম রাতে পাহাড়ের গায়ে প্রতিধ্বনি তোলায় আরও ভয়ঙ্কর শোনাল আওয়াজটা। এরপর কিকো যেই মোটরসাইকেল স্টার্ট দিল, সাহস হারিয়ে ঝেড়ে দৌড় দিল ওগুলো। ওদের তাড়া করে বেশ কিছুটা রাস্তা পার করে দিয়ে বিজয়ীর ভঙ্গিতে ফিরে এল কিকো। মুসার কাঁধে বসে মোলায়েম কণ্ঠে আদর করল ওকে, 'লক্ষ্মী, সোনা-

মানিক, মু-উ-উ-সা-আ!'

কিকোর ঝুঁটি চুলকে দিল মুসা, তারপর বলল, 'কী দেখলাম, কিশোর? স্বপ্ন, না সত্যি?'

রাতে ঘুমাতে পারল না কেউ। সকাল হতে ঘোড়াগুলো ঠিক আছে কি না দেখতে গেল ট্রেফর। সাবধানে এগোচ্ছে, চোখজোড়া সতর্ক দৃষ্টি বুলাচ্ছে আশপাশের ঝোপ-ঝাড়-জঙ্গলে। নিরাপদেই আছে ওগুলো, কারও কোন ক্ষতি হয়নি–তবে একটু যেন অস্থির। বাঁধন খুলে ঝরনায় নিয়ে গেল ট্রেফর ওদের পানি খাওয়াতে।

তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে চারদিকে চোখ বুলাল ফারিহা ও তিন গোয়েন্দা, রবিনের পায়ে পায়ে রয়েছে ডিম্পল। নেকড়ের চিহ্ন নেই কোথাও। এগাছে-ওগাছে পাখি ডাকছে; শান্ত, স্বাভাবিক, সুন্দর সকাল।

হঠাৎ ট্রেফরের ভয়ার্ত, তীক্ষ্ণ চিৎকার কানে যেতে সব কজন ফিরল ওর দিকে। দুই হাতে চোখ ঢেকে মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে বোকা লোকটা। তিন গোয়েন্দার মনে হলো কী যেন নড়ছে সামনের ঝোপের ওপাশে। কিন্তু বোঝা গেল না জিনিসটা কী।

আরেক চিৎকার দিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল ট্রেফর, তড়াক করে উঠে পড়ল একটা ঘোড়ায়। তীব্র গতিতে ছুটে আসছে তাঁবুর দিকে।

'পালাও!' চেঁচিয়ে উঠল সে, তারপর বলল, 'ব্ল্যাক! ব্ল্যাক!'

হাঁ করে চেয়ে রইল ওরা। লোকটা কী বলছে, কেন বলছে, কিছুই বুঝতে পারল না। বিস্ফারিত চোখে পিছন দিকে একবার চাইল ট্রেফর, তারপর ঘোড়াগুলোর দিকে আঙুল তুলে ইন্ডিয়ান ভাষায় বলল কী যেন। বোধহয় ওর পিছু নিয়ে এদিকে আসা হতচকিত ঘোড়ায় চেপে পালাতে বলছে ওদের।

ওরা চারজন সম্বিত ফিরে পাওয়ার আগেই তাঁবুর পাশ ঘেঁষে তুমুল বেগে ছুটল সে ফিরতি পথে। বাকি ঘোড়াগুলো দ্বিধান্বিত দৃষ্টিতে একে অন্যের দিকে তাকাল, তারপর ওদের সবাইকে অবাক করে দিয়ে ছুটল মালিকের পিছু পিছু।

'আরে! দাঁড়াও, দাঁড়াও! ফিরে এসো!' হাঁক ছাড়ল ওরা।

একটা ঘোড়া ঘাড় ফিরিয়ে চাইল, বোধহয় থামবে কি না ভাবল একটু; কিন্তু পিছন থেকে অন্যদের ঠেলা-ধাক্কা খেয়ে আবার ছুটল সামনে। কয়েক সেকেন্ডেই বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল ঘোড়াগুলো, দুই মিনিটের মধ্যে মিলিয়ে গেল ওদের ছুটন্ত ক্ষুরের আওয়াজ।

পরস্পরের মুখের দিকে চাইল ওরা।

'ভাল বিপদেই পড়া গেল দেখছি!' বলল কিশোর।

'কিন্তু পালাল কেন? আমাদের এভাবে ফেলে...' বলতে বলতে ডিম্পলের উপর চোখ পড়ল ফারিহার। 'দেখো, মায়ের সঙ্গে না গিয়ে রয়ে গেছে এটা আমাদের কাছে।'

'না, রবিনের কাছে,' বলল কিশোর। 'কপাল ভাল, মাল-পত্র সব নামিয়ে রাখা হয়েছিল, খাবারও রয়েছে প্রচুর। কিন্তু ব্যাটা বুদ্ধু ভয় পেল কী দেখে?'

'কী জানি!' মুখ খুলল মুসা, 'আমি দেখলাম, চোখ ছানাবড়া করে পালাতে বলছে আমাদের, আর "ব্ল্যাক! ব্ল্যাক!" বলে তারস্বরে চেঁচাচ্ছে।'

'দাঁড়াও দেখি, কী দেখে এমন ভয় পেল লোকটা,' বলে পা বাড়াল কিশোর। 'তোমরা এখানেই থাকো, সাহায্য চাইলে এগোবে।'

ঘুরে-ফিরে দেখে মাথা নাড়ল কিশোর। 'নাহ্, কিছুই নেই এখানে।' ভুরু কুঁচকে ফিরে এল সে তাঁবুর পাশে। 'হয়তো হ্যালিউসিনেশন।'

'কিন্তু রাতের ওই জন্তুগুলো?' প্রশ্ন তুলল রবিন। 'ওগুলো তো আর কাল্পনিক কিছু নয়। আমরা তিনজনই দেখেছি, তাই না?'

হ্যাঁ, কোনও সন্দেহ নেই, ওগুলো জলজ্যান্ত বাস্তব!

তিন

নাস্তার কথা মনে হতেই ব্যস্ত হয়ে উঠল ফারিহা। থলে থেকে বের করল কয়েকটা টিন। পাউরুটি বাসি হয়ে যাওয়ায় ওরা ঠিক করেছে, এখন থেকে টিনের খাবারই খাবে। দুই টিন সার্ডিন, দুই টিন আনারস, দুই টিন পিচ আর এক টিন কাজু বাদাম বের করল ও। ডিম্পল-এর জন্য বের করল এক কৌটা দুধ আর এক টিন সেদ্ধ ছোলা। ওকে উদার হস্তে খাবার বের করতে দেখে মুসাকে ছেড়ে ফারিহার কাঁধে চাপল কিকো। কানে কানে বলল, 'ফারিহা ভাল।'

'হয়েছে, আর তেল মারতে হবে না, মতলববাজ কোথাকার!' বলল ফারিহা ওর ঝুঁটি চুলকে দিয়ে। বলল বটে, কিন্তু খাওয়ার সময় দেখা গেল স্পেশাল খাতির পাচ্ছে কিকো।

খাবার পছন্দ হয়েছে ডিম্পল-এরও, দুধের বাটিতে একটা করে চুমুক

দেয়, তারপর খানিকটা ছোলা মুখে নিয়েই তিড়িং-বিড়িং লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে এক চক্কর দৌড়ে এসে রবিনের সামনে দাঁড়িয়ে ঘোঁত করে নাক টানে। রবিন একটু আদর করে দিলেই আবার চুমুক দেয় দুধের বাটিতে। প্রাণবন্ত বাচ্চাটা থেকে যাওয়ায় সবাই ওরা খুশি; যে হাতের কাছে পাচ্ছে, সে-ই একটু আদর করে দিচ্ছে।

নাস্তা শেষ হতে জানতে চাইল রবিন, 'এবার? এবার কী করব আমরা? প্রজাপতির পেছনে তো আর দৌড়াবার উপায় নেই। তা হলে?'

'আঙ্কেল না আসা পর্যন্ত এখানেই বসে থাকতে পারি,' বলল মুসা। 'ট্রেকার বুড়ো ফিরে গেলেই ছুটে আসবে আঙ্কেল। নেকড়ের গল্প শুনলে উড়েই চলে আসবে।'

'কিন্তু ততদিনে নেকড়ের পেটে না চলে যাই,' বলল ফারিহা।

'না, তা যাব না,' বলল কিশোর। 'তার একটা ব্যবস্থা করতে হবে আমাদের। ঠিকই বলেছে মুসা, আমরা নিজেরা ফেরার চেষ্টা করতে গেলে পথ হারিয়ে বিপদ বাড়াব; এখানেই নিরাপদ একটা জায়গা খুঁজে নিয়ে অপেক্ষা করা উচিত।'

থালা-বাটি ধোয়ার জন্য উঠতে যাবে, এমনি সময়ে গুমগুম করে গম্ভীর একটা আওয়াজ শোনা গেল; মনে হলো পাহাড়ের ভিতর থেকে আসছে শব্দটা। পরমুহূর্তে কেঁপে উঠল জমি। পাথর হয়ে জমে গেল ওরা। চ্যাঁ করে ডাক ছেড়ে শূন্যে উঠল কিকো, এক লাফে একটা পাথরের উপর উঠে দাঁড়াল ডিম্পল।

একটু পরেই থেমে গেল কাঁপন, আওয়াজটাও মিলিয়ে গেল। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পর আবার শোনা গেল সেই গুরুগম্ভীর শব্দ, এবার আগের চেয়ে জোরে। তারপর আবার কাঁপুনি।

ভয় পেয়ে আবার লাফিয়ে উঠল ডিম্পল, নামল কয়েক হাত দূরে আরেকটা পাথরের উপর।

ঘাবড়ে গেছে তিন গোয়েন্দা, ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ফারিহার মুখ–খপ্ করে হাত চেপে ধরেছে মুসার। তবে আর কাঁপল না মাটি, আওয়াজও শোনা গেল না আর। পাখির কিচিরমিচির থেমে গিয়েছিল, শুরু হলো আবার। পাথর থেকে নেমে এল ডিম্পল, কিকো ফিরে এসে বসল মুসার কাঁধে। বলল, 'হ্যাঁ, এবার পড়তে বসো তো। পাঁচের পাতা খোলো সবাই।'

'খাইছে! ব্যাপারটা কী হলো, কিশোর?' জিজ্ঞেস করল মুসা। 'ভয়ে জান উড়ে গিয়েছিল আমার। ভূমিকম্প?'

'আর আওয়াজটা?' এবার প্রশ্ন রবিনের। 'আগ্নেয়গিরির?'

'মনে হয় না,' বলল কিশোর। 'কোনও সন্দেহ নেই, শব্দ আর কাঁপুনি সামনের ওই পাহাড়ের ভেতর থেকেই এসেছে, কিন্তু এটা যে আগ্নেয়গিরি নয় তা তো দেখাই যাচ্ছে পরিষ্কার। তা হলে? ব্যাপারটা তা হলে কী হলো? বাপ-রে! অন্তরাত্মা কাঁপিয়ে দিয়েছে একেবারে!'

'আমার মনে হচ্ছিল,' বলল ফারিহা, 'এক্ষুনি বুঝি হাজার টুকরো হয়ে ভেঙে পড়বে গোটা পাহাড় আমাদের মাথার ওপর। পাহাড়টা একদম ভাল লাগছে না আমার, এর থেকে দূরে সরে থাকতে পারলে কাজ হত।'

থালা-বাসন ধুয়ে ঝরনার পানিতে গোসল সেরে নিল ওরা। তারপর নিরাপত্তার চিন্তা ঢুকল ওদের মাথায়। খোলা জায়গায় তাঁবুতে রাত কাটানো ঠিক হবে না। ঝড়-তুফানের ভয় তো আছেই, আসল ভয়…

হ্যাঁ, ওই নেকড়েগুলো ফিরে আসতে পারে আবার। গুমগুমে পাহাড়ের কাছাকাছি আরেকটা পাহাড়ের গায়ে কিশোরকে চোখ বুলাতে দেখে মুসা জিজ্ঞেস করল, 'গুহা খুঁজছ? ওই ওপরে একটা চোখে পড়েছে আমার।'

'চলো, দেখে আসি,' বলেই পা বাড়াল কিশোর।

গুহাটা পছন্দ হলো সবার, ডিম্পল তো থাকল রবিনের পায়ে পায়ে, একটু সাহায্য করতে ফারিহাও উঠে এল সহজেই; কিন্তু একটাই অসুবিধা—এখানে উঠতে হলে চার হাত-পা ব্যবহার করতে হয়—জিনিসপত্র আনবে কী করে? স্লিপিং-ব্যাগ ছাড়াই না হয় ঘুমানো গেল, কিন্তু নেকড়ে ঠেকাবার জন্য গুহামুখের কাছে আগুন জ্বেলে রাখতে হলে নীচ থেকে প্রচুর শুকনো কাঠ তুলে আনতে হবে, সেগুলো তোলা যাবে কী করে?

ভাবছে তিন গোয়েন্দা, এমনি সময়ে মুসার কাঁধ ছেড়ে শূন্যে উঠে গেল কিকো, সবাইকে চমকে দিয়ে 'চিঁ-হিঁ-হিঁ' শব্দে ঘোড়ার ডাক ডেকে উঠল উপর থেকে। গড়াগড়ি দিচ্ছিল, লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল ডিম্পল; পাথরের কিনারে গিয়ে নীচে কী যেন দেখতে চেষ্টা করছে।

'নেকড়েগুলো ফিরে এলো নাকি আবার?' বলে উঠল ফারিহা।

ঠোঁটে আঙুল রেখে সবাইকে চুপ করে থাকবার ইশারা করল মুসা। ওর কানে কিছু একটা শব্দ ধরা পড়েছে। একটু পরেই সবাই শুনতে পেল, বার্চ গাছের নীচের ঘন ঝোপ-জঙ্গল মাড়িয়ে কী যেন এগিয়ে আসছে এদিকে।

'নিচু হয়ে থাকো সবাই!' বলল কিশোর ফিসফিস করে।

ঢিব-ঢিব করছে বুক। পায়ের শব্দ শুনে বোঝা যাচ্ছে বড়সড় কোনও জানোয়ার হবে। আসছে এদিকেই!

চার

হঠাৎ জোরে ডেকে উঠল ডিম্পল, তারপর কেউ তাকে ঠেকাবার আগেই হুড়মুড় করে নীচে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেল ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে। পরমুহূর্তে নীচ থেকে ভেসে এল আনন্দ-ধ্বনি।

'চিঁ-হিঁ-হিঁ-হিঁ! খোঁৎ!'

সঙ্গে সঙ্গে অনুকরণ করল কিকো সে আওয়াজ।

'আরে! ঘোড়ার আওয়াজ মনে হচ্ছে!' উঠে দাঁড়াল রবিন। 'ফিরে এল নাকি ট্রেফর?'

একটু পরেই বোঝা গেল ব্যাপারটা। সন্তানের খোঁজে ফিরে এসেছে ডিম্পল-এর মা। তাঁবুর পাশে দাঁড়িয়ে এখন বাচ্চাকে দুধ খাওয়াচ্ছে, আর জিভ বুলিয়ে আদর করছে ওর সারা গায়ে। ট্রেফর বা অন্য ঘোড়াদের কোনও খবর নেই।

পাহাড় বেয়ে নেমে এল ওরা চারজন। পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করল ঘোড়াটাকে। ওর নাম রেখে দিল ফারিহা—সুইটি। ওদের মস্ত বড় একটা সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে ডিম্পলের মা। ওর সাহায্যে সারাদিনে কিছু-কিছু করে সমস্ত মাল-পত্র নিয়ে যেতে পারবে ওরা গুহায়।

বিনা আপত্তিতে খাবার-দাবার ও মাল-পত্র পৌঁছে দিল সুইটি ওদের নতুন আস্তানায়। তারপর ঝরনায় নেমে ওদের সঙ্গে গোসলটা সেরে নিয়ে নিশ্চিন্ত মনে তীরের ঘাসে মুখ দিল।

দুপুরের খাওয়া সেরে খানিক বিশ্রাম নিয়েই গাছের শুকনো ডাল সংগ্রহে মন দিল ওরা। ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় লাকড়ির বিরাট এক স্তূপ জমিয়ে ফেলল ওরা তাঁবুর পাশে। মুসা আর কিশোর ওগুলো ছোট করে ভেঙে বা কেটে আঁটি বাঁধল, সুইটির পিঠে চাপিয়ে ওগুলো নিয়ে গুহার সামনে সাজিয়ে রাখল রবিন আর ফারিহা।

সন্ধের আগেই নীচের সব কাজ সেরে কিকো, সুইটি ও ডিম্পলকে নিয়ে উঠে এল ওরা গুহায়। ভিতরে প্রচুর জায়গা রয়েছে, কিন্তু সুইটিকে গুহায় ঢুকতে রাজি করানো গেল না, ও শুয়ে পড়ল বাইরেই। মোটা একটা শিকড়ের সঙ্গে ওকে বেঁধে রেখে ডিম্পলকে নিয়ে গুহার ভিতর ঢুকে পড়ল ওরা। যত্নের সঙ্গে লাকড়ি সাজিয়ে ফেলল মুসা গুহামুখের সামনে, আগুন

ধরানো হবে পশ্চিম আকাশের লাল ছোপ মিলিয়ে গিয়ে আঁধার ঘনিয়ে এলে।

একটা-দুটো করে উজ্জ্বল তারা ফুটতে শুরু করল আকাশের এখানে-ওখানে। কিছুক্ষণের মধ্যেই গোটা আকাশ ছেয়ে ফেলল তারার ঝালর। এইবার গুহামুখে সাজানো কাঠে আগুন ধরিয়ে দিল মুসা। তারপর হঠাৎ পিছন ফিরল, 'আচ্ছা, কিশোর, ট্রেফরের "ব্ল্যাক! ব্ল্যাক!"টা কী জিনিস ভেবে কিছু বের করতে পারলে?'

মাথা নাড়ল কিশোর। 'নাহ্! ঝোপের আড়ালে একটু যেন নড়াচড়া দেখেছি বলে মনে হলো, তবে সেটা আমার মনের ভুলও হতে পারে। সেই থেকে ভাবছি, কিন্তু বুঝতে পারছি না কী দেখে অমন ভয় পেয়ে পালাল বোকা লোকটা।'

'না, তোমার মনের ভুল বলে মনে হয় না আমার,' বলল রবিন। 'আমিও কিছু একটা নড়ে উঠতে দেখেছি।'

'আমিও,' বলল মুসা। 'তিনজন একই সঙ্গে ভুল দেখতে পারি না। কালো কিছু দেখেছে ট্রেফর ওখানে। ভালুক-টালুক?'

বেশ জোরেশোরেই জ্বলছে আগুন। বাইরে রাতটা যতই কালো হোক না কেন, গুহার ভিতর নিজেদেরকে সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে হচ্ছে ওদের। আগুনের কারণে পাহাড়ি ঠাণ্ডাও ঢুকতে পারছে না এখানে। স্লিপিং-ব্যাগের ভিতর আরামে বুজে এল সবার চোখ।

মনের ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে রেখেছিল রবিন, ঠিক দু' ঘণ্টা পর জেগে উঠল ও। আগুনটা নিভু-নিভু হয়ে এসেছে দেখে স্লিপিং-ব্যাগ থেকে বেরিয়ে এল সে আরও কাঠ চাপাবে বলে। আগুন নিভতে দেওয়া চলবে না।

বাইরে বেশ শীত। চুপচাপ শুয়ে আছে সুইটি। আগুনটা ভাল মত ধরে যেতে ফিরে এসে স্লিপিং-ব্যাগে ঢুকল রবিন। কিন্তু না ঘুমিয়ে চেয়ে থাকল কাঁপা-কাঁপা শিখার দিকে। ঘণ্টা দুয়েক পর কিশোরকে জাগিয়ে দিয়ে নিজে ঘুমাবে। কিশোরের পর জাগবে মুসা।

বাইরে বাতাস আছে। মাঝে মাঝে গুহার ভিতর ঠেলে নিয়ে আসছে ধোঁয়া, কাশি এসে যাচ্ছে রবিনের। আকাশ-পাতাল ভাবছে ও। হঠাৎ ওর মনে হলো বাইরের পরিবেশটা কেমন যেন বদলে গেছে: শুয়ে ছিল, ধড়মড় করে উঠে বসেছে সুইটি। ব্যাপার কী দেখার জন্য কনুইয়ে ভর দিয়ে উঁচু হলো রবিন, পরমুহূর্তে ধুপ-ধাপ লাফাতে শুরু করল ওর হৃৎপিণ্ডটা।

ছায়ার মত কারা যেন নিঃশব্দে নড়ে বেড়াচ্ছে বাইরে। আগুনের ওপাশেই রয়েছে, তবে আগুনকে তেমন ভয় পাচ্ছে বলে মনে হলো না। কী ওগুলো! নেকড়ে? হঠাৎ ধক্ করে জ্বলে উঠল এক জোড়া চোখ, যেন বহুদূরের কোনও গাড়ির সবুজ হেডলাইট। ধীর ভঙ্গিতে উঠে বসল রবিন।

ফিরে এসেছে নেকড়ের দল! গন্ধ শুঁকে বের করে ফেলেছে ওদের আস্তানা। কী করবে ওরা এখন? দেখাই যাচ্ছে, সুইটিকে আক্রমণ করেনি ওরা এখনও। আর সুইটিও অস্বস্তি বোধ করছে ঠিকই, কিন্তু সাঙ্ঘাতিক ভয় যে পেয়েছে, এমন মনে হচ্ছে না।

ছায়াগুলো আগুনের ওপাশেই থাকল। নড়াচড়া দেখে মনে হলো ভিতরে আসার পথ খুঁজছে। কী করবে বুঝতে পারছে না রবিন। আশা করছে, আগুন ডিঙিয়ে এপাশে আসবে না ওরা।

কিছুক্ষণ পর হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল নেকড়ের ছায়া। যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল রবিনের। ভয়ে কণ্ঠার কাছে চলে এসেছিল ওর প্রাণটা। ভাগ্যিস আগুনের বুদ্ধিটা এসেছিল ওদের মাথায়! ঘুমের বারোটা বেজে গেছে, এখন আগুনটা চাঙ্গা রাখাই সবচেয়ে বড় কাজ, নিভতে দেওয়া চলবে না কিছুতেই। স্লিপিং-ব্যাগে না ঢুকে বসে থাকল ও। ভাবছে: ট্রেফরের ভয় পেয়ে পালিয়ে যাওয়া, পাহাড়ের ভিতর থেকে গুমগুম আওয়াজ, থরথর করে মাটি কেঁপে ওঠা—এসবের কী মানে?

আবার নিভে এল আগুন। মন-খানেক শুকনো লাকড়ি চাপাল রবিন ওর উপর। বাইরে তাকিয়ে দেখল চাঁদ উঠেছে বলে বহুদূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। আগুনটা আবার তেজি হয়ে উঠতেই গুহা থেকে বেরিয়ে গেল ও সুইটির খবর নিতে।

এমনি সময়ে পিছনে সামান্য শব্দ হতেই চমকে ঘুরে দাঁড়াল রবিন। দেখল, গুহামুখের সামনে দাঁড়িয়ে ওর দিকে চেয়ে রয়েছে বিশালকায় এক নেকড়ে। ওকে সুইটির দিকে এগোতে দেখেই এক লাফে আগুন ডিঙিয়ে চলে এসেছে এপাশে। এবার কি গুহার ভিতর ঢুকবে ওটা?

দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে থাকল দীর্ঘ কয়েকটা মুহূর্ত। রবিন ভাবছে, জানোয়ারটা আক্রমণ করে বসলে কী করবে, এমনি সময়ে আশ্চর্য একটা ব্যাপার চোখে পড়ল ওর।

লেজ দোলাচ্ছে নেকড়েটা! এপাশ থেকে ওপাশ, ওপাশ থেকে এপাশ—ঠিক যেন বিশাল আকারের পোষা একটা কুকুর। পরিষ্কার বুঝল রবিন, বন্ধুত্ব করতে চাইছে ওটা ওর সঙ্গে! ও বেশ কিছুদিন আগেই লক্ষ করেছে, অনেক জন্তু-জানোয়ার ওর প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ বোধ করে, কিন্তু

তাই বলে নেকড়ে বাঘও?

এক হাত বাড়িয়ে দিল ও সামনে। এগিয়ে এসে হাতটা চেটে দিল জানোয়ারটা, কুঁই-কুঁই শব্দ করল—আদর চায়। বিনা দ্বিধায় ওর মাথায় হাত বুলাল রবিন।

চাঁদের আলোয় জানোয়ারটার চোখা কান আর লম্বা মুখ খেয়াল করল রবিন। এটা কি সত্যিই নেকড়ে? কাছ থেকে দেখে সন্দেহ জাগল ওর মনে। তারপর হঠাৎই চিনে ফেলল ও।

'আরে! তুমি তো অ্যালসেশিয়ান কুকুর, তাই না? তাই তো বলি, এই অঞ্চলে নেকড়ে আসবে কোত্থেকে? তোমার সঙ্গীরা গেল কোথায়? সবাই তা হলে তোমরা অ্যালসেশিয়ানের গুষ্টি। গুড ডগ! তোমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে ভালই লাগবে আমার।'

উত্তরে সামনের দুই-পা তুলে দিল ওটা রবিনের কাঁধে, চেটে দিল ওর গাল। তারপর ঠিক নেকড়ের মত 'আ-উ-উ' করে লম্বা এক হাঁক ছাড়ল।

ডাক শুনে চারদিক থেকে ছুটে এসে রবিনকে ঘিরে ধরল দলের আর সব সদস্য। নেতার সঙ্গে রবিনের দোস্তি দেখে মুহূর্তে ওরাও বন্ধু হয়ে গেল ওর, কে কার আগে ওর হাত বা গাল চাটবে তার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল ওদের মধ্যে।

গুহার ঠিক বাইরে নেকড়ের ডাক শুনে লাফিয়ে উঠে বসল কিশোর-মুসা-ডিম্পল ও ফারিহা। ডানার ভিতর থেকে মাথা বের করল কিকোও।

আচমকা ঘুম থেকে উঠে দেখল ওরা গুহার বাইরে রবিনকে ঘিরে ধরেছে ভয়ঙ্কর একদল নেকড়ে। কিশোরের স্লিপিং-ব্যাগের পাশ থেকে ছোঁ মেরে হাতুড়িটা তুলে নিল মুসা।

'খেয়ে ফেলল!' চেঁচিয়ে উঠল ও, 'খেয়ে ফেলল রবিনকে!' বলেই মাথার উপর হাতুড়ি তুলে গুহা থেকে ছুটে বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম করল মুসা, ওর দু' পাশে রয়েছে ফারিহা ও কিশোর।

ছোট একটা লাকড়ি ফারিহার হাতে। চেঁচিয়ে বলল, 'আসছি আমরা, রবিন।'

অন্য মানুষের সাড়া পেয়ে 'গররর' শব্দে ধমক দিল কুকুরগুলো।

সঙ্গে সঙ্গে পালটা ধমক দিল কিকো, 'গররর!'

অবাক হয়ে সব কটা চোখ ফিরল উড়ন্ত কিকোর দিকে। মুসার কাঁধে বসে আবার হুমকি দিল কিকো—যেন ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে সব কটাকে।

'দাঁড়াও! দাঁড়াও!' সবাইকে মারমুখো ভঙ্গিতে এগিয়ে আসতে দেখে চেঁচাল রবিন। 'এরা আমার কোন ক্ষতি করছে না, বন্ধুত্ব করতে এসেছে।

নেকড়ে না, এরা আসলে অ্যালসেশিয়ান কুকুর।'

'ইয়াল্লা!' বলে উঠল ফারিহা। এগুলো আসলে কুকুর, নেকড়ে নয়, জেনে আতঙ্ক দূর হয়ে পরম স্বস্তি বোধ করছে এখন। 'রবিন, আমরা ভেবেছিলাম খেয়ে ফেলছে তোমাকে!'

হাসল রবিন ফারিহার হাতে ধরা ছোট্ট লাকড়ির দিকে চেয়ে। একহাতে ওকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'আমাকে বাঁচাবার জন্যে তোমরা সবাই যেভাবে তেড়ে এসেছো, মনটা আমার এত্তোবড় হয়ে গেল, ফারিহা।' কুকুরগুলোর দিকে চাইল, 'এদের নেতাটা আমার সঙ্গে ভাব করে ফেলায় এরাও আমাকে বন্ধু বলে মেনে নিয়েছে। কিন্তু এদের তো যাওয়ার লক্ষণ দেখছি না। কিশোর, আমরা এখন গুহার ভেতর শুতে গেলে মনে হচ্ছে এরাও গিয়ে ভিড় করবে। কী করা?'

'আমরাই স্লিপিং-ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে আসতে পারি,' বলল কিশোর। 'আশপাশে ওরা থাকলে ক্ষতি নেই, বরং ভালই, পাহারা দিয়ে রাখবে আমাদের। আর থাকতে না চাইলে চলে যাবে।' একটু থেমে আবার বলল কিশোর, 'কিন্তু যাবে কোথায়? দশ-দশটা বিশাল অ্যালসেশিয়ান ঘুরে বেড়াচ্ছে বিরান এই পাহাড় আর জঙ্গলে, কেমন অদ্ভুত না? খাচ্ছে কী?'

উত্তরটা জানা নেই কারও।

বাইরে টেনে আনল ওরা স্লিপিং-ব্যাগ। কুকুরগুলো কৌতূহল নিয়ে ঘুরে-ফিরে দেখল ওগুলো, গন্ধ নিল। তারপর শুয়ে পড়ল ওদের পাশে। মায়ের কাছ থেকে দুধ খেয়ে এসে ডিম্পল দেখল, ওর জায়গা বে-দখল হয়ে গেছে–রবিনের মাথার কাছে যমদূতের মত বসে আছে দলনেতা, যেন বলতে চায়: এই ছেলেটা আমার, খবরদার, কেউ আসবে না কাছে!

ওকে ঘাঁটাবার সাহস হলো না ডিম্পল-এর, কিশোরের পাশে গিয়ে শুয়ে পড়ল। প্রতিপক্ষ হিসাবে এতগুলো ভয়ালদর্শন কুকুর কিকোর জন্যও একটু বেশি, নিজের অধিকার ছেড়ে দিয়ে উড়ে গিয়ে বসল সে নাগালের বাইরে একটা গাছের ডালে। সেখানে ডানার নীচে মাথা গুঁজে কিছুক্ষণ ঘুমায়, কিছুক্ষণ মাথাটা বের করে কঠোর ভাষায় বকা লাগায় সে কুকুরগুলোকে।

পাঁচ

সকালে প্রচণ্ড এক হাঁচি মেরে ঘুম থেকে ওঠাল ওদের সুইটি। চমকে উঠে বসল সবাই, এদিক-ওদিক চাইল ব্যাপার কী বোঝার জন্য। সুইটি দ্বিতীয় হাঁচি দিতেই বোঝা গেল।

'আরে! কুকুরগুলো কোথায়?'

ফারিহার কথায় সবাই খেয়াল করল কখন কে জানে উধাও হয়ে গেছে ওগুলো। কোত্থেকে এসেছিল, এই জঙ্গলে কোথায় গেল–এটা একটা বিরাট প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে তিন গোয়েন্দার মনে। কিন্তু এখনই কেউ কথাটা তুলল না।

'কে কে গোসল করবে, চলো,' স্লিপিং-ব্যাগ থেকে বেরিয়ে বলল কিশোর। 'সকালেই কেমন ভ্যাপসা গরম পড়ে গেছে না? আমি গেলাম।'

সবাই নেমে এল ঝরনার ধারে। এমন কী সুইটি, ডিম্পল আর কিকোও। কিকো পানি পছন্দ করে না, পারে বসে এক নাগাড়ে উপদেশ বর্ষণ করতে থাকল সে সবার উপর।

গোসলের পর তাঁবুতে রেখে যাওয়া কয়েকটা টিন খুলে সকালের নাস্তা সারল ওরা। তারপর ম্যাপটা বিছিয়ে বসল তিন গোয়েন্দা বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করবে বলে। ফারিহা গেল ঝরনার ধারে থালা-বাসনগুলো ধুয়ে আনতে।

সুরেলা কণ্ঠে গুনগুন করে গান গাইছে আর বাসন মাজছে ফারিহা, এমনি সময়ে মাথার উপর গাছের ডালে সামান্য নড়াচড়া দেখতে পেল সে ঝরনার পানিতে।

ঝরনার ধারেই বেশ বড়সড় একটা পাতায় ছাওয়া ঝাঁকড়া গাছ। পাখি মনে করে উপর দিকে চাইল ফারিহা। চেয়েই চমকে উঠল। কুচকুচে কালো একটা মুখ, উপর থেকে তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে।

ভয়ে জান উড়ে গেল ফারিহার। হতবুদ্ধি হয়ে বাসন হাতে নিয়ে চেয়ে থাকল উপর দিকে, কথা বলতে বা নড়তে পারছে না। কালো লোকটার পুরু ঠোঁট দুটো সরে যেতেই ঝকঝকে সাদা দাঁত দেখা গেল, কোঁকড়া চুলভর্তি মাথাটা দোলাল লোকটা, তারপর কালো একটা আঙুল তুলল ঠোঁটে।

'কাউকে কিছু বোলো না, খুকি,' নিচু, খসখসে গলায় বলল লোকটা। 'আমি যে এখানে লুকিয়ে আছি বোলো না কাউকে! বললে...'

ওর কথা শেষ হওয়ার আগেই চিৎকার দিল ফারিহা। কিন্তু তিন গোয়েন্দা শুনতে পেল না ওর ডাক। নিকষ কালো নিগ্রো ভুরু কুঁচকে মাথা নাড়ল এপাশ-ওপাশ।

'শোনো, খুকি, এখান থেকে চলে যাও তোমরা। এটা একটা অভিশপ্ত পাহাড়, ভয়ঙ্কর সব লোক থাকে এখানে। চলে না গেলে ওরা ধরবে তোমাদের। সাঙ্ঘাতিক বিপদে পড়বে তা হলে!'

'তুমি এখানে কী করছ?' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল ফারিহা। 'আর এসব কথা তুমি জানোই বা কী করে?'

'আমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল ওরা ওই অভিশপ্ত পাহাড়ের ভেতর। আমি পালিয়েছি। কিন্তু ইয়া বড় বড় কুকুরের ভয়ে এখান থেকে সরে যেতে পারছি না কোথাও। সুযোগ থাকতে জলদি পালাও তোমরা এখান থেকে।'

ঘুরেই দৌড় দিল ফারিহা তাঁবুর দিকে। ওকে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে আসতে দেখে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল তিন গোয়েন্দা।

'কী হলো, ফারিহা?' চেঁচিয়ে উঠল মুসা, 'দৌড়াচ্ছ কেন?'

'কালো একজন লোক!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল ফারিহা, 'কুচকুচে কালো নিগ্রো!'

'কোথায়?' জানতে চাইল রবিন। 'ট্রেফরের সেই "ব্ল্যাক" মনে হচ্ছে! একটু দম নিয়ে নাও, ফারিহা, জলদি! সব খুলে বলো আমাদের।'

ফারিহার কথা শুনে তাজ্জব হয়ে গেল তিন গোয়েন্দা। কুকুরের ভয়ে গাছের ওপর লুকিয়ে আছে কালো এক লোক, পাহাড়টাকে খারাপ বলছে, খারাপ লোকের কথা বলছে–ব্যাপার কী জানা দরকার।

'চলো তো দেখি,' বলল কিশোর। 'ওর কাছ থেকে ভেঙেচুরে সব শুনতে হবে। আঙ্কেল এলে ওকে বাঁচাবার ব্যবস্থা করা যাবে হয়তো।'

কয়েক টিন খাবার নিয়ে ছুটল ওরা ঝরনার দিকে। কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজি করেও লোকটাকে পাওয়া গেল না কোথাও। সরে গেছে অন্যদিকে।

'এখানেই দেখেছিল ওকে ট্রেফর,' বলল রবিন, 'আজ ফারিহাও দেখল ওকে এখানে। আমার মনে হয়, কুকুরদের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে রোজ রাতে এই গাছে উঠে বসে থাকে লোকটা।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর, চিমটি কাটছে নীচের ঠোঁটে। খাবারের

টিনগুলো গাছের গোড়ায় নামিয়ে রেখে ফিরে গেল ওরা তাঁবুতে।

'কিন্তু কুকুরগুলো ওকে খুঁজে পাচ্ছে না কেন?' প্রশ্ন করল ফারিহা।

'লোকটা চালাক,' জবাব দিল মুসা। 'এই গাছের কাছাকাছি এসেই ঝরনার পানিতে নেমে পড়ে, পানির মধ্যে দিয়ে হেঁটে এসে উঠে পড়ে গাছে। চলন্ত পানিতে কোন গন্ধ থাকে না। ঝরনার তীরে এসেই লোকটার গন্ধ হারিয়ে ফেলে কুকুরগুলো।'

'পাহাড়ের ভেতর খারাপ লোক আছে, এই কথা বলল কেন লোকটা?' জোরে জোরে ভাবছে রবিন। 'এটা কি সম্ভব?'

'এটা সম্ভব ধরে নিলে আগ্নেয়গিরি নয় এমন একটা পাহাড়ের ভেতর থেকে গুমগুম শব্দ আর মাটির কাঁপনের একটা ব্যাখ্যা হয়তো পাওয়া যায়,' বলল কিশোর।

'খনির কাজ চলছে ভেতরে?' ফারিহা জিজ্ঞেস করল আবার।

'এখনও জানি না আমরা। তা-ই যদি হয়, যন্ত্রপাতি আনা হয়েছে কোন রাস্তা দিয়ে। কোথায়? পথ-ঘাট তো দেখা যায় না কোথাও।'

'সত্যিই,' বলল মুসা। 'আশ্চর্য, অবিশ্বাস্য একটা ব্যাপার! ওই শোনো, আবার বোধহয় শুরু হচ্ছে পাহাড়ের গর্জন!'

ঠিক গতকালকের মতই দু' বার শোনা গেল ভীতিকর গুমগুম আওয়াজ, দু' বার কাঁপল মাটি। ভুরু কুঁচকে খাড়া পাহাড়ের উপর দিকে চেয়েই চমকে আঙুল তুলল রবিন।

'দেখো, দেখো! কী বেরোচ্ছে পাহাড় থেকে!'

সবাই তাকাল উপরে। পাহাড়ের গা থেকে এক ঝলক ধোঁয়া মত কী বেরিয়ে এখন বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছে। ওদের চোখের সামনেই বের হলো আরও এক ঝলক। সাধারণ ধোঁয়া না, গাঢ় লাল রঙা বাষ্পের মত বেরিয়ে ঝুলে থাকল বেশ কিছুক্ষণ, তারপর হালকা হতে হতে মিলিয়ে গেল।

'খাইছে! জীবনে দেখিনি এমন কারবার!' বলল মুসা। 'কোনও সন্দেহ নেই, কিছু একটা বিদঘুটে কাণ্ড চলছে পাহাড়টার ভেতর। কোনও একটা ফাটলকে চিমনির মত ব্যবহার করা হচ্ছে, ওখান দিয়ে বেরিয়ে আসছে ধোঁয়া বা গ্যাস।'

'ওই নিগ্রো লোকটার সঙ্গে দেখা হলে হয়তো সবকিছু জানা যেত,' বলল রবিন।

'চোখ-কান খোলা রাখলে দেখা হয়ে যেতেও পারে,' কথাটা যে ফলে যাবে, তা না জেনেই বলল কিশোর।

দেখা সত্যিই হলো, সেদিন বিকেলেই, কিন্তু কোনও প্রশ্নের জবাব দেওয়ার মত অবস্থা তখন ছিল না লোকটার।

ছয়

বিকেলে চারপাশটা ঘুরে দেখার জন্য বেরোল ওরা চারজন। কিকো তো মুসার কাঁধেই, ডিম্পলকেও রেখে আসা গেল না। যদিও এত তাড়াতাড়ি আঙ্কেল ডিকের পৌঁছে যাওয়ার সম্ভাবনা ধরতে গেলে নেই-ই, তবু সুইটিকে ঝরনার ধারে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে ওর জিনের নীচে গুঁজে দিল কিশোর একটা স্লিপ; তাতে লেখা: ওরা ভালই আছে, আশপাশেই আছে; ফিরবে শীঘ্রি।

আসলে রাস্তা খুঁজছে কিশোর। বাইরের দুনিয়া থেকে এখানে আসা-যাওয়ার জন্য একটা রাস্তা থাকতেই হবে। পাহাড়ের ভিতর মাইনিং বা অন্য যে-কাজই হোক, যন্ত্রপাতি আনার জন্য একটা পথ থাকতে হবে। কিন্তু নেই। কোনও পথ পেল না ওরা।

নীচ দিয়ে হেঁটে খুঁজল, পাহাড়ের উপর চড়ে খুঁজল; কোথাও পথের কোনও চিহ্ন দেখতে পেল না ওরা। মুসাকে গাছে ওঠানো হলো চারপাশে চোখ বুলাবার জন্য। সড়সড় করে অনেকদূর উঠে গেল ও, তারপরই মনে হলো আড়ষ্ট হয়ে গেল ওর শরীরটা।

কী হয়েছে জানার জন্য মুখ খুলেছিল রবিন, কিন্তু মুখের কথা রয়ে গেল মুখেই। ইশারায় চুপ করতে বলছে মুসা। তারপর ইঙ্গিতে ডাকল ওদের।

সবাই উঠে পড়ল গাছে। সবার সঙ্গে গাছে উঠতে না পেরে গাছ ঘিরে পাগলের মত লাফ-ঝাঁপ দিতে আরম্ভ করল ডিম্পল। মুসার কাছে পৌঁছবার আগেই দূর থেকে ভেসে আসা কুকুরের রাগী গর্জন কানে গেল ওদের। মুসার বাড়ানো আঙুল বরাবর তাকিয়ে ওরা তিনজনও স্থির হয়ে গেল। প্রাণপণে দৌড়াচ্ছে কালো একটা লোক, তার পিছনে ধাওয়া করছে আট-দশটা অ্যালসেশিয়ান, ওদের মিলিত কণ্ঠের কলজে কাঁপানো ডাক প্রতিধ্বনি তুলছে পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে।

ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ফারিহার চেহারা। সবাই ওর দিকে চাইতে নির্জীব ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল। হ্যাঁ, এ-ই সেই লোক।

আধমাইল দূরে পাহাড় বেয়ে উঠে আসছে নিগ্রো লোকটা। সামনের কুকুরটা যখন একেবারে কাছে চলে এল, এই ধরে-ধরে, ঠিক সেই মুহূর্তে লাফ দিয়ে একটা গাছে উঠল লোকটা। কুকুরটাও লাফ দিল, কিন্তু একটুর জন্য কামড় দিতে পারল না ওর পায়ে। কিন্তু গাছটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে গেল সবাই যমদূতের মত। ঘেউ-ঘেউ করছে উপর দিকে চেয়ে।

আর একজন লোককে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। ধীর পায়ে গাছের নীচে এসে দাঁড়াল সে। চেহারাটা দেখা গেল না পরিষ্কার। এমন ভাবে হাত নাড়ল যে, এত দূর থেকেও বুঝতে অসুবিধে হলো না, নেমে আসতে বলছে নিগ্রোকে। কিন্তু গাছ থেকে নামল না কেউ। উত্তেজিত ভঙ্গিতে গাছের নীচে দাঁড়িয়ে শাসাল লোকটা, তারপর কুকুরগুলোকে পাহারায় রেখে চলে গেল ওখান থেকে।

'অর্থাৎ,' বলল রবিন, 'হয় নেমে এসে ধরা দাও, নইলে গাছের ওপর বসে থেকে না খেয়ে মরো।'

'মনে হয় আরও লোক ডেকে আনতে গেল আসলে,' বলল কিশোর। 'এই অবস্থায় এখন আমরা কী করতে পারি?'

রবিন বলল, 'লোকটা একটু দূরে সরে গেলেই আমি নেমে গিয়ে কুকুরগুলোকে গাছের নীচ থেকে ডেকে সরিয়ে নেব, যাতে নিগ্রো লোকটা পালিয়ে যেতে পারে অন্য কোথাও।'

মিনিট দশেক অপেক্ষার পর গাছ থেকে নেমে গেল রবিন। ঝোপের আড়ালে আড়ালে এগোল সাবধানে। বড় জোর দু'শো গজ গেছে, এমনি সময়ে খপ্ করে ওর হাত চেপে ধরল প্রচণ্ড শক্তিশালী একটা লৌহ-কঠিন থাবা। চেঁচিয়ে উঠতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল ও, কারণ তা হলে ওকে সাহায্য করতে এসে ধরা পড়বে ওর বন্ধুরা। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, এ সেই লোক, যে একটু আগে শাসাচ্ছিল পলাতক নিগ্রোকে।

মোচড়া-মুচড়ি করে হাত ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল রবিন। কিন্তু বৃথা চেষ্টা, আরও শক্ত হলো লোকটার মুঠি।

'আরে! এ দেখছি আবার জোরাজুরি করে!' আপন মনে বলল লোকটা। তারপর ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করল, 'অ্যাই ছেলে, কী করছ তুমি এখানে?' কথার সুরে বিদেশী টান, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে রবিনের মুখের দিকে। 'কে তুমি?'

'প্রজাপতি ধরতে এসেছি আমি,' বলল রবিন। 'ছেড়ে দিন আমাকে।' বলল বটে, কিন্তু বুঝল, এই লোককে ধোঁকা দেওয়া কিশোরের পক্ষেও সম্ভব নয়।

'কার সঙ্গে এসেছ?' আবার জিজ্ঞেস করল লোকটা। আরও শক্ত করে চেপে ধরেছে রবিনকে। 'আর সবাই কোথায়?'

ককিয়ে উঠল রবিন।

'আমি একা, বিশ্বাস করুন,' বলল ও। যদিও ভাল করেই জানে, এ-কথা কাউকে বিশ্বাস করানো কঠিন।

'আমার কুকুরগুলোর কাছে ধরা পড়োনি যখন, বিশ্বাস করছি: খুব বেশি আগে আসোনি এখানে। তা হলে দলবল সহ ধরা পড়ে যেতে।'

'কীসের দলবল?' যেন অবাক হয়ে গেছে রবিন। তারপর হাসল, 'ও, বুঝতে পেরেছি, আপনি ডিম্পল-এর কথা বলছেন। ও তো সবসময় আমার সঙ্গেই থাকে।' বলতে না বলতে এক ছুটে এসে হাজির হলো ডিম্পল। অবাক চোখে ঘোড়ার বাচ্চাটাকে দেখল লোকটা। 'ও আমার পোষা। আমার হাত মোচড়াচ্ছেন কেন? ছাড়ুন, যেতে দিন আমাকে। প্রজাপতি খুঁজতে এসেছি আমি এখানে, চলে যাব আজই।'

'কোত্থেকে এসেছ তুমি?' জিজ্ঞেস করল লোকটা। একটু ঢিল দিল বজ্র আঁটুনিতে। 'তোমার মা-বাবা জানে তুমি এখানে এসেছ?'

'না,' সত্যি কথাই বলল রবিন। 'ওই ওদিক থেকে এসেছি আমি, প্রজাপতি সংগ্রহ করা আমার নেশা।'

'খুব ভাল কথা,' বলল লোকটা, কিন্তু হাত ছাড়ল না। 'যেদিক থেকেই এসে থাকো না কেন, অনেক বেশি দেখে ফেলেছ তুমি। আমার সঙ্গে যেতে হবে তোমাকে।'

রবিনকে টেনে নিয়ে চলল লোকটা নিগ্রো যে গাছে চড়ে বসে আছে সেইদিকে। কাছে গিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'কী ব্যাপার? কী ঠিক করলে? নামবে, না কি রাতটা কাটাতে চাও গাছেই?'

পরাজিত ভঙ্গিতে নেমে এল নিগ্রো লোকটা। ট্রেনিং পাওয়া কুকুর; দাঁত খিঁচাল, চারপাশ থেকে ঘিরে রাখল লোকটাকে, কিন্তু আক্রমণ করল না। রবিন আর পলাতক লোকটাকে নিয়ে সোজা খাড়া পাহাড়ের দিকে চলল কুকুরের মালিক। রবিনের পায়ে পায়ে চলেছে ডিম্পল।

এদিকে গাছের উপর থেকে সবই দেখতে পেল দুই গোয়েন্দা ও ফারিহা। ধরা পড়ে গেছে নথি।

'এই দিকেই আসছে!' নিচু গলায় বলল কিশোর। 'টুঁ-শব্দ কোরো না কেউ। সবাই মিলে ধরা দিয়ে কোনও লাভ নেই। কুকুরগুলো যতক্ষণ সঙ্গে আছে, রবিনের কোনও ক্ষতি হবে না। এবার, কিকো, একদম চুপ!'

কিশোরের কানের কাছে ঠোঁট এগিয়ে নিয়ে গিয়ে আস্তে করে বলল

কিকো, 'চু-উ-প!'

গাছের নীচ দিয়ে প্রাণপ্রিয় মুসার বন্ধুকে কে এক লোক টেনে নিয়ে যাচ্ছে দেখে নড়ে উঠেছিল কিকো, কিন্তু কিশোরের কথা মনে পড়ে যাওয়ায় অস্ফুট স্বরে নিজেকেই নিজে শোনাল, 'চু-উ-প!'

গাছের নীচ দিয়ে যাওয়ার সময় একবারও উপর দিকে চাইল না রবিন। ওরা বেশ কিছুদূর চলে যাওয়ার পর গাছের দুটো শাখা সরিয়ে সেই ফাঁকে চোখ রাখল কিশোর। মুসার কাছ থেকে ওর বিনকিউলারটা চেয়ে নিয়ে চোখে তুলল। যায় কোথায়? সোজা চলেছে ওরা পাহাড়ের খাড়া দেওয়ালের দিকে। কোনও পথ আছে নাকি ওদিক দিয়ে?

সবাই গিয়ে দাঁড়াল পাহাড়ের গায়ের কাছে, দেখল কিশোর, পরমুহূর্তে ওর চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল ওরা। ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠল কিশোরের। ব্যাপার কী! দশ-দশটা বিশাল কুকুর, তিনজন মানুষ আর একটা ঘোড়ার বাচ্চা ওর চোখের সামনে থেকে নিমেষে মিলিয়ে যায় কী করে? অথচ তা-ই ঘটেছে—এই ছিল, এই নেই!

রবিন হারিয়ে গেছে বুঝতে পেরে এতক্ষণে চ্যাঁ করে উঠল কিকো। 'দাঁড়া, দেখাচ্ছি মজা!' বলে মুসার কাঁধ থেকে উড়ে চলে গেল পাহাড়ের দিকে।

'রবিনকে কোথায় নিয়ে গেল, দেখতে পেলে?' জানতে চাইল মুসা।

'ওরা পাহাড়ের মধ্যে গেছে বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু কী করে ঢুকল দেখা গেল না। সামনে গিয়ে দেখতে হবে।' আকাশের দিকে চেয়ে চমকে উঠল কিশোর। 'আঁধার হয়ে আসছে! জলদি চলো, দেরি করলে আর গুহায় ফিরতে পারব না।'

তবে অসুবিধে হলো না। ওরা গাছ থেকে নেমে দ্রুত পায়ে ফিরে চলল গুহার দিকে। কিকো কাছে গিয়ে কাউকে না পেয়ে পাহাড়টাকে গোটা কয়েক শক্ত গাল দিয়ে ফিরে এসে বসল মুসার কাঁধে। সুইটিকে নিয়ে গুহায় ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে গেল ওদের।

খেয়ে-দেয়ে স্লিপিং-ব্যাগে ঢোকার আগে বেশ অনেকক্ষণ আলাপ করল ওরা, বোঝার চেষ্টা করল কেন কী ঘটছে; কিন্তু অপর্যাপ্ত, বিচ্ছিন্ন তথ্যগুলোকে নানান ভাবে সাজিয়েও অর্থবহ কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছানো গেল না।

স্লিপিং-ব্যাগে ঢুকতে গিয়ে হঠাৎ কান খাড়া করল কিশোর: বিদঘুটে একটা শব্দ হচ্ছে বাইরে। কীসের আওয়াজ?

'শোনো! শুনতে পাচ্ছ?' বলল ও। 'পাহাড়ের ভেতর থেকে আসছে না

শব্দটা, আসছে ওপর থেকে!'

ছুটে বেরিয়ে গেল ওরা বাইরে। আশায় নেচে উঠেছে মন: হয়তো রেসকিউ পার্টি এসেছে ওদের খোঁজে।

শব্দটা অনেক কাছে এগিয়ে এসেছে। কিন্তু খাড়া পাহাড়ের ওপাশ থেকে আসছে বলে গুহামুখে দাঁড়িয়ে দেখা যাচ্ছে না। তাকিয়ে থাকল ওরা, খানিক পরে চাঁদের উজ্জ্বল আলোয় হঠাৎই দেখা দিল একটা হেলিকপ্টার। না, ওদের নিতে আসেনি, পাহাড়ের মাথায় নামছে ওটা সাবধানে। কিশোর ভাবল: কোথাও রাস্তা-ঘাট পাওয়া যায়নি কেন, বোঝা গেল এবার; আকাশ-পথে আসে ওদের সাপ্লাই।

'মনে হচ্ছে, দুঃস্বপ্ন দেখছি!' বলল ফারিহা। 'কেউ যদি ঘুম থেকে জাগিয়ে দিত!'

হেলিকপ্টার নেমে পড়েছে, আর দেখা যাচ্ছে না ওটাকে। তার মানে চূড়ায় বেশ কিছুটা সমতল জায়গা আছে। গুহার ভিতর গরম লাগায় স্লিপিং-ব্যাগগুলো বাইরে টেনে এনে খোলা আকাশের নীচেই ঘুমিয়ে পড়ল ওরা। রাতে বেশ কয়েকবার ঘুম ভাঙল কিশোরের। রবিনের জন্য চিন্তা হচ্ছে। ট্রেফর যদি কোথাও না থেমে একটানা ছুটে থাকে, তা হলে আজ বিকেলে পৌঁছেচে খামার-বাড়িতে। আর আঙ্কেল ডিক যদি ওর মুখে সব শুনে আজই রওনা হয়ে যান, তা হলে এখানে পৌঁছবেন আগামী পরশু বা তার পরের দিন। নাহ্, মনে মনে স্থির করল কিশোর, আঙ্কেল আসার অপেক্ষায় চুপচাপ বসে না থেকে সকালে উঠে নিজেরাই পরীক্ষা করে দেখবে, পাহাড়ের গায়ে লুকানো কোনও পথ আছে কি না।

সকালে নাস্তার পর কী করতে চলেছে জানাল কিশোর বাকি দু'জনকে, বলল ইচ্ছে করলে ওরা আঙ্কেলের জন্য অপেক্ষা করতে পারে তাঁবুতে। কিন্তু এক বাক্যে ওর প্রস্তাব নাকচ করে দিল মুসা ও ফারিহা–গেলে সবাই একসঙ্গে যাবে।

অগত্যা বড় একটা কাগজে কিশোর লিখল এদিকের সব খবর: কুকুর, পাহাড়ের ভিতর থেকে গুমগুম শব্দ, মাটির কম্পন, পালিয়ে আসা নিগ্রোর সাবধানবাণী এবং রবিন ও নিগ্রোকে বন্দি করে এক লোকের পাহাড়ের ভিতর অদৃশ্য হয়ে যাওয়া–কিছুই বাদ দিল না। তারপর লিখল গতরাতে পাহাড়ের মাথায় নামা হেলিকপ্টারের কথা। এবং সবশেষে নকশা এঁকে দেখাল খাড়া পাহাড়ের ঠিক কোন জায়গায় অদৃশ্য হতে দেখেছে ওদের।

এবার আগের কাগজ বের করে নিয়ে নতুন কাগজটা গুঁজে দিল ও

সুইটির জিনের নীচে। তারপর ওকে নিয়ে ঝরনার ধারে এমন জায়গায় বাঁধল, যেখানে প্রচুর লম্বা-লম্বা ঘাস আছে। ইচ্ছে করলে পানি খেতে পারবে, যখন খুশি ঝরনায় নেমে স্নানও করতে পারবে।

রওয়ানা হলো ওরা তিনজন। মুসার কাঁধে চড়ে চলল কিকোও। একদল সোয়ালো পাখি বাতাসে ভেসে পোকা ধরে ধরে খাচ্ছে, ওদের ডাক অবিকল নকল করল কিকো: ফি-ঈটা ফি-ইটিট, ফি-ঈটা ফি-ইটিট। জোরে হিক্কা তুলে মাফ চাইল ওদের কাছে।

গতকালকের সেই গাছটার নীচে এসে মুসা বলল, 'তোমরা দু'জন এখানে একটু দাঁড়াও, আমি গাছে উঠে দেখে আসি ধারে-কাছে কাউকে দেখা যায় কি না।'

চারপাশ ভাল মত খুঁটিয়ে দেখল মুসা গাছের মগডালে বসে। মানুষ বা কুকুর, কিছুই চোখে পড়ল না। 'মনে হচ্ছে, কেউ কোথাও নেই,' নেমে এসে বলল ও। 'চলো, দেখা যাক কোনও পথ খুঁজে পাওয়া যায় কি না।'

হঠাৎ জোরে ঘোড়ার ডাক ডেকে উঠল কিকো, নাক ঝাড়ল ঘোড়ার অনুকরণে, তারপর হা-হা করে হেসে উঠতে গেল। রেগে গিয়ে ওর ঠোঁটে টোকা দিল মুসা, ধমক দিল, 'চুপ! কিকো ব্যাড বয়, সিলি বয়!'

মাথার ঝুঁটি একবার খাড়া করে নামিয়ে নিল কিকো। রেগে গেছে। খট্-খট্ আওয়াজ করল চঞ্চু দিয়ে, তারপর উড়ে গিয়ে একটা গাছের ডালে বসল। যেন বলতে চায়, 'ঠিক আছে, আমার সঙ্গে যারা এরকম ব্যবহার করে, তাদের সঙ্গে আমি যাই না!' মুখ ভার করে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকল ও, তবে অপর চোখ রাখল তিন পাজি ছেলের দিকে, খেয়াল করছে ব্যাটারা যায় কোথায়।

খাড়া দেওয়ালের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ওরা। ডান দিকে একটু সরে গেল কিশোর, বলল, 'মনে হয়, শেষবার ঠিক এইখানটায় দেখেছিলাম ওদের। তারপরেই গায়েব হয়ে গেল।'

খাড়া পাহাড়ের গা থেকে একটা পাথর সামনের দিকে বেরিয়ে রয়েছে কিছুটা। সেই পাথর বেয়ে নীচ থেকে ঘন হয়ে উঠেছে কিছু লতা আর কাঁটা ঝোপ। ওটার সামনে থেকে সরে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল ফারিহা।

'দাঁড়াও,' বলল ও, 'মনে হচ্ছে কী একটা যেন গোলমাল আছে এখানে।' মাথা চুলকাল, তারপর ঘোষণা করল, 'এইটাই ভেতরে যাবার পথ। এই লতা আর কাঁটাঝোপ নীচ থেকে ওপরে ওঠেনি, আসলে ওপর থেকে পর্দার মত নেমে এসেছে নীচে।'

'তাই তো!' প্রশংসার দৃষ্টিতে ফারিহার দিকে চাইল কিশোর 'ঠিক বলেছ, ফারিহা, বাতাসে দুলছে একটু একটু!'

পর্দা সরাতেই দেখা গেল, পাহাড়ের গা থেকে বেরিয়ে থাকা পাথরের স্ল্যাবটা নিরেট নয়, নীচটা ফাঁপা। ওখান দিয়ে পাহাড়ের গায়ে সরু একটা ফাটল দেখা যাচ্ছে। এতক্ষণে জাদুমন্ত্র বলে ওদের গায়েব হয়ে যাওয়ার আসল গুমর জানা গেল।

ফাটলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল তিনজন। ফাটল পেরিয়েই দেখা গেল বিশাল এক গুহায় এসে পৌঁছেছে। সঙ্গে আনা টর্চটা বের করে উপর দিকে তাক করে আলো ফেলল মুসা, কিন্তু ছাদ পর্যন্ত পৌঁছল না আলোটা—অনেক উঁচু। তবে সামনে আলো ফেলে দেখা গেল গোলাকার গুহার বেশির ভাগটাই দখল করে আছে স্থির, কালো পানি ভরা একটা পুকুর।

'এইখানে ঢুকল, বুঝলাম,' বলল মুসা, 'তারপর কোথায় গেল? কীভাবে?'

পুকুরটাকে ঘিরে একটা চক্কর দিয়ে এল কিশোর, টর্চ জ্বেলে জ্বেলে পরীক্ষা করল পাথরের দেওয়াল; কিন্তু কোথাও কোনও পথ বা ফাটল চোখে পড়ল না ওর।

'কোনও দিকে যাওয়ার রাস্তা নেই, কাজেই ধরে নিতে হয়, ওরা ওপরে গেছে। কিন্তু ওপরে ওঠারও তো কোনও উপায় দেখা যাচ্ছে না।'

'পানির নীচ দিয়ে কোনও রাস্তা থাকতে পারে না?' জিজ্ঞেস করল ফারিহা।

'একেবারে পারেই না, তা হয়তো নয়,' বলল কিশোর, 'তবে আমার ধারণা, সে সম্ভাবনা খুবই কম। প্রতিবার ঢুকতে বা বেরোতে এই কালো পানিতে ভিজতে চাইবে না কেউ। তবু, একবার এপার-ওপার হেঁটে দেখলে মন্দ হয় না।' এই বলে নেমে পড়ল ও পানিতে। কিন্তু এগোতে পারল না। বড় বেশি গভীর, এক-পা ফেলতেই হাঁটুর উপর উঠে এল পানি।

কাজেই জামা-কাপড় পারে খুলে রেখে সাঁতার দিয়ে ওপারে গিয়ে ফিরে এল ও। কিনার থেকে তিন হাত দূরে দাঁড়িয়ে বলল, 'এই দেখো, এখানেই গলা-পানি, এর ওদিকে ঠাঁই নেই। অতল একটা পুকুর—আশ্চর্য না? পানিটা অসম্ভব ঠাণ্ডা, উঠে আসছি আমি।'

উঠতে গিয়ে পা পিছলে আবার অথৈ পানিতে চলে গেল কিশোর। আবার উঠতে গিয়ে পা পিছলাবার আগেই হাত বাড়িয়ে কিনারটা ধরতে

চেষ্টা করল, কিন্তু হাতে বাধল গোল মত কী একটা জিনিস। স্টিয়ারিং হুইলের মত অনেকটা, পানির একফুট নীচে রয়েছে।

উঠে পড়ল কিশোর। শীতে ঠক-ঠক করে কাঁপছে, দাঁতে বাড়ি খাচ্ছে দাঁত। দ্রুত হাতে কাপড় পরে নিল ও, তারপর হামাগুড়ি দিয়ে পুকুর পারে বসে হাত বাড়াল হুইলটার দিকে।

'মুসা,' ডাকল কিশোর, 'তোমার টর্চটা একটু ধরবে এদিকে? পানির নীচে কী যেন একটা বাধল আমার হাতে।'

এগিয়ে এসে টর্চ ধরল মুসা। বাম হাতে ভর দিয়ে আরও একটু ঝুঁকল কিশোর। 'ছোট একটা হুইলের মত, মুসা। এটা পানির নীচে কেন? যাই হোক, হুইল জিনিসটা থাকেই ঘোরাবার জন্যে। ঘোরাচ্ছি আমি।'

ডান দিকে মোচড় দিতেই ঘুরতে শুরু করল হুইল। কয়েক পাক ঘুরতেই ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল ফারিহা। চমকে ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে চাইল কিশোর ও মুসা। অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না ফারিহাকে, বিস্ফারিত চোখের সাদা অংশগুলো কেবল দেখতে পেল ওরা অস্পষ্ট ভাবে। মুসার হাত থেকে ছুটে গেল টর্চটা, গড়াচ্ছে মাটিতে।

'কী হলো, ফারিহা? চেঁচিয়ে উঠলে কেন?' উঠে দাঁড়াল মুসা।

এক লাফে এগিয়ে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল ফারিহা ওর গায়ের উপর। প্রচণ্ড ভয়ে কাঁপছে থর-থর করে।

সাত

'কী হয়েছে?' আবার জিজ্ঞেস করল মুসা।

'কী যেন...' মুসাকে ছেড়ে দিয়ে কাঁপা গলায় বলল ফারিহা, 'নরম কী যেন আমার ঘাড় ছুঁয়ে সারা শরীর বেয়ে নেমে গেল নীচে!'

মুসার টর্চটা তুলতে গিয়ে দেখা গেল, ওটা এখন দশ ফুট পানির নীচে, জ্বলন্ত অবস্থায় নেমে যাচ্ছে আরও গভীরে। এখন সামান্য আলোর আভা দেখা যাচ্ছে শুধু। গাঢ় অন্ধকারে ছেয়ে গেছে বিশাল গুহার ভিতরটা।

পকেট থেকে নিজের টর্চ বের করে জ্বালল কিশোর। ফারিহা যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেদিকে তাক করেই অস্ফুট বিস্ময়ধ্বনি বেরিয়ে এল ওর মুখ দিয়ে। এবার আরেক চিৎকার দিয়ে লাফিয়ে উঠল ফারিহা।

হেসে উঠল কিশোর ও মুসা।

'ভূত না, চেয়ে দেখো,' বলল কিশোর, 'কীসে ছুঁয়েছিল তোমাকে। ওপর থেকে নেমে এসেছে একটা দড়ির মই।'

এইবার ঘুরে দাঁড়াল ফারিহা। মুহূর্তে আতঙ্ক পরিণত হলো হাসিতে। হাসছে মুসাও, বলল, 'এমন চিৎকার দিয়েছ, ফারিহা! আর একটু হলে ঝাঁপিয়ে পড়ছিলাম পানিতে!'

'টর্চটার মত?' বলল কিশোর হাসিমুখে।

খোঁচাটা গায়ে মাখল না মুসা। বলল, 'পানির নীচের ওই হুইলটা ঘোরাতেই নেমে এল দড়ির মই। দারুণ বুদ্ধি না? পুকুর থেকে ওঠার সময় তুমি পা পিছলে আছাড় না খেলে তো এটার খোঁজই মিলত না।'

'হ্যাঁ,' স্বীকার করল কিশোর, 'আলিবাবার চিচিংফাঁকও এর তুলনায় নস্যি। এদের গোপনীয়তার নমুনা দেখে ভাবছি, কারা এরা? কী করছে এই বিরান এলাকায়? ভাল কিছু, না কি···সেটা অবশ্য ওপরে না গেলে বোঝা যাবে না।'

ফারিহার বড় বড় চোখ আরও বড় হয়ে গেল।

'ওপরে যাবে তুমি?'

'খবরদার, নড়বে না! বজ্জাত কোথাকার! ···চুপ, একদম চুপ! চোপরাও!'

আচমকা কর্কশ গলার ধমক শুনে লাফিয়ে উঠল ওরা তিনজন। পরমুহূর্তে কিকোকে দেখে আশ্বস্ত হলো। বুঝল, বকা দেওয়ায় রেগে আছে কিকো এখনও। মৃদু হেসে পকেট থেকে গোটা দুই বাদাম বের করে সাধল মুসা।

একটু ইতস্তত করে মুসার কাঁধে এসে বসল কিকো। এক এক করে মুখে পুরল বাদাম। সন্তুষ্ট-চিত্তে বলল, 'চু-উ-উ-প!'

'ওপরে যাবে তুমি?' আবার প্রশ্নটা করল ফারিহা।

'হ্যাঁ, বেশি সময় লাগবে না,' বলল কিশোর। হাসল। 'কী করছে ওরা একটু দেখেই ঠিক দশমিনিটের মধ্যে ফিরে আসছি আমি। ওরা কল্পনাও করতে পারবে না বাইরের কেউ দড়ির মইয়ের রহস্য ভেদ করে ওপরে উঠে আসতে পারে, কাজেই সাবধানও থাকবে না। তোমরা বাইরে রোদে গিয়ে অপেক্ষা করো, আমি এই এলাম বলে।'

বাধা না দিয়ে চুপচাপ কিশোরের সব কথা শুনল মুসা ও ফারিহা। তারপর কিশোর রওয়ানা হতেই পিছু পিছু উঠতে শুরু করল মই বেয়ে। নীচে তাকিয়ে মৃদু হাসল কিশোর, কিছু বলল না। শক্ত দড়ির মই, তবে

তিনজনের নড়াচড়ায় দুলছে বেশ। উঠছে তো উঠছেই, যেন এ ওঠার শেষ নেই। ঘোর অন্ধকারে বোঝা যাচ্ছে না কতদূর উঠেছে, বা আর কত বাকি।

'থামছি,' অনেকদূর ওঠার পর নিচু গলায় বলল কিশোর। 'হাঁপিয়ে গেছি।'

কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার উঠতে শুরু করল ওরা। ফারিহার মনে হলো, যেন দুঃস্বপ্নের মধ্যে অনন্তকাল ধরে মই বেয়ে উঠছে তো উঠছেই; সকালে ঘুম না ভাঙা পর্যন্ত আর থামা যাবে না।

'একটু যেন আলো দেখতে পাচ্ছি,' বলল কিশোর চাপা গলায়। 'মনে হয় পৌঁছে গেছি। কেউ কথা বোলো না।'

'চু-উ-প!' বলল কিকো উত্তরে।

পাথুরে একটা মেঝেতে উঠে বসল কিশোর, তারপর হাত বাড়িয়ে উঠতে সাহায্য করল মুসা ও ফারিহাকে। চারপাশে চেয়ে দেখল, ল্যাম্পের আলোয় মৃদু আলোকিত ছোট্ট একটা কামরায় উঠে এসেছে ওরা। ঘরে কোনও আসবাব নেই। খোলা দরজা দিয়ে লম্বা একটা করিডর দেখা যাচ্ছে, চলে গেছে পাহাড়ের ভিতর দিকে।

খানিক জিরিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর।

'চলো, দেখি রবিনকে খুঁজে বের করা যায় কি না।'

করিডর ধরে এগোল ওরা তিনজন। আঁকাবাঁকা প্যাসেজ, যেখানে বাঁক নিয়েছে সেখানেই পাথরের তাকের উপর একটা করে ল্যাম্প রাখা। বেশ কিছুদূর চলে আসার পর থেমে দাঁড়াল ওরা। তিন দিকে চলে গেছে তিনটে রাস্তা। কোন্ দিকে যাবে ভাবছে কিশোর, এমনি সময়ে পায়ের শব্দ পেয়ে চমকে উঠল। দু'জন লোক আসছে এইদিকে!

শব্দটা যে প্যাসেজ দিয়ে আসছে, সেটা বাদ দিয়ে বাকি দুটো প্যাসেজে ঢুকে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল ওরা। একটা চোখ রেখেছে শব্দের উৎসের দিকে। ঘামছে, ধরা পড়ার পরিণতির কথা ভাবছে। এমনি সময়ে বাঁক ঘুরে আলোর নীচে এসে দাঁড়াল ডিম্পল, ডাইনে না বামে—কোন্‌দিকে যাবে ভাবছে।

আড়াল থেকে বেরিয়ে এল তিনজন। ওদেরকে দেখে এক ছুটে কাছে চলে এল ডিম্পল, খুশিতে লাফাচ্ছে তিড়িংবিড়িং। সবার পায়ে গা ঘষল, ঘোঁত শব্দ করল, নাক এগিয়ে দিল আদরের আশায়।

'এইবার এই পিচ্চিই আমাদের নিয়ে যাবে রবিনের কাছে,' বলল কিশোর।

যেন বুঝতে পেরেছে কিশোরের কথাটা, সবার আগে আগে চলল ডিম্পল, ওদের পথ দেখাচ্ছে। কয়েকটা বাঁক ঘুরে, একটা বড়সড় হলরুম পেরিয়ে আরও কিছুদূর এগিয়ে এক অদ্ভুত জায়গায় নিয়ে এল সে ওদেরকে।

আশ্চর্য একটা ল্যাবরেটরি দেখা যাচ্ছে তিন ফুট উঁচু একটা রেইলিং দেওয়া বারান্দার ওপাশে, ওদের থেকে কয়েক ফুট নীচে। বিশাল কোনও যন্ত্রপাতি নেই, কিন্তু অনেক জায়গা জুড়ে রয়েছে পরস্পর সংযুক্ত চকচকে বৈদ্যুতিক তার। বড় বড় কাঁচের পাত্র দেখা যাচ্ছে এখানে-ওখানে, স্ফটিকের তৈরি কয়েকটা বাক্সে ওঠা-নামা করছে বিচিত্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। আরেকদিকে নিঃশব্দে ঘুরছে কয়েকটা ধাতব চাকা–বৈদ্যুতিক তারগুলো ওখান থেকে বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে।

ল্যাবরেটরির ঠিক মাঝখানে জ্বলছে মস্তবড় এক আশ্চর্য বাতি। মুহূর্তে মুহূর্তে রঙ পালটাচ্ছে ওর ভিতরের আলো। উজ্জ্বলতাও বাড়ছে-কমছে। একেক সময় এতই উজ্জ্বল হয়ে উঠছে যে চোখ ঝলসে যাবার ভয়ে তাকানো যাচ্ছে না, তারপর আবার কমতে কমতে লাল-নীল বা সবুজ নিষ্প্রভ আভায় পরিণত হচ্ছে।

অবাক হয়ে চেয়ে রইল ওরা রহস্যময় গবেষণাগারের দিকে। মানুষ দেখা গেল না একজনও। মনে হলো, নিঃশব্দে চলছে এখানে সবকিছু, আপনা-আপনি।

এমনি সময়ে অস্পষ্টভাবে সেই গুম-গুম আওয়াজটা ভেসে এল ওদের কানে। পাহাড়ের অনেক-অনেক নীচে প্রচণ্ড এক শক্তি যেন সবকিছু ভেঙেচুরে ছুটে বেরিয়ে যেতে চাইছে। পরমুহূর্তে কেঁপে উঠল গোটা পাহাড়টা।

ঘরের মাঝখানের মস্ত বাতিটা হঠাৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল আর টকটকে লাল হয়ে উঠল। তারপর ওটার গা থেকে লাল ধোঁয়া বেরোতে শুরু করল। কটুগন্ধি ধোঁয়া নাকে যেতে কেশে উঠল মুসা। সবাই সরে গেল বারান্দা থেকে।

'এই ধোঁয়াই দেখেছিলাম আমরা তাঁবু থেকে,' বলল মুসা। 'আসলে কী চলছে এখানে, কিশোর?'

'গোপন কিছু,' বলল কিশোর। 'এর বেশি কিছুই জানি না আমরা। এমন কিছু, যেটা করতে হয় লোক-চক্ষুর অন্তরালে।'

'নিউক্লিয়ার বোমা বানাচ্ছে না তো?' বলল ফারিহা।

এ-প্রশ্নের জবাব নেই কারও কাছে।

ডিম্পলের পিছু পিছু হাঁটতে হাঁটতে বিরাট এক হলরুমে এসে পৌঁছল ওরা। এটা আসলে একটা মস্ত গিরি-গহ্বর, কিন্তু এমন ভাবে সাজানো হয়েছে যেন রাজসভা। সোনালী কার্পেট বিছানো মেঝেতে। সামনে একটা মঞ্চ, কয়েকটা সিঁড়ির ধাপ ডিঙিয়ে উঠতে হয় সেখানে, মঞ্চের মাঝখানে সত্যিই একটা সিংহাসন রাখা। দেওয়ালগুলো ঢাকা রয়েছে ছাদ থেকে ঝুলানো ঝালর দিয়ে, সেখানে একটু পর পর তারার মত জ্বলছে-নিভছে লাল-নীল-সবুজ বাতি। বেশিরভাগ বাতিই নেভানো, সব বাতি জ্বাললে ঝলমল করবে গোটা হলরুম।

'কোনও রাজপ্রাসাদে এসে পড়লাম নাকি?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করল ফারিহা। 'মনে হচ্ছে, পাহাড়ের রাজা থাকেন এখানে!'

আট

এতক্ষণে বুঝে ফেলেছে কিশোর, ওদের নিয়ে খামোখা এদিক-ওদিক ঘুরছে ডিম্পল। রবিন কোথায় আছে হয় ও জানে না, নয়তো বুঝতে পারছে না ওর কাছে কী আশা করা হচ্ছে।

'এসো, আমরা কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে দেখি ও কী করে,' বলল কিশোর।

দেওয়ালের গায়ে সেঁটে দাঁড়িয়ে থাকল ওরা তিনজন। এটা একটা খেলা মনে করে ডিম্পলও দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল। কিন্তু খানিক পরেই শুরু হলো উসখুস। এর-ওর মুখের দিকে চেয়ে যখন দেখল কেউ নড়ে না, ওর দিকে তাকায়ও না; তখন প্রথমে খানিকটা সরে দাঁড়াল, তারপর আনমনে হাঁটা ধরল একদিকে। বেশ কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে ওকে অনুসরণ করল কিশোর-মুসা-ফারিহা।

গাঢ় লাল, পুরু পর্দা সরিয়ে একটা ঘরে ঢুকল ডিম্পল। ওরা তিনজন সাবধানে উঁকি দিয়ে দেখল, ওপাশে একটা পাঠাগার। ঘরে কেউ নেই দেখে ঢুকে পড়ল ওরা। ঘরের চার দেওয়াল ঢাকা পড়েছে আলমারিতে, সেগুলোর প্রতিটিতে ঠাসা মোটা-মোটা বই। দু' একটার পাতা উল্টে দেখল কিশোর: কঠিন সাইন্সের বই, কিছু আবার বিদেশী ভাষায় লেখা।

'চলে এসো, ওই দরজা দিয়ে বেরিয়েছে আমাদের গাইড,' বলল কিশোর।

কিছুদূর যাওয়ার পর ওদেরকে দেখে থেমে দাঁড়াল ডিম্পল। ওরা কাছে যেতে চলতে আরম্ভ করল আবার।

'ব্যাটা এখন আমাদের দুনিয়াময় না ঘুরিয়ে রবিনের কাছে নিয়ে গেলেই বাঁচা যায়,' বলল ফারিহা। 'পাহাড়ের ভেতর কেমন যেন ফাঁপর লাগছে।'

ডিম্পল এখন গোল একটা টানেলের ঢাল বেয়ে ওদের উপর দিকে নিয়ে চলেছে। এখানেও কিছুদূর পরপর মৃদু আলোর ব্যবস্থা। চলতে চলতে বেশ কয়েকটা দরজার মত ফাঁক দেখতে পেল ওরা, মনে হলো স্টোররুম ওগুলো। ছোট-বড় নানান আকারের বাক্স আর প্যাকেট ছড়িয়ে আছে মেঝেতে।

বেশিরভাগ প্যাকেট বা বাক্সের গায়ে বিদেশী লেবেল্। একটা খোলা বাক্সে উঁকি দিয়ে নানান জাতের খাবার ভরা টিন দেখতে পেল কিশোর।

আর একটু এগিয়ে দেখা গেল পাথর কেটে তৈরি করা হয়েছে সিঁড়ির ধাপ। ধাপগুলো ঘুরে ঘুরে উঠে গেছে উপর দিকে। পাহাড়ি ছাগলের মত তরতর করে উঠে যাচ্ছে ডিম্পল সিঁড়ি টপকে। ওর সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে হাঁপ ধরে গেল ওদের।

সিঁড়ির পাশেই একটা কাঠের দরজায় হঠাৎ ঢু দিল ডিম্পল। নাক ঝাড়ার আওয়াজ করল দু'বার। ভারী হ্যাজবোল্ট দিয়ে দরজাটা বাইরে থেকে আটকানো।

ভিতর থেকে স্পষ্ট ভেসে এল রবিনের কণ্ঠ। 'ডিম্পল! আছি আমি ভেতরেই। বেরোবার উপায় নেই রে! তোকে কাছে ডাকতে পারছি না।'

রবিনের গলা শুনে লাফিয়ে উঠল কিশোরের বুকটা। দরজার গায়ে আস্তে দুটো টোকা দিয়ে বলল, 'রবিন! আমরা এসেছি! দরজার বোল্ট খুলে ঢুকছি ভেতরে।'

ভিতরে বোবা হয়ে গেল রবিন। পায়ের শব্দ শুনে বোঝা গেল, দৌড়ে এসে দাঁড়াল ও দরজার সামনে। সাবধানে জিজ্ঞেস করল, 'কিশোর? সত্যিই তুমি?'

'আমার সঙ্গে মুসা, ফারিহা, কিকো আর ডিম্পলও আছে। দরজা খুলছি।'

দরজা খুলে যেতেই প্রথম কিশোরকে বুকে জড়িয়ে ধরল রবিন, তারপর মুসাকে। হাসিমুখে ঢুকল ফারিহা। খুশিতে লাফাচ্ছে ডিম্পল। কিকো উড়ে গিয়ে বসেছে রবিনের কাঁধে, আদর করে ওর কানে কানে কী যে বলছে সে-ই জানে। ওর ঝুঁটি চুলকে দিয়ে আদর করল রবিন।

'বিশ্বাসই করতে পারছি না সত্যিই তোমরা চলে এসেছ এখান পর্যন্ত!' বলল রবিন ধরা গলায়। 'পথ চিনলে কী করে?'

'সে অনেক কথা,' বলল ফারিহা। 'এখন চলো, কেউ টের পাওয়ার আগেই বেরিয়ে পড়ি এই দোজখ থেকে। ওখানে শুয়ে রয়েছে কে?'

'ও-ই তো ট্রেফরের সেই "ব্ল্যাক"। থালা ধুতে গিয়ে তুমিও দেখেছিলে ওকে ঝরনার ধারে। ধরা পড়ার পর থেকে সারা দিন-রাত খালি ঘুমাচ্ছে।'

ঘরের চারপাশে তাকিয়ে দেখল কিশোর। একটা দেওয়ালের গায়ে বেশ বড় একটা ফাঁক, সেখান দিয়ে নীল আকাশ আর সাদা মেঘের ভেলা দেখা যাচ্ছে।

'এখানকার লোকজন কোথায়?' জানতে চাইল কিশোর। 'আসার পথে তো একজনও দেখলাম না কোথাও।'

'ওরা থাকে পাহাড়ের আরও ওপরে। চূড়ার কাছেই এই রকম অনেকগুলো ঘর আছে–সেখানে। চূড়াটা সমতল ছাদের মত, ওখানে হেলিকপ্টার নামে।'

'ঠিক আছে,' বলল মুসা, 'এখান থেকে বাইরে বেরিয়ে সব শুনব। এখন চলো তো, রওনা হই।'

দরজার কাছে গিয়েই দু'হাত দু'পাশে তুলে থামাল মুসা সবাইকে। আস্তে করে ভিড়িয়ে দিল দরজা। ওর তীক্ষ্ণ কান কিছু শুনতে পেয়েছে। কয়েক সেকেন্ড পর বাকিরাও শুনতে পেল। গল্প করতে করতে দু'জন লোক নামছে সিঁড়ি বেয়ে।

বুকের ভিতর ঢিবঢিব শুরু হয়ে গেল সবার। ওরা কি খেয়াল করবে যে, বাইরের হ্যাজবোল্টটা লাগানো নেই?

গলার আওয়াজ একেবারে কাছে চলে এল, তারপর চলে গেল পাশ কাটিয়ে। দরজার বোল্ট যে খোলা লক্ষই করেনি। হাঁপ ছাড়ল এতক্ষণে ওরা।

'বাঁচা গেল!' বলল মুসা। 'এবার বেরিয়ে পড়া যায়?'

'না। ওরা ফিরে যাক আগে,' বলল রবিন। 'আমার ধারণা ওর প্যারাট্রুপার, নীচের স্টোর থেকে খাবার আনতে গেল। এখুনি ফিরে আসবে আবার।'

'প্যারাট্রুপার?' ভুরু কুঁচকে চাইল কিশোর রবিনের দিকে। 'এখানে কী করতে আসবে প্যারাট্রুপার?'

'এই নিগ্রো লোকটাও একজন প্যারাট্রুপার। ওর নাম জোডি,' মাথ

নেড়ে ঘুমন্ত লোকটাকে দেখাল রবিন। 'আমাদের ধরে এনে এই ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে বল্টু লাগিয়ে দিয়েছে ওরা কাল সন্ধ্যায়। ডিম্পলকে ভেতরে আসতে দেয়নি। সেই থেকে বেচারা কতবার যে ঘুরে ফিরে এসে দাঁড়িয়েছে এই দরজার সামনে, দরজায় মাথা দিয়ে গুঁতো মেরে খবর নিয়েছে আমার!'

ডিম্পলের মাথায় হাত বুলাল রবিন, খুশি হয়ে ও নাক ঘষল রবিনের হাঁটুতে।

'এই লোকটার কাছ থেকে এদের সম্পর্কে কতদূর জানতে পারলে?' প্রশ্ন করল কিশোর।

'অনেক কিছু,' বলল রবিন। 'অদ্ভুত সব ব্যাপার! পেপারে বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত করেছিল জোডি। প্রাক্তন প্যারাট্রুপারদের ভাল বেতনে চাকরি দেয়া হবে, লিখেছিল বিজ্ঞাপনে। নিউ ইয়র্কের এক অফিসে ওর ইন্টারভিউ নেয় ঈগলের চোখ, অর্থাৎ আমাদের যে ধরে এনেছে সেই লোকটা। ব্যাটার নাম অটার উল্‌ফ্। নতুন ধরনের প্যারাশুট জাম্পিঙের জন্যে জোডিকে বিরাট অঙ্কের টাকা সাধে লোকটা।'

'কী রকমের নতুন ধরন?'

'ওকে তখন কিছুই বলা হয়নি, ধরনটা এখানে এসে ও টের পেয়েছে। ওর ধারণা, অবিশ্বাস্য একটা গবেষণা চলছে এখানে। এই পরীক্ষা সফল হলে মানুষ দুই হাতে দুটো ডানা বেঁধে নিয়ে উড়ে বেড়াতে পারবে যেখানে খুশি, নামতে পারবে যেখানে ইচ্ছা। ঠিক পাখির মতন।'

'দূর!' বলে উঠল ফারিহা। 'অসম্ভব!'

'হ্যাঁ। সেজন্যেই ওর সব কথা আমি ঠিক বিশ্বাস করতে পারিনি। ও বলছে উলফ্ লোকটা নাকি শুধু ওকে না, অনেক টাকা ব্যয় করে একদল দক্ষ প্যারাট্রুপারকে চাকরি দিয়েছে। ওদের হেলিকপ্টারে করে আনা হয়েছে এখানে। ওদের কাজ হচ্ছে ডানাগুলো ব্যবহার করে ঠিকমত ওড়া যায় কি না পরীক্ষা করে দেখা। ডানায় যদি ত্রুটি থাকে, সেটা মেরামত করে আবার অন্য একজনকে পাঠানো হয়।'

'কেউ দেখেছে পরীক্ষা করে?'

'তিন জন দেখেছে। ওদের হাতে ডানা লাগিয়ে হেলিকপ্টারে করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল অনেক ওপরে, তারপর ঝাঁপ দিতে বাধ্য করা হয়েছিল ওখান থেকে।'

'তারপর কী ঘটল?'

'সেটা জানে না জোডি। তবে ওই তিনজনের একজনও যে আর ফিরে

আসেনি, তা জানে। ওর স্থির বিশ্বাস, সোজা মাটিতে আছড়ে পড়ে মারা গেছে ওরা। ওভাবে মরতে রাজি নয় বলেই পালিয়েছিল ও।'

নয়

'কিন্তু···কিন্তু এসবের মানেটা কী?' অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করল মুসা।

'জোডির ধারণা, এই গবেষণায় যদি ওরা সফল হতে পারে, মানুষ যদি ওই পাখা লাগিয়ে সত্যিই উড়তে পারে, তা হলে বিরাট এক বিপ্লব ঘটে যাবে গোটা দুনিয়ায়। বিপুল ঐশ্বর্যের মালিক হয়ে যাবে এরা। সবাই উড়তে চাইবে, সবাই কিনবে ওদের ডানা।'

'খুব বেশি দাম না হলে আমিও একটা কিনব,' হাসতে হাসতে বলল ফারিহা।

'পালিয়েছিল কী করে?' প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল কিশোর।

'বেপরোয়া একটা কাজ করে বসেছিল জোডি,' বলল রবিন। 'তেমনি বিপজ্জনকও। স্টোর থেকে এক ফাঁকে একটা প্যারাশুট চুরি করে নিয়ে এসেছিল এখানে। যেদিন ওর হেলিকপ্টার থেকে লাফ দেয়ার কথা, ঠিক তার আগের রাতে প্যারাশুট নিয়ে লাফিয়ে পড়েছিল দেয়ালের এই ফাঁক দিয়ে বাইরে।'

'বলো কী!'

শিউরে উঠল ওরা। 'এটা হেলিকপ্টার থেকে ঝাঁপ দেয়ার চেয়ে কম কী হলো? সাহস আছে লোকটার!'

'সত্যিই সাহসী লোক,' মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'মারা পড়েনি শুধু প্যারাশুটটা খুলেছিল বলে। তা ছাড়া কীভাবে পড়তে হয় জানা ছিল। তারপরেও নীচে পড়ে ঝাঁকি খেয়ে জ্ঞান হারিয়েছিল কয়েক মিনিটের জন্যে।' একটু থামল রবিন। 'তারপর কুকুর লেলিয়ে দেয়া হলো ওর পেছনে। এগুলোকে রাখাই হয়েছে কেউ কাছে এসে পড়লে ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দেয়ার জন্যে, কেউ পালানোর চেষ্টা করলে ধরে আনার জন্যে, আর উড়তে গিয়ে কেউ অ্যাক্সিডেন্ট করলে তার লাশ খুঁজে বের করার জন্যে।'

'তার মানে, এরা বিশ্বাস করে কাজটা সত্যিই সম্ভব?'

'হ্যাঁ। একজন দুর্দান্ত জিনিয়াস নাকি আছে এদের পেছনে। একটু পাগলাটে। লোকটাকে এই পাহাড়ের রাজা বানিয়েছে ওরা। মানে, বৈজ্ঞানিককে ভজিয়ে-ভাজিয়ে কাজ আদায় করে নিচ্ছে আর কী। এই অসম্ভবকে পাগলটা যদি সম্ভব করে তুলতে পারে, মালটি-বিলিয়নেয়ার হয়ে যাবে এরা একেকজন।'

'ঈগলচক্ষুটাই রাজা নাকি?'

'না। ও হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী—ওরই তত্ত্বাবধানে চলছে এখানকার সব কিছু...ওকে সংগঠক বলতে পারো। ও আর উলরিখ মিলে চালাচ্ছে সবকিছু। রসদ সংগ্রহ, পাহারার ব্যবস্থা, হেলিকপ্টার এলে লোকজনকে নামিয়ে এনে কামরার ভেতর আটকে রাখা, জাপানি প্রহরীদের দিয়ে কাজ করানো—মোট কথা, ওই দুজনই এখানে বস্। নতুন একজোড়া ডানা তৈরি হয়ে গেলে তবেই কেবল রাজসভায় নিয়ে আসা হয় রাজাকে। সমবেত প্যারাট্রুপারদের মধ্য থেকে তিনিই বাছাই করেন পরবর্তী উড়ন্ত মানব।'

নড়ে উঠল জোডি, তারপর উঠে বসে দুই হাতে চোখ ডলল। ঘরের ভিতর এত লোক দেখে অবাক হয়ে গেছে সে। ফারিহাকে চিনতে পেরে বলল, 'তুমি এখানে কী করছ, খুকি? তোমাকে না আমি পালিয়ে যেতে বলেছিলাম?'

'একটু পরেই পালিয়ে যাচ্ছি আমরা,' বলল রবিন। 'আপনি যাবেন আমাদের সঙ্গে?'

মাথা নাড়ল জোডি। 'ভয় পাই। ভয়ানক ভয় পাই আমি কুকুরকে। এখানেই নিরাপদে থাকব।'

'আপনি ভাল করেই জানেন, আগামীবার হেলিকপ্টার থেকে লাফ দেয়ার জন্যে আপনাকেই পাঠানো হবে।'

'সেটা কুকুরের চেয়ে ভাল।'

দুইজোড়া পায়ের শব্দ দরজার পাশ ঘেঁষে চলে গেল উপরে। দরজা সামান্য ফাঁক করে সেখানে চোখ রাখল মুসা। তারপর 'অল ক্লিয়ার' সিগনাল দিল।

ডিম্পল-এর পিছু নিয়ে বেরিয়ে গেল ওরা, সবার শেষে দরজার বল্টু লাগিয়ে দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল রবিন। স্টোর-রুমে ক্রেট ভরা খাবার টিন দেখে জ্বলে উঠল মুসার পেট। কিন্তু কিশোর থামতে দিল না ওকে—এখন যত দ্রুত সম্ভব এখান থেকে পালানোটাই প্রধান কাজ।

স্বল্পালোকিত গলি-পথ ধরে এগিয়ে চলল ওরা ডিম্পলের পিছু নিয়ে।

অনেক দূর যাওয়ার পর সন্দেহ হলো মুসার। 'এ কোন্ দিকে নিয়ে চলল আমাদের? সেই বই-ঠাসা ঘরটা গেল কোথায়? কী রে, ডিম্পল?'

মুসার মুখের দিকে চেয়ে থাকল বাচ্চা-ঘোড়া। সবাই ওরা থেমে দাঁড়িয়েছে। ফিরে যাবে কি না ভাবছে কিশোর, এমনি সময়ে বিচিত্র একটা শব্দে কান খাড়া হয়ে গেল সবার। সামনের দিক থেকে আসছে আওয়াজটা। ব্যাপার কী দেখবে বলে পায়ে পায়ে এগোল আবার ওরা।

প্রশস্ত একটা প্যাসেজ ধরে ঢাল বেয়ে নামছে ওরা। বাতাস ক্রমে গরম হয়ে উঠছে। ঘাম দেখা দিয়েছে সবার কপালে। একটা ব্যালকনির মত জায়গায় দাঁড়িয়ে নীচের দিকে চেয়েই হাতছানিতে ডাকল ফারিহা সবাইকে।

গভীর একটা গর্ত। গর্তের ভিতর অনেক নীচে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে কী যেন করছে একদল শ্রমিক। দূরত্বের কারণে ছোট দেখাচ্ছে ওদেরকে। সবার হাতে একটা করে লাঠি। উজ্জ্বল আলো জ্বলছে গর্তের ভিতর।

কনুই দিয়ে খোঁচা দিল মুসা রবিনকে। 'দেখো, মেঝেটা একপাশে সরিয়ে দিয়েছে লোকগুলো। দেখতে পাচ্ছ? মেঝের নীচে ওগুলো কী?'

নানা রঙের খেলা দেখা যাচ্ছে মেঝের ফাঁক দিয়ে।

কিছু বুঝে ওঠার আগেই হঠাৎ মাথা ঘুরে উঠল ওদের সবার। মনে হলো হালকা হয়ে গেছে শরীরটা, যেন শূন্যে ভেসে উঠবে এখনই, যেন স্বপ্নের ঘোরে রয়েছে ওরা। দুই হাতে ব্যালকনির রেলিং চেপে ধরল ওরা। এমনি সময়ে নীচের লোকগুলো লাঠি দিয়ে ঠেলে মেঝে সরিয়ে বন্ধ করে দিল ফাঁকটা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঘোরাটা বন্ধ হয়ে গেল ওদের, মনে হলো শক্ত জমিনে দাঁড়িয়ে আছে।

'চলো, সরে যাই এখান থেকে!' বলল রবিন। ভয় পেয়েছে।

কিন্তু পা বাড়াবার আগেই কানে ভেসে এল সেই গম্ভীর গুম-গুম আওয়াজ। পাহাড়ের ভিতরে হচ্ছে শব্দটা, উঠে আসছে গর্ত বেয়ে। তারপরেই কাঁপতে শুরু করল ব্যালকনি, আসলে কাঁপছে গোটা পাহাড়টাই। একে অপরকে ধরে পতন ঠেকাল ওরা। দুইবার ঝাঁকি দিয়ে থেমে গেল কাঁপন।

সরে যাওয়ার আগে নীচে তাকিয়ে দেখল কিশোর, লোকগুলো নেই—সম্ভবত পাথুরে দেওয়ালের ওপাশে আড়াল নিয়েছে। ফারিহার একটা হাত ধরে দৌড় দিল কিশোর। ওদিকে রবিন ধরেছে মুসার হাত। মুসার কাঁধে বসে কোনও মতে ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করছে কিকো—পাহাড়ের ভিতর ভয়ানক সব ব্যাপার-স্যাপার দেখে স্রেফ বোবা

হয়ে গেছে সে। ওদিকে লাপাত্তা হয়ে গেছে ডিম্পল।

চড়াই বেয়ে উপরে উঠে এল ওরা। হাঁপাচ্ছে বেদম। কোত্থেকে ছুটে এসে রবিনের পায়ে গা ঘষল ডিম্পল।

'মনে হচ্ছে, সত্যিই প্রচণ্ড কোনও শক্তিকে বাগ মানাতে পেরেছে এই পাহাড়ের বৈজ্ঞানিক রাজা,' বলল মুসা। 'আমাদের উচিত যত শীঘ্রি সম্ভব এখান থেকে বেরিয়ে পালিয়ে যাওয়া।'

কিন্তু সিঁড়ি-ঘরটা খুঁজে পাচ্ছে না ওরা, ভুল পথে নিয়ে এসেছে ওদের ডিম্পল। এ-গলি ও-গলি ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ ড্রাগন আঁকা লাল সিল্কের পর্দা টাঙানো একটা ঘরের সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়াল ওরা। দৌড়ে ঘরে ঢুকে পড়বার আগেই ডিম্পলকে কোলে তুলে নিল রবিন। পা টিপে এগিয়ে গেল কিশোর। পর্দা সামান্য সরিয়ে ভিতরে নজর দিয়েই তাজ্জব হয়ে গেল ও। চমৎকার সাজানো-গোছানো একটা ঘর। মেঝেতে পুরু কার্পেট, চারপাশের দেওয়াল একই রকম ড্রাগন আঁকা লাল পর্দা দিয়ে ঢাকা, এক পাশে পাতা রয়েছে সুন্দর একটা গদি-মোড়া খাট। মনে হলো এটাই রাজার শয়নকক্ষ হবে।

ঘরের ভেতরটা ঠাণ্ডা কেন? চারদিকে চেয়ে কাউকে না দেখে সঙ্গীদের ইশারা করে ঢুকে পড়ল কিশোর ঘরের ভিতর। আশ্চর্য! দেওয়ালে গাঁথা একটা পাইপ, তার মুখে ঝাঁঝরির মত কী একটা লাগানো, সেখান থেকে ফুর-ফুর করে বের হচ্ছে ঠাণ্ডা বাতাস। এই পাহাড়ে সত্যিকার প্রতিভাবান কেউ যে আছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

কথাবার্তার শব্দে চমকে চোখ তুলল কিশোর। সামনের দেওয়ালে পর্দার নীচে সামান্য ফাঁক দেখে বুঝল, ওপাশে ঘর রয়েছে একটা। সামনে এগিয়ে সামান্য সরাল ও পর্দাটা। কামরাটায় দ্রুত একবার নজর বুলিয়ে ফিরে এল।

'খাবার ঘর,' বলল কিশোর নিচু গলায়। 'তিনজন লোক খাওয়া সেরে গল্প করছে। এসো, দেওয়ালে টাঙানো পর্দার ওপাশে লুকিয়ে থাকি।'

'খাবার ঘর?' আগ্রহে চক-চক করে উঠল মুসার দু' চোখ। পেটে একটা চাপড় দিয়ে বলল, 'খিদে!'

কয়েক মিনিটেই বন্ধ হয়ে গেল কথাবার্তা। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আবার পা টিপে এগোল কিশোর। পর্দা সরিয়ে ওপাশটা দেখেই হাসি মুখে চাইল সঙ্গীদের দিকে। ইশারায় ডাকল ওদের। পাশের ঘরে ঢুকে হাসি ফুটল সবার মুখে। টেবিলে সাজানো রয়েছে দশজনের উপযোগী নানান

পদের মজাদার খাবার। কেউ নেই বাধা দেয়ার।

এতক্ষণে জবান ফুটল কিকোর। বলল, 'খাইছে!'

দশ

বড় একটা প্ল্যাটারে পাশাপাশি সাজানো রয়েছে গোটা দশেক মস্ত আকারের গলদা চিংড়ি–দোপেঁয়াজার মত করে রান্না। সুড়ুৎ করে জিভ টানল মুসা। দুটো ডিশে ফ্রায়েড রাইস, দুটোয় শশা-গাজর-পেঁপে-ফুলকপি আর তাজা লেটুস পাতার সালাদ, পাশে দাঁড়িয়ে যেন ওদেরকে পাহারা দিচ্ছে একটা সাদা সিরকার বোতল। কয়েকটা নকশা আঁকা বাউলে রয়েছে চিকেন চিলি, ম্যান্ডারিন হোল ফিশ্র, চিকেন রোস্ট, খাসির কাটলেট আর চিকেন ড্রাম স্টিক। দুটো বাটিতে ফ্রুট কেকের টুকরো আর কাস্টার্ড পুডিং। আর একটা বড় বাটিতে সুন্দর করে সাজানো নানান জাতের সুস্বাদু ফল।

দুই কানে গিয়ে ঠেকেছে মুসার হাসি। ক্রিম দিয়ে গোলাপ ফুল তৈরি করা একটা বড়সড় ফ্রুটকেক তুলে নিয়ে মস্ত কামড় দিল, তারপর মুখের ভিতরের অবশিষ্ট সামান্য ফাঁক দিয়ে বলল, 'প্লিজ, তোমরাও একটু-আধটু নাও, সব একা আমি পারব না!'

ওদিকে ফলের বাটির উপর হামলে পড়েছে কিকো। সালাদের বাটিটা মেঝেতে নামিয়ে দিল রবিন ডিম্পলের জন্য, তারপর একটা নকশা আঁকা বাসন টেনে নিয়ে তাতে ফ্রায়েড রাইস, চিকেন চিলি, সুইট-সাওয়ার প্রন, ম্যান্ডারিন হোল ফিশ আর চিকেন রোস্ট তুলে এগিয়ে দিল ফারিহার দিকে। বলল, 'বি মাই গেস্ট। আর যা-যা ইচ্ছে হবে একটুও সঙ্কোচ না করে নিজের বড় ভাইয়ের বাড়ি মনে করে তুলে নেবে, কেমন?'

কার্পণ্য না করে পেট ঠেসে খেল সবাই। ডিম্পলের পেটের দু'-পাশ ফুলে উঠে ফাটার জোগাড় হয়েছে দেখে সালাদের বাটি সরিয়ে নিল রবিন, একটা হাফ প্লেটে এক পোয়া আন্দাজ দুধের সর আর বড় এক টুকরো পুডিং তুলে মেঝেতে নামিয়ে দিল ওর জন্য। ওদিকে ফলের বাটি ছেড়ে পুডিঙের বাটির কিনারায় গিয়ে বসেছে কিকো, বারকয়েক ঠোঁট ভর্তি করে পুডিং গিলে নিয়ে তৃপ্তির ঢেকুর তুলে বলল, 'পার্ডন প্লিজ!' তারপর মন দিল ফ্রুট কেকের দিকে।

'আর না, বাপরে!' প্লেট থেকে হাত তুলে নিল ফারিহা। এতক্ষণ কথা বলে সময় নষ্ট করেনি।

'হ্যাঁহ্, জীবনের খাওয়া খেয়ে নিয়েছি!' বলল সন্তুষ্ট কিশোর। 'মুসা আর খেলে তুমি তো চেয়ার ছেড়ে উঠতেই পারবে না। এখান থেকে পালাতে হবে আমাদের, ভুলে যেয়ো না কথাটা! তুমি বরং কিছু ফল আর কেক পকেটে পুরে নাও।'

'আর কয়েকটা ড্রাম স্টিক,' বলল ফারিহা।

বেহায়া হাসি হাসল মুসা, তারপর টপাটপ কয়েকটা আপেল, পিচ ও পোয়াটেক খেজুর ভরল কোটের পকেটে। এবার সযত্নে ন্যাপকিনে মুড়ে গোটা কয়েক ফ্রুট-কেক, ড্রাম স্টিক আর কাটলেট রাখল আরেক পকেটে। বলল, 'চলো, এবার যাওয়া যায়। রবিন, একটু টেনে দাঁড় করিয়ে দেবে, ভাই?'

লোভনীয় খাবারঘর ছেড়ে আরেকটা আলোকিত প্যাসেজে পড়ল ওরা। কিছুদূর এগোতেই মৃদু গুঞ্জনের শব্দে সতর্ক হয়ে উঠল। চিনতে পারছে, সামনেই সেই রাজসভা, মঞ্চে যেখানে সিংহাসন বসানো। পর্দার ফাঁকে চোখ রেখে দেখল মুসা, হ্যাঁ, সেই হলরুমটাই; তবে এখন ওখানে জড়ো হয়েছে অনেক লোক। পর্দা সামান্য সরিয়ে চোখ রাখল কিশোরও।

নানান দেশের লোক দাঁড়িয়ে আছে ওখানে, বিশ জনের কম হবে না। মাথায় মেরুন রঙের বেরেট দেখে চেনা গেল, ওরা প্যারাট্রুপার। ওদের মধ্যে জোডিকে দেখে চমকে উঠল কিশোর। তার মানে, অটার ও উলরিখ এখন জানে: কোনও ভাবে মুক্ত হয়ে পালিয়েছে রবিন উপরের সেই ঘর থেকে।

অর্থাৎ, একটু পরেই শুরু হবে খোঁজাখুঁজি। না কি শুরু হয়েই গেছে?

পাহাড় থেকে দ্রুত বেরিয়ে যাওয়ার জোর তাগিদ অনুভব করল কিশোর। কিন্তু যে পথ ধরে এসেছে, সেই পথে ফিরে তো কোনও লাভ নেই। ওরা যে পথটা চেনে, অর্থাৎ মই ঝুলানোর সেই ছোট্ট ঘরটায় পৌঁছতে হলে সামনের এই হলরুমের ভিতর দিয়ে যেতে হবে ওদেরকে। এখন যেহেতু সেটা সম্ভব নয়, এদের সমাবেশ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে।

প্যারাট্রুপার ছাড়াও, কিশোর দেখতে পাচ্ছে, জমকালো ইউনিফর্ম পরা জনা পঁচিশেক জাপানি প্রহরী বুক টান করে দাঁড়িয়ে আছে হলরুমের দু'-পাশের দেওয়াল ঘেঁষে। সিংহাসন শূন্য। অটার উলফকেও দেখা যাচ্ছে না কোথাও।

হঠাৎ থেমে গেল গুঞ্জন, সিংহাসনের পাশে একটা ঝুলন্ত পর্দা দু'-পাশ থেকে তুলে ধরল দু'-জন প্রহরী, দুই পাশে দুই অনুচরকে নিয়ে রাজসভায় প্রবেশ করলেন পাহাড়ের রাজা।

দীর্ঘদেহী রাজাকে আরও দীর্ঘ দেখাচ্ছে মাথার উপর উজ্জ্বল পাথর বসানো উঁচু একটা মুকুট পরে থাকায়। পরনে অত্যন্ত দামি একটা সুট, তার উপর কাঁধ থেকে হাঁটুর নীচ পর্যন্ত ঝুলছে মূল্যবান রত্নখচিত কালো একটা আলখেল্লা। মুকুটের নীচ থেকে কোঁকড়া কালো চুল নেমে এসেছে পিঠে ও গালের দু'-পাশে। সামনের সবাইকে এক নজর দেখে নিয়ে সিংহাসনে বসলেন তিনি।

অনুচরদের একজনকে চেনা গেল—ঈগলচক্ষু অটার উলফ্, অপরজন দেখতে অনেকটা শিম্পাঞ্জীর মত, কিশোর আন্দাজ করল, এই লোকটাই উলরিখ হবে।

এক পা সামনে এগিয়ে উপস্থিত সবার উদ্দেশে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কয়েক মিনিট অচেনা বিদেশি ভাষায় বক্তৃতা দিল উলফ্, কী বলল তার বিন্দু-বিসর্গ কিছুই বুঝল না তিন গোয়েন্দা বা ফারিহা। তারপর একটু থেমে লোকটা ইংরেজিতে পেশ করল আবার তার বক্তব্য।

মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনল ওরা। প্রথমে লোকটা বুঝিয়ে বলল কী আবিষ্কার করেছেন রাজা, তারপর ব্যাখ্যা করল এই আবিষ্কার মানব জাতির জন্য কতখানি মঙ্গল বয়ে আনবে। প্রশংসা করল প্যারাট্রুপারদের, যারা পরীক্ষামূলক ভাবে ডানাগুলো ব্যবহার করে এই গবেষণায় সাহায্য করেছে এবং করছে। জানাল, কী বিপুল পরিমাণ টাকা ও সম্মান লাভ করতে চলেছে তারা।

একটু থেমে আরেক ভাষায় বলল উলফ্ একই কথা, তারপর চতুর্থ আরেক ভাষায়। কিশোরের মনে হলো ঘরের সবাই সম্মোহিত হয়ে পড়েছে। মহান একটা কাজে সাহায্য করার সুযোগ লাভ করে অনুপ্রাণিত বোধ করছে। উৎসাহ, উদ্দীপনা ও আগ্রহে চকচক করছে ওদের চোখ। যখন প্রশ্ন করা হলো এবারের উন্নততর ডানা পরীক্ষা করবে কে-কে, সবাই এগিয়ে এল এক-পা। উঠে দাঁড়ালেন রাজা, আঙুল তুলে তিনজনকে বাছাই করলেন, তারপর অস্বাভাবিক চিকন, বেমানান, উঁচু কণ্ঠে সংক্ষিপ্ত একটা ভাষণ দিলেন—কী বললেন, বেশিরভাগ শোনাই গেল না।

রাজা বসে পড়তেই আবার সামনে এগিয়ে এল অটার উলফ্। বলল, প্রাথমিক অবস্থায় যারাই সাহস করে এই অসাধারণ গবেষণায় সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করবে, তাদেরকে বাকি জীবন বসে খাওয়ার মত অঢেল

টাকা-পয়সা দিয়ে দেশে ফেরত পাঠানো হবে। এর আগে যারা ডানার কার্যকারিতা পরীক্ষা করেছে, এবং সামান্য ত্রুটি সম্পর্কে আলোকপাত করেছে, তারা সবাই প্রচুর ধন-সম্পদ নিয়ে নিরাপদে নিজ নিজ দেশে ফিরে গেছে, তারা এখন সেখানে কেবল ধনী নয়, অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি।

'আমার তা মনে হয় না,' বিড় বিড় করে বলল রবিন। 'তারা এখন এই বিরান পাহাড়ি অঞ্চলেই রয়েছে; চার হাত মাটির নীচে!'

রাজা বেরিয়ে গেলেন, অটার উলফ্ আর উলরিখ শিম্পাঞ্জীও গেল তাঁর সঙ্গে। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই প্যারাট্রুপারদের নিয়ে চলে গেল জাপানি প্রহরীরা, খালি হয়ে গেল রাজসভা।

সব আবার সুনসান হয়ে যেতেই নড়ে উঠল মুসা, 'চলো, চিনতে পেরেছি। এই ঘর থেকে বেরিয়ে ডাইনে মোড় নিলেই পৌঁছানো যাবে মই-ঘরে।'

বার কয়েক মোড় ঘুরে মাঝখানে উজ্জ্বল বাতি বসানো সেই কারখানার কাছে চলে এল ওরা। নিঃশব্দে ঘুরছে চাকাগুলো। হঠাৎ কিশোরের হাতে চাপ দিল রবিন। চমকে উঠে ওর তাক করা আঙুল বরাবর তাকিয়ে একজন লোককে দেখতে পেল ও।

মস্ত উঁচু কপালওয়ালা বুড়ো এক লোক, কাঁচের পাত্রগুলোর উপর ঝুঁকে কী যেন দেখছে। বাতির আলোয় চকচক করছে তার বিশাল টাক। ঠোঁটে আঙুল রেখে সবাইকে চুপ করে থাকার ইঙ্গিত করল কিশোর, তারপর নিঃশব্দ পায়ে সরে গেল ব্যালকনি থেকে।

আর কয়েকটা বাঁক নিয়ে পৌঁছে গেল ওরা মই-ঘরে। এইবার মই বেয়ে নেমেই ফাটল গলে বেরিয়ে যাবে ওরা বাইরে।

'ডিম্পলের কী হবে?' জিজ্ঞেস করল ফারিহা। 'ওকে নিয়ে নামব কী করে?'

'তাই তো!' বলল রবিন। 'ও ওপরে উঠলই বা কী করে? ঘুটঘুটে আঁধারে পিঠে ধাক্কা খেয়ে মই বেয়ে উঠে এসেছি, ডিম্পল বা কুকুরগুলো কীভাবে উঠবে সেকথা ভাবার অবকাশ পাইনি। নিশ্চয়ই মই বেয়ে ওঠেনি?'

'তার মানে, নীচে ছোট কোনও ফোকর রয়েছে পাহাড়ের গায়ে,' বলল কিশোর। 'আমাদের জন্যে ছোট, কিন্তু ওদের জন্যে যথেষ্ট বড়। খুব সম্ভব ওই পথেই উঠে এসেছে ওরা।' টর্চ জ্বেলে দড়ির মইটা খুঁজল কিশোর গর্তের কাছে। 'আরে! মইটা গেল কোথায়?'

অনেক খোঁজাখুঁজি করেও পাওয়া গেল না মই। গুটিয়ে কোথায় রাখা

হয়েছে তা-ও বোঝা গেল না। আশপাশের দেওয়ালে আলো ফেলল কিশোর। দেখা গেল, স্টিলের ছোট একটা লিভার গাঁথা রয়েছে একপাশের দেওয়ালে। ওটা টানাটানি করে দেখল ওরা। ডাইনে, বাঁয়ে বা নীচে টেনে কোনও লাভ হলো না। কিন্তু উপর দিকে ঠেলতেই সরে গেল একটা পাথর। তার ওপাশে দেখা গেল, একটা চাকার গায়ে প্যাঁচানো রয়েছে মইটা। কিছুতেই নড়ানো গেল না চাকা। নীচ থেকে হুইল ঘোরালে নেমে যায় মই, ওরা জানে; কিন্তু উপর থেকে ওটাকে নামানোর কোনও উপায় পাওয়া গেল না। সবাই একবার করে চেষ্টা করল, কিন্তু বৃথা।

অনেক ভাবে চেষ্টার পর শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে হার মানল কিশোরও।

এগারো

এবার? বিকেল গড়িয়ে গেছে বেশ অনেকক্ষণ। কোথাও যাবার নেই, কিছু করার নেই। অনুভব করছে, একটু যেন খিদে-খিদে ভাব আসছে। তবে সবার আগে মুসার মুখ দিয়েই বের হলো খাওয়ার প্রস্তাবটা।

'নাহ্! এখানে সময় নষ্ট করছি আমরা। সেই খাবার ঘরটায় ফিরে গেলে কেমন হয়?'

'খুবই ভাল হয়,' বলে উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'আর একটা গলদা চিংড়ি সাবড়াতে পারলে...'

'আগামী সাতদিন আর না খেলেও চলবে!' বলল ফারিহা। 'চলো, চলো, দেরি কীসের?'

সভাকক্ষে পৌঁছে ওরা দেখল কেউ নেই। নির্বিঘ্নে চলে এল ওরা খাবার ঘরে। অবশিষ্ট খাবার তেমনি রয়েছে দেখে খুশি হয়ে উঠল ওরা। বসে পড়ল একেকজন একেকটা চেয়ার দখল করে। কিন্তু গলদা চিংড়ির দিকে হাত বাড়িয়েও থেমে গেল মুসা। পাশের ঘর থেকে কীসের যেন আওয়াজ এসেছে কানে। পাথর হয়ে জমে গেল সবাই।

ওদের এই হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে যাওয়া টের পেল কিকো, চাপা কণ্ঠে বলল, 'চু-উ-প!' কিন্তু পরমুহূর্তে দেখতে পেল, সামনের দুই পা টেবিলে তুলে সালাদের বাটিতে মুখ দিতে চলেছে ডিম্পল। রেগে গিয়ে চ্যাঁ করে চেঁচিয়ে উঠে তেড়ে গেল সে ওর দিকে।

'খাইছে!' বলল মুসা।

বলতে না বলতেই পাশের ঘর থেকে পর্দা সরিয়ে উঁকি দিল একটা মুখ। এ-মুখ ওদের চেনা—ব্যালকনি থেকে আজই দুপুরে ল্যাবরেটরিতে কাজ করতে দেখেছে একে। উঁচু কপাল, একটা চুলও নেই মাথায়, বিস্ফারিত দুই পাগলাটে চোখের মণি সবুজ, নাকের আগাটা বাঁকা হয়ে মনে হচ্ছে চিবুক ছুঁয়ে দেবে, গাল দুটো তোবড়ানো, গায়ের রং হলদেটে।

ওদের দিকে নীরবে চেয়ে রইল লোকটা কিছুক্ষণ, তারপর চিকন, কাঁপা গলায় বলল, 'কারা তোমরা? চিনি বলে তো মনে পড়ছে না! না কি ভুলে গেছি?'

'না কি ভুলে গেছি?' বুড়োর গলা নকল করে বলল কিকো।

অবাক হয়ে সবার মুখের দিকে চাইল লোকটা। বুঝতে পারছে না, কে বলল কথাটা। আসলে, দোষ করে ফেলেছে টের পেয়ে কাগজের ফুল দিয়ে সাজানো বড় একটা ফুলদানীর আড়ালে লুকিয়েছে বলে দেখা যাচ্ছে না কিকোকে। ওরা চারজন কেউ কিছু বলছে না, সবাই ভাবছে, লাফিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠেই দৌড়ে পালাবে কি না।

'কয়েকটা কিশোর-কিশোরী কী করছে এখানে?' বিস্মিত কণ্ঠে বলল লোকটা। 'তোমাদের চিনি আমি? দেখেছি আগে? অ্যাঁ? তোমরা এখানে কেন?'

'আমরা, মানে,' আমতা-আমতা করে নিরীহ ভঙ্গিতে বলল কিশোর, 'আমাদের একজন হারিয়ে যাওয়ায় খুঁজতে এসেছিলাম, কিন্তু এখন আর বেরোতে পারছি না। কোন্ দিক দিয়ে বেরনো যাবে বলতে পারেন?'

বুড়োর চেহারায় এমনই ভ্যাবাচ্যাকা ভাব যে ওদের মনে হলো, হয়তো ওদের বেরোবার উপায়টা বাতলে দেবে। কিন্তু জোরে জোরে মাথা নাড়ল সে।

'না-না-না-না! সেটি হবে না!' বলল হুঁশিয়ার বুড়ো। 'অনেক গোপনীয় ব্যাপার আছে এখানে, বুঝলে। আমার গোপন কথা। এখানে কেউ ঢুকে পড়লে আমার গবেষণা শেষ না হওয়া পর্যন্ত বেরোতে পারে না। আমিই এখানকার রাজা, আমার মাথাই চালায় এখানকার সবকিছু। বুঝতে পেরেছ?'

'কিন্তু আপনাকে তো রাজার মত দেখাচ্ছে না?' বলল ফারিহা। 'আমরা দেখেছি সিংহাসনে বসা রাজাকে। উনি আপনার চেয়ে অনেক লম্বা, সুন্দর একটা মুকুট ছিল, কোঁকড়া কালো চুল ছিল তাঁর মাথায়।'

'চুলগুলো চুলকায়, তাই খুলে রেখেছি,' বললেন বৃদ্ধ। 'ওরা আমাকে

ওসব পরায়, যাতে দেখতে ভাল লাগে। আমি পৃথিবীর রাজা হতে চাই, বুঝলে, গোটা পৃথিবীর রাজা! কারণ আমার মাথাই সবার চেয়ে বড়। অনেক কিছু জানি আমি। উলফ্ বলে, আমার গবেষণাটা সফল হলেই আমাকে পৃথিবীর সম্রাট বলে মেনে নেবে সবাই। তার আর বেশি দেরি নেই, বুঝলে। সাফল্যের একেবারে দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছি আমি।'

'তা হলে আপনাকেই রাজা বানিয়ে হাজির করে অটার উলফ্ মানুষের সামনে?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'না সাজালেও আমিই রাজা,' মাথাটা পিছনে হেলিয়ে বললেন বৃদ্ধ। 'আমার বিরাট ব্রেনের কারণে। অনেক জানি আমি। এখানে ব্যবহার করছি মাধ্যাকর্ষণ সম্পর্কে আমার অগাধ জ্ঞান।' ওদেরকে বেশি ছোট মনে করে এরপর মাধ্যাকর্ষণ কী তা বোঝাতে শুরু করলেন রাজা। তিন গোয়েন্দার কাছে মনে হলো বকবক করছে বয়সের ভারে বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাওয়া এক বাহাত্তুরে বুড়ো।

'কী, বিশ্বাস হচ্ছে না আমার কথা?' হঠাৎ ভুরু কুঁচকালেন রাজা। 'আমি এমন কিছু রশ্মি আবিষ্কার করেছি যেগুলো অকেজো করে দেয় পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে। বুঝলে?'

'তা হলে তো যে-কোনও জিনিস আপনি শূন্যে ভাসিয়ে রাখতে পারবেন,' বলল ফারিহা।

'পারবই তো!' উত্তেজিত হয়ে উঠলেন বৃদ্ধ। 'আমি দুটো ডানা বানিয়ে তার ভেতর বন্দি করেছি এই শক্তিকে। ফলে কেউ ওগুলো দু'-হাতে পরে নিয়ে যদি প্লেন থেকে বাইরে লাফ দেয়, একটা বোতাম টিপলেই সে আর নীচে পড়বে না—পাখির মত উড়তে পারবে সে, ডানা ঝাপটে দিক বদল করতে পারবে, ইচ্ছে হলেই বোতামে টিপ দিয়ে মাটিতে নেমে আসতে পারবে যখন খুশি।'

'সত্যিই এটা সম্ভব?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'আলবত!' সন্দেহ করা হচ্ছে মনে করে রেগে উঠলেন বৃদ্ধ। 'তা হলে কি তুমি মনে কর অটার আর উলরিখ আমার পেছনে খামোখা এত-এত টাকা ঢালছে? ওরা জানে আমি পারব।'

'উড়তে পারলে কিন্তু সত্যিই দারুণ হতো!' বলল ফারিহা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে। 'আপনি নিশ্চয়ই খুব বড় একজন বিজ্ঞানী!'

মাথা নাড়লেন বৃদ্ধ। '*খুব* বড় না, *সবার চেয়ে* বড়। এত বড় মগজওয়ালা আর একজন লোক পাবে না তোমরা সারা দুনিয়ায়। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আমি, বুঝলে। সব পারি আমি, সব!'

'এখান থেকে বেরোবার রাস্তাটা আমাদের দেখিয়ে দিতে পারবেন?' চট করে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

কয়েক সেকেন্ড অস্বস্তিতে উশখুশ করলেন বৃদ্ধ।

'তোমরা যদি পাখাগুলো পরীক্ষা করে দেখতে রাজি হও, তা হলে বেরোতে পারবে,' বললেন তিনি। 'ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই এখানে বন্দি। এমনকী আমিও। অটার উলফ্ পরিষ্কার বলে দিয়েছে সে কথা। রোজ তাগাদা দিচ্ছে, সময় নেই হাতে, যত শীঘ্রি সম্ভব নিখুঁত করতে হবে আমার পাখা। একমাত্র তা হলেই আমাকে পৃথিবীর রাজা বানানো হবে, ভক্তি-শ্রদ্ধা করবে সবাই, বুঝলে। যাই, খামোখা বক-বক না করে লেগে যাই কাজে,' বলেই পর্দার আড়ালে চলে গেলেন তিনি।

'এবার এসো,' বলল মুসা। 'আমাদেরও কাজ পড়ে আছে!' বলেই গলদা চিংড়ির ডিশ থেকে তুলে নিল ঢাউস সাইজের একটা। বাকি সবাইও হুমড়ি খেয়ে পড়ল টেবিলের উপর।

তৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে উঠল ওরা। এবার কী করা যায় সে-প্রশ্ন তুলে আলোচনা শুরু করতে যাচ্ছিল কিশোর, মুসা হাত উঁচু করতেই থেমে গিয়ে মুখ বন্ধ করল।

'কারা যেন আসছে!' বলল মুসা ফিসফিস করে।

'দেয়ালে ঝোলানো পর্দার পেছনে চলো সবাই!' বলে চেয়ার ছাড়ল কিশোর।

ছুটে গিয়ে পর্দার আড়ালে লুকাল সবাই, আটকে রেখেছে দম।

দুজন জাপানি ঢুকল ঘরে, টেবিল পরিষ্কার করবে। ডিশগুলোর দিকে চেয়েই হাঁ হয়ে গেল ওদের মুখ। থালা-বাটি গুছাতে গুছাতে বিস্মিত কণ্ঠে কী সব বলছে নিজেদের ভাষায়। তারপর জোরে চেঁচিয়ে উঠল একজন। ব্যাপারটা কী টের পেল না ওরা পর্দার ওপাশ থেকে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে, ধড়াস-ধড়াস করছে হৃৎপিণ্ড। মুসার কাঁধে বসে আছে হতবাক কিকো।

হঠাৎ তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল ফারিহা। পর্দার আড়াল থেকে একলাফে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা। দেখল, ফারিহাকে আড়াল থেকে টেনে বের করছে জাপানি দুজন। পর্দার নীচ থেকে ওর পা খানিকটা বেরিয়ে ছিল বাইরে।

বারো

দুই জাপানি ধরেছে ফারিহার দুই হাত। ছুটে গিয়ে ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল কিশোর ও রবিন। মুসা খুঁজছে লাঠি বা আর কিছু পাওয়া যায় কি না। জাপানি দু'জন মুক্ত হাত দুটো ঝাড়া দিল, তাতেই ছিটকে পাঁচ হাত দূরে গিয়ে পড়ল কিশোর ও রবিন।

কারাটির ভঙ্গি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল মুসা ওদের উপর। ফারিহাকে ছেড়ে দিয়ে বিদ্যুদ্বেগে ঠেকিয়ে দিল একজন মুসার মার, পরমুহূর্তে জ্যুজুৎসুর প্যাঁচে আটকে ফেলল ওর একটা হাত। টান দিয়ে মুসাকে নিজের পিঠের কাছে নিয়ে এসে শরীরে সামান্য ঝাঁকি দিল সে। দেখা গেল শূন্যে উঠে গেছে মুসা, একপাক খেয়ে দড়াম করে পড়ল ও টেবিলের উপর, তারপর বাসন-পেয়ালা-ডিশ নিয়ে পড়ল শক্ত মেঝেতে। কিকো ছুটে গেল প্রতিশোধ নিতে, কিন্তু হাতের এক ঝাপটায় সরিয়ে দিল ওকে লোকটা। ব্যথা পেয়ে 'চ্যাঁ' করে একটা ডাক ছেড়ে পালাল কিকো, ফ্যাসাদ দেখে আগেই গায়েব হয়ে গেছে ডিম্পল। লোকটা এবার ঝাঁপিয়ে পড়ল মুসার উপর, জুডো হোল্ডে ওকে আটকে নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

এই সময় গোলমালের আওয়াজ পেয়ে আরও চারজন জাপানি ঢুকল ঘরে। দুই মিনিটের মধ্যে ধরা পড়ল সবকজন। খাবারঘর থেকে বের করে ওদেরকে হাঁটিয়ে বড়সড় একটা ঘরে নিয়ে এল ছয় জাপানি। ধরা পড়ে রাগে ফোঁপাচ্ছে ফারিহা।

দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড় করানো হলো ওদেরকে। মুসা ভাবছে, কিকো গেল কোথায়? ও তো পালাবার মানুষ না! নিশ্চয়ই খুব ব্যথা পেয়েছে বেচারা!

কয়েক মিনিটের মধ্যে ঘরে এসে ঢুকল অটার ও উলরিখ। জ্বলছে অটারের তীক্ষ্ণ চোখজোড়া। একে একে সব কয়জনকে ভাল করে দেখল সে। মাথা ঝাঁকাল।

'হুঁ। তা হলে দেখা যাচ্ছে চারজন তোমরা! তিনজন এসেছ গুহায় আটকানো ওই মিথ্যুক ছোকরাটাকে বের করে নিয়ে যেতে, না? দরজা খুলে ওকে পেয়েই ভেবেছিলে এবার অনায়াসে পালিয়ে যাবে এখান থেকে। তাই না? এতই সহজ?'

জবাবের অপেক্ষায় কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকল লোকটা, কেউ কিছু বলল না দেখে আবার বলল, 'এবার শোনা যাক, দড়ির মইটা নামালে কী করে? কে শেখাল কায়দাটা?'

কেউ কোনও জবাব দিচ্ছে না দেখে চোখদুটো সরু হয়ে গেল ওর।

'আমি একটা প্রশ্ন করেছি,' বলল সে, 'এই যে, তুমি! উত্তর দাও প্রশ্নের।'

'মাথা খাটিয়ে বুঝে নিয়েছি,' বলল কিশোর সংক্ষেপে।

'আর কেউ জানে, কীভাবে উঠতে হয় ওপরে?' এবার প্রশ্ন করল শিম্পাঞ্জী উলরিখ। চেহারাটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে ওর।

'তা আমরা কী করে বলব?' তিক্ত কণ্ঠে বলে উঠল রবিন, 'কী হবে আর কেউ জানলে? এত রাখ-ঢাক কীসের? ঢোকার পথটা পর্যন্ত আড়াল করে রেখেছ লতা-পাতা-কাঁটাঝোপ দিয়ে—বেআইনী কী চলছে এখানে গোপন করার মত?'

দুই পা এগিয়ে এসে চড়াৎ করে চড় কষাল উলরিখ রবিনের গালে। সঙ্গে সঙ্গে লাল হয়ে ফুটে উঠল পাঁচ আঙুলের দাগ। রাগের মাথায় ধস্তাধস্তি করল মুসা, কিন্তু বেকায়দা ভঙ্গিতে ওর একটা হাত পিঠের কাছে বাঁকিয়ে এনে ধরে রাখা হয়েছে বলে ছুটতে পারল না। চড় খেয়েও টুঁ-শব্দ করল না রবিন। বেপরোয়া ভঙ্গিতে চেয়ে থাকল উলরিখের চোখের দিকে।

আবার চড় তুলল উলরিখ, কিন্তু ওকে বারণ করল অটার।

'বাদ দাও, উলরিখ। এসব বেয়াড়া ছেলেদের সিধে করবার আরও রাস্তা আছে। এখুনি কুকুর ছেড়ে দেয়া দরকার, এদের সঙ্গে আরও লোক থাকলে খুঁজে বের করে ধরে আনবে।'

এই সেরেছে!—ভাবল কিশোর—আঙ্কেল ডিক আর ট্রেফর বন্দি হলে উদ্ধারের আশা-ভরসা সব শেষ হয়ে যাবে। কুকুরগুলো যদি ধরে আনে...

এমনি সময়ে কাছাকাছি কোথাও ঘরের বাইরে থেকে ফাঁপা কাশির শব্দ ভেসে এল। আঁৎকে উঠল অটার ও উলরিখ। অটার ছুটে গিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে চাইল গুহার এদিক-ওদিক। কোথাও কেউ নেই। অথচ, কোনও সন্দেহ নেই, ভৌতিক একটা কাশির শব্দ শুনেছে সে।

'তোমাদের সঙ্গে নিশ্চয়ই আরও কেউ আছে!' অভিযোগের সুরে বলল সে, 'ছেলে না মেয়ে?'

মাথা নাড়ল কিশোর। 'আর কোনও ছেলে-মেয়ে নেই।'

মুসা ভাবছে, এরা যে চরিত্রের লোক; এদের হাতে কিকো ধরা না

পড়লেই ভাল হয়। ওকে ঘাড় মুচড়ে মেরে ফেলাও এদের দ্বারা সম্ভব।

'মিথ্যে বলছ তুমি!' গর্জে উঠল উলরিখ।

চুপ করে থাকল কিশোর।

যেন প্রেতলোক থেকে আবার ভেসে এল মহা বিরক্ত কণ্ঠস্বর, 'দুরো! দরজা বন্ধ করো, গাধা কোথাকার! ঠাণ্ডা আসছে!' বলেই খনখনে গলায় হেসে উঠল কিকো ওর রক্ত হিম করা হাসি।

ভয়ে পাংশু হয়ে গেল প্রহরীদের মুখ। কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে এবার উলরিখ গেল ব্যাপার কী দেখতে। গুহার দুই দিকেই কিছুদূর করে হেঁটে দেখে এল। কিকো তখন উঁচু একটা পাথরের তাকে চুপচাপ বসে ঘাড় কাত করে দেখছে ওদের। ওরা ফিরে যেতেই কাতর স্বরে বলল, 'ব্যথা! ডাক্তার ডাকো, জলদি!'

'ব্যাপার কী! কে ওটা?' চোখ গরম করে তাকাল অটার ওদের চারজনের দিকে। 'যে-ই হোক, ধরতে পারলে ওর চামড়া ছাড়িয়ে নেব আমি।'

'আমরা চারজনই,' বলল কিশোর। 'তিন ছেলে, এক মেয়ে।'

'বিশ্বাস না হয় গুনে দেখতে পারেন!' ফস্ করে বলে বসল রবিন বেয়াড়া সুরে। চড় খেয়ে সপ্তমে উঠে আছে ওর মেজাজ।

চোখ সরু করে রবিনকে দেখল অটার উলফ। তারপর মাথা ঝাঁকাল। 'তোমাকে সিধে করার কায়দা আমার জানা আছে, ছোকরা! বেয়াদবি করে হয়তো পার পেয়েছ এতদিন, কিন্তু আমার কাছে পাবে না।'

'কিছু মনে করবেন না,' বলল কিশোর। 'ওর মাথায় একটু...'

'সব গোলমাল ঠিক হয়ে যাবে!' বলে মুচকি হাসল অটার। 'ওষুধ আছে আমার কাছে। এবার বের হও ঘর থেকে, আমাদের সামনে সামনে হাঁটতে থাকো।'

স্টোররুমের খোলা দরজা পেরিয়ে সেই পাথুরে সিঁড়ির সামনে নিয়ে আসা হলো ওদের। উপরে ওঠার নির্দেশ দিল অটার। কিশোর ঘাড় ফিরিয়ে দেখল জাপানিরা নেই, পিছন থেকে সরে গেছে ওদের অজান্তে।

আরও উপরে উঠে চলল ওরা। চূড়ার কাছাকাছি পৌঁছে রবিনকে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো ওর আগের সেই খুপরি-ঘরে। 'এই ঘরেই থাকবে তুমি। কয়েকটা দিন খেতে না পেলে খুব শীঘ্রিই ভদ্রতা শিখে ফেলবে।' বাইরে থেকে হ্যাজবোল্ট লাগিয়ে দিয়ে বাকি তিনজনকে আরও উপরে ওঠার ইঙ্গিত করল অটার।

ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ ধাপ উঠতেই পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছে গেল ওরা।

চারপাশে সে কী অপূর্ব দৃশ্য! যেদিকে তাকাও অফুরন্ত পাহাড় আর জঙ্গল। মনে হলো অনেক উপর থেকে দেখছে ওরা পৃথিবীটাকে। মেঘগুলো ভেসে যাচ্ছে ওদের গা ঘেঁষে। পাহাড়ের ভিতরের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে উজ্জ্বল রোদ আর ঠাণ্ডা হাওয়া দারুণ ভাল লাগছে ওদের।

পাহাড়ের চূড়াটা সমতল। তিনটে দিক ঘিরে রেখেছে অনেক ক'টা খাড়া পাথর, দেখতে অনেকটা দাঁতের নীচের পাটির মত লাগে। মস্ত প্রাঙ্গণের একপাশে ছায়ায় বসে তাস খেলছে একদল প্যারাট্রুপার।

তিন কিশোর-কিশোরীকে পাহাড়ের চূড়ায় দেখে ওদের চোখে ফুটে উঠল বিস্মিত দৃষ্টি। জোডিকে দেখতে পেল কিশোর ওই দলে। কিন্তু কেউ কিছু না বলে মন দিল হাতের তাসে।

প্যারাট্রুপারদের থেকে দূরে তেরপলের ছাউনি দেওয়া একটা জায়গায় নিয়ে আসা হলো কিশোর, মুসা ও ফারিহাকে।

'এখানেই থাকবে তোমরা!' হুকুম জারি করল অটার। 'আর ওই লোকগুলোর সঙ্গে একটা কথাও বলবে না। ওরা ডাকলেও কাছে যাবে না। তোমরা বন্দি—বুঝতে পেরেছ? আমরা এখানে তোমাদের চাইনি। আমাদের অনুমতি বা অনুমোদনের তোয়াক্কা না করেই ওপরে উঠে এসেছ তোমরা। কাজেই যতদিন খুশি আমরা আটকে রাখব তোমাদেরকে এখানে।'

'রবিনকেও এখানে রাখা যায় না?' বলল ফারিহা। 'বেচারা ওখানে একা...'

'কে? ওই বেয়াদব ছোকরার কথা বলছ?' মাথা নাড়ল অটার। 'না। পাওনা শাস্তি ভোগ করতে হবে ওর। ভদ্র আচরণ করতে রাজি না হওয়া পর্যন্ত না-খাইয়ে রাখা হবে ওকে।'

ওদের ওখানেই রেখে প্যারাট্রুপারদের কিছু নির্দেশ দিয়ে পাহাড়ের ভিতর অদৃশ্য হলো অটার ও উলরিখ। ওরা কেউ ওদের ধারে-কাছেও এল না। এমন কী জোডিও না। বোঝা গেল বারণ করা হয়েছে ওদেরকে।

পাশেই চূড়ার প্রান্তে একটা প্যারাপেট মত দেখতে পেয়ে ওর উপর গিয়ে বসল মুসা, কিশোর গিয়ে দাঁড়াল ওর পাশে। আড়াল পেয়ে নিশ্চিন্ত মনে বিনকিউলার তুলল মুসা চোখে—নীচে যতদূর দেখা যায়, খুঁজছে আঙ্কেল ডিককে। ভাবছে, কুকুরগুলো কি ধরে ফেলেছে তাঁকে?

প্যারাপেটের উপর আরও একটু সোজা হয়ে বসল মুসা। পাহাড়ের ঢালে কী যেন নড়তে দেখেছে ও চোখের কোণে। কী নড়ে? আঙ্কেল বা

ট্রেফর কিংবা ঘোড়াগুলো নয় তো?

না। ফোকাস অ্যাডজাস্ট করতেই পরিষ্কার দেখতে পেল ও কুকুরগুলোকে। দল বেঁধে খুঁজে বেড়াচ্ছে, চক্কর দিচ্ছে গোটা এলাকা। ডিম্পলের মা সুইটির কথা ভাবল ও। ভাগ্যিস দড়িটা যথেষ্ট লম্বা করে ওকে বেঁধেছে কিশোর, পানি বা ঘাসের অভাব পড়বে না, তবে বাচ্চাটার জন্যে দুশ্চিন্তা করবে বেচারি। সত্যিই তো, ডিম্পলটা গেল কোথায়?

ভাবতে না ভাবতেই পায়ে কীসের স্পর্শ পেয়ে লাফিয়ে উঠল মুসা। প্যারাপেটের উপর ভারসাম্য হারাচ্ছিল, চট্ করে ওর হাত ধরে ফেলল কিশোর। চোখ নামিয়ে দেখল মুসা, প্যারাপেটের বাইরের দিকে সরু একটা কার্নিসের ওপর দাঁড়িয়ে ওর দিকে চেয়ে রয়েছে ডিম্পল। চট্ করে ঝুঁকে ওকে কোলে তুলে নিল মুসা।

ডিম্পলকে পেয়ে খুশি হয়ে উঠল ওদের সবার মন। প্রচুর আদর পেয়ে ডিম্পলও খুশি। তারপরেও উশখুশ, রবিন নেই।

'আচ্ছা, কিকোর কী হলো? ধরা পড়ল না কি?' জিজ্ঞেস করল ফারিহা।

'ওকে ধরা অত সহজ না,' বলল মুসা। 'দেখোগে কেমন নাচ নাচাচ্ছে ও এখন ওদের। হাঁচি দেবে এখানে, হেসে উঠবে বিশ হাত দূরে; তারপর আত্মা খাঁচাছাড়া করে দেবে টানেলে ঢোকা রেল ইঞ্জিনের বিকট আওয়াজ শুনিয়ে। ওকে নিয়ে দুশ্চিন্তা কোরো না। ও আমাদের চেয়ে ভাল আছে।'

ঠিকই বলেছে মুসা। এই মুহূর্তে ঠিকই বাঁদর-নাচ নাচাচ্ছে কিকো অটার ও উলরিখকে। ওরা জানে না একটা কাকাতুয়া আছে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে। তাই রীতিমত ঘাবড়ে গেছে ওরা। ব্যাপারটা কী! মানুষ নেই, অথচ মানুষের গলা পাওয়া যাচ্ছে! আশ্চর্য না?

সন্ধে ঘনিয়ে আসতেই প্রথমে কুকুরের ডাক শোনা গেল, তারপর সিঁড়ি বেয়ে দু'জন জাপানির সঙ্গে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে এল ভয়ালদর্শন দশটা অ্যালসেশিয়ান। চেয়ে রইল কিশোররা, কিন্তু আঙ্কেলের দেখা নেই। এতে অবশ্য কিছুই প্রমাণ হয় না, তাঁকে নীচেই কোথাও আটকে রাখা হয়ে থাকতে পারে। তবু স্বস্তি বোধ করল ওরা।

ওদের থেকে বেশ কিছুটা দূরে লোহার জাল দিয়ে ঘেরা একটা জায়গায় আটকে রাখা হলো কুকুরগুলোকে।

ফিরে যাওয়ার সময় একজন জাপানি ওদেরকে চোখ বড় বড় করে বলে গেল, 'ভেলি ভেলি কেয়ালফুল। দগ্‌স্ ভেলি বাইটি!'

তেরো

জাপানি দু'জন নীচে নেমে যেতেই ওরা তিনজন এগিয়ে গেল কুকুরের ঘরের দিকে। এক রাত ঘুমিয়েছে ওরা একই সঙ্গে। বন্ধুত্বটা ঝালিয়ে রাখলে কাজে দেবে।

কিন্তু ওরা কাছে যেতেই চাপা গর্জন ছাড়ল কুকুরগুলো। রবিন নেই আজ সঙ্গে। নরম গলায় দু'-একটা বন্ধুত্বসূচক শব্দ উচ্চারণ করে আরও এক-পা সামনে বাড়ল মুসা। আবার ক্রুদ্ধ গর্জন ছেড়ে নাক কুঁচকে দাঁত দেখিয়ে দিল ওরা।

'চলে এসো, মুসা!' বলল কিশোর। 'বিরক্ত হচ্ছে, ভুলে গেছে ওরা আমাদের। হাত দিয়ো না জালের ফাঁকে।'

সরে এল মুসা। বোঝাই যাচ্ছে, বন্ধুত্ব করবার মুডে নেই ওরা। সারাটা দিন শিকার খুঁজতে দৌড়ে বেড়িয়েছে পাহাড়ে-জঙ্গলে-উপত্যকায়, বিফল হয়ে ফিরে এসেছে পেটে খিদে নিয়ে। রবিনের কথা আলাদা, ও থাকলে হয়তো সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যবহার পাওয়া যেত এদের কাছ থেকে।

নিজেদের তেরপলের নীচে ফিরে এল ওরা। খেতে দেওয়া হলো না ওদের। শক্ত পাথরের উপরেই ঘুমাতে হবে যখন ভাবছে, সেই সময় তিনজন জাপানি কয়েকটা কম্বল ও বালিশ ফেলল ওদের পায়ের কাছে। তারপর একটা পানি ভরা জগ আর একটা মগ নামিয়ে দিয়ে চলে গেল প্যারাট্রুপারদের জটলার দিকে। যাওয়ার আগে বলে গেল, 'নো ফুডি! ইউ মাচ ইটি!'

বোঝা গেল রাজকীয় খাবার খেয়ে ফেলায় এবং বাকিটুকু নষ্ট হওয়ায় চটেছে অটার ও উলরিখ। কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল ওরা সমতল, মসৃণ পাথরের উপর। ভাবল, রবিন কেমন আছে কে জানে!

পরদিন সকালে প্যারাপেটের উপর বসে সূর্যোদয় দেখছে ওরা। একের পর এক আলোকিত হয়ে উঠছে উঁচু পাহাড়ের চূড়া। অপূর্ব সুন্দর ভোর। খিদেয় পেট জ্বলছে সবার। ডিম্পল রয়েছে ওদের সঙ্গে, কিন্তু কিকোর দেখা নেই এখন পর্যন্ত। একটু চিন্তিত দেখাচ্ছে মুসাকে।

লাফিয়ে প্যারাপেটের উপর উঠল ডিম্পল। এখান থেকে খাড়া নেমে গেছে পাহাড়ের গা কয়েকশো ফুট নীচে। ওদের পায়ের কাছ থেকে পাহাড়ের গা বেয়ে সরু একটা এবড়োখেবড়ো পাথরের তাক ঢালু হয়ে

নেমে গেছে বেশ কিছুদূর, তারপর বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হয়েছে। কিশোরের মাথায় একবার চিন্তাটা এল, পাহাড়ের গায়ে ধরবার মত কোনও খাঁজ-ভাঁজ আছে কি না লক্ষ করছে। হেসে উঠল মুসা।

'ভাবছ, এই পথে পালানো যাবে কি না? আমি আগেই ঘুরে দেখে এসেছি–তিরিশ ফুট নেমেই শেষ হয়ে গেছে তাকটা। ওখান থেকে নীচে নামতে হলে ওই বুড়োর তৈরি পাখা লাগবে।'

প্যারাপেটের উপর দাঁড়িয়ে কান খাড়া করে কী যেন শোনার চেষ্টা করছে ডিম্পল। হঠাৎ চিঁহিঁ সুরে ডেকে উঠল ও, ঘোঁৎ করে শব্দ করল নাক দিয়ে। এর জবাবে দূর থেকে রবিনের গলা শুনতে পেল ওরা আবছা ভাবে। তার মানে, রবিনকে যেখানে আটকে রাখা হয়েছে, সেই ঘরটা কাছেই কোথাও।

কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই প্যারাপেট থেকে লাফ দিল ডিম্পল। চার পায়ে ভর দিয়ে নামল সরু কার্নিসে। ওদের তিনজনের বিস্ফারিত চোখের সামনে এখন অবলীলায় হেঁটে যাচ্ছে সে নীচের দিকে।

'হায়, হায়!' চেঁচিয়ে উঠল ফারিহা, ভয়ে বুজে ফেলেছে চোখ। 'মারা পড়বে তো!'

ততক্ষণে বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেছে ডিম্পল।

'ব্যাপারটা কী হলো, কিশোর?' জিজ্ঞেস করল মুসা। 'ঘোরার মত জায়গা নেই ওই সরু তাকে–ও কী ফিরতে পারবে?'

'দেখা যাচ্ছে না যখন, আমার মনে হয় রবিনের গুহাটা খুঁজে পেয়েছে ও। এখন ফিরে আসার চেষ্টা না করলেই আর ভয়ের কিছু নেই।'

কিন্তু ফিরে এল ও বিশ মিনিটের মধ্যেই। এক লাফে প্যারাপেট ডিঙিয়ে এদিকে এসে ঘোঁৎ করে আনন্দ প্রকাশ করল। ওর গলায় সুতো দিয়ে বাঁধা একটা কাগজ। ওটা খুলে দেখা গেল রবিনের লেখা চিঠি। পড়ে শোনাল কিশোর।

আছো কেমন তোমরা? আমি ভালই থাকতাম, যদি পেটে কিছু পড়ত। আমাকে শুধু পানি দিয়ে পেট ভরাতে হচ্ছে। মনে হয় বদমাশগুলো আমাকে না খাইয়ে শায়েস্তা করতে চায়। যাক, কী আর করা! যদি ডিম্পলের সাহায্যে তোমাদের খবরাখবর জানাতে পারি, তা হলে কষ্টটা কম হবে আমার।
ভাল থেকো।
রবিন।

খানিকক্ষণ পরেই ওদের জন্য নাস্তা নিয়ে এল এক জাপানি। সবই টিনের খাবার, তবে পরিমাণে যথেষ্ট। বড়সড়, গরম একটা পাউরুটিও এনেছে লোকটা ওদের জন্য। বোঝা গেল টিনের খাবারের পাশাপাশি কিছু কিছু তৈরি-করা খাবারও পরিবেশন করা হয় এখানে।

লোকটা চলে যেতেই সবার আগে রবিনের জন্য গোটা চারেক পুরু স্যান্ড-উইচ বানিয়ে ফেলল ফারিহা। মুসা সেগুলো পাউরুটির কাগজে শক্ত করে মুড়ে ফেলল। আর কিশোর একটা চিরকুট গুঁজে দিল ওর ভিতর। তারপর প্যাকেটটা বাঁধা হলো ডিম্পলের পিঠে। খাবারের গন্ধ পেয়ে ওতে মুখ দেওয়ার চেষ্টা করল ডিম্পল; কিন্তু পারল না।

'এবার যাও তো বাছা, রবিনের ওখান থেকে ঘুরে এসো দেখি,' বলল মুসা ডিম্পলকে। কিন্তু এখানে খাবারের আয়োজন দেখে নড়তে রাজি হলো না ডিম্পল। ওর মনের কথা টের পেয়ে ওকে কিছুটা খাইয়ে দিল ফারিহা। এবার প্যারাপেটের উপর মুসা দুটো চাপড় মারতেই রবিনের কথা মনে পড়ে গেল বাচ্চা-ঘোড়ার। একলাফে ওখানে উঠে অনায়াস ভঙ্গিতে নেমে গেল সরু কার্নিসে।

রবিনের খাওয়ার একটা ব্যবস্থা হয়ে যাওয়ায় মন ভাল হয়ে গেল কিশোর, মুসা ও ফারিহার। সারাটা দিন বিনকিউলার হাতে পালা করে চোখ রাখল ওরা উপত্যকার দিকে—আশা করছে, যে-কোনও সময় এসে পড়বেন আঙ্কেল ডিক। কুকুরগুলোকে মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে, দল বেঁধে দৌড়ে বেড়াচ্ছে নীচে, দেখা দিয়েই হারিয়ে যাচ্ছে ঝোপ-জঙ্গলের আড়ালে।

যতবার ওদের খাবার দেওয়া হলো, ততবারই ডিম্পলের মাধ্যমে রবিনের জন্য পাঠানো হলো কিছুটা। সেই সঙ্গে চালাচালি হচ্ছে চিরকুট। এখন পর্যন্ত কিকোর কোনও খোঁজ পাওয়া গেল না বলে ওরা সবাই উদ্বিগ্ন। খুব ধীরে কাটছে সময়। দুপুরের দিকে পাহাড়ের ভিতর নিয়ে যাওয়া হয়েছে প্যারাট্রুপারদের, সন্ধের পরও তাদের ফিরিয়ে আনা হলো না কেন বোঝা যাচ্ছে না। ফিরে এসেছে কুকুরগুলো, খাবার নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে; ক্রুদ্ধ, হিংস্র, ভয়াল গর্জন ছাড়ছে। কামড় খেয়ে চেঁচিয়ে উঠছে কোন-কোনও বেয়াদব কুকুর। পশুদের নিয়মঃ যে বেশি শক্তিশালী, সে আগে খাবে।

মেঘে ছেয়ে আছে আকাশ। বেশ গরম। ছাউনির নীচ থেকে টেনে বাইরে খোলা জায়গায় নিয়ে এল ওরা বালিশ-কম্বল। ফারিহা ঘুমিয়ে

পড়ল, জেগে রইল কিশোর ও মুসা। রবিনের জন্য চিন্তা হচ্ছে ওদের। গতকাল থেকে এখন পর্যন্ত ওকে কিচ্ছু খেতে দেয়নি ওরা। পাহাড়ের বাইরে দিয়ে ভাগ্যিস একটা পথ বের করে নিয়েছে ডিম্পল, তাই রক্ষা। কিকোর কথাও ভাবছে ওরা। ও কি জাপানি লোকটাকে আক্রমণ করতে গিয়ে আহত হয়েছিল? ভয় পেয়েছে বলে ওদের সঙ্গে আসেনি? খাবার নেই, পানি নেই—টিকে আছে কী করে? না কি ধরা পড়ে গেছে?

'শুনতে পাচ্ছ?' কিশোরের পাঁজরে কনুই দিয়ে খোঁচা দিল মুসা। ধড়মড় করে উঠে বসল। 'হেলিকপ্টার!'

উঠে বসল কিশোরও। শুনতে পেয়েছে আওয়াজটা। এই দিকেই আসছে। ফারিহাকে জাগাল কিশোর। তিনজন ফিরে গেল ওদের ছাউনির তলায়—হেলিকপ্টার কোথায় নামে তার ঠিক কী।

একেবারে কাছে চলে এল হেলিকপ্টার, আওয়াজে কান ঝালাপালা হওয়ার জোগাড়। প্যারাপেটের উপর শুয়ে কিশোর ও মুসা যখন ভাবছে এরা কি ফড়িংটাকে বাতি দেখিয়ে নামতে সাহায্য করবে না?—ঠিক তখনই ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হলো দু'জন জাপানি। দৌড়ে চলে গেল ওরা চাতালের মাঝখানে, কী করল বোঝা গেল না, দপ্ করে জ্বলে উঠল আকাশের দিকে মুখ করা চারটে বাতি। ধীরে ধীরে নেমে এল বিশাল আকারের একটা মাল-পত্র-ঠাসা হেলিকপ্টার। আরও জাপানি উঠে এসেছে সিঁড়ি বেয়ে। কপ্টারের মাথার রোটর ব্লেড থামতেই এগিয়ে গেল কয়েকজন। কারগোর দরজা খুলে গেল, নামতে শুরু করল ক্রেটের পর ক্রেট।

হেলিকপ্টারের পাইলটের গালে কাটা দাগ, বয়স তিরিশের নীচে, লম্বাটে মুখ। তার সহকারী মোটাসোটা লোক, খুঁড়িয়ে হাঁটছে। জাপানিদের দুই-এক কথায় কিছু যেন নির্দেশ দিয়ে পাহাড়ের ভিতর চলে গেল তারা।

'মনে হচ্ছে, অটার আর উলরিখের কাছে রিপোর্ট করতে গেল,' বলল কিশোর। 'চলো, সামনে গিয়ে দেখি।'

'ইশ্! যদি হেলিকপ্টার চালানো জানতাম!' বলল মুসা। 'খুব সহজেই ওটা নিয়ে পালিয়ে যেতে পারতাম এখান থেকে।'

'হ্যাঁ,' বলল ফারিহা। 'রবিনের ঘরের ফাঁকটার কাছে দাঁড় করিয়ে ওকেও নিয়ে নিতাম!'

হেলিকপ্টারের কাছে দাঁড়িয়ে আগ্রহের সঙ্গে দেখছে, এমনি সময়ে পিছনে কর্কশ কণ্ঠ শুনে চমকে উঠল তিনজন।

'এখানে কী?' খেঁকিয়ে উঠল অটার। হাত বাড়িয়ে মুসার কলার ধরে একটানে ফেলে দিল ওকে পাথুরে মেঝেতে। বাকি দুজন ছুটে গেল মুসা ব্যথা পেয়েছে কি না দেখতে। 'তোমাদের একেক জনকে ধরে আচ্ছামত বেত লাগানো দরকার!'

চোখ তুলে দেখল কিশোর, অটার-উলরিখ-পাইলট ও তার সহকারী ছাড়াও হেলিকপ্টারের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে নির্বাচিত প্যারাট্রুপারদের একজন। মুহূর্তে বুঝে ফেলল ও ব্যাপারটা। তিনজনের মধ্য থেকে ওকেই বাছাই করা হয়েছে হাতে ডানা বেঁধে লাফ দেওয়ার জন্য। এখন দেখানো হচ্ছে কোন্ হেলিকপ্টারে চড়ে কত উপরে উঠে ওকে লাফ দিতে হবে।

হেলিকপ্টারটা ভাল করে খুঁটিয়ে দেখল প্যারাট্রুপার, পাইলট ও সহকারীকে কিছু জিজ্ঞেস করল। খুব সংক্ষেপে উত্তর দিল পাইলট। কিশোরের মনে হলো, মাল-পত্র পৌঁছে দিচ্ছে, এই পর্যন্ত ঠিক আছে; কিন্তু ডানা বেঁধে হেলিকপ্টার থেকে লাফ দেওয়ার ব্যাপারটা পাইলটের তেমন একটা পছন্দ নয়।

'কাল রাতে ফিরছ তোমরা,' অটারের তীক্ষ্ণ কণ্ঠ পরিষ্কার শুনতে পেল ওরা প্যারাপেটে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে। 'এসো, খাওয়া-দাওয়া সেরে নাও এখন।'

দু'জন জাপানিকে পাহারায় রেখে নেমে গেল ওরা পাহাড়ের ভিতর।

চোদ্দো

শুয়ে পড়ল ওরা। এমনি সময়ে রবিনের কাছ থেকে ফিরে এল ডিম্পল। হেলিকপ্টার দেখে কৌতূহল দমন করতে না পেরে এক ছুটে চলে গেল ওটার কাছে। দড়াম করে এক লাথি খেয়ে ছিটকে দশ হাত দূরে গিয়ে পড়ল।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল মুসা, কিন্তু ওর হাত ধরে টেনে বসাল কিশোর। বলল, 'আমাদেরও সময় আসবে, মুসা। ব্যস্ত হয়ো না।'

বাচ্চাটা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে এল ওদের কাছে, যেন নালিশ জানাচ্ছে। একে একে আদর নিল সবার কাছ থেকে। মুসা ওর ব্যথার জায়গাটা অনেকক্ষণ ধরে ম্যাসেজ করে দিল। একটু পরেই দেখা গেল ব্যাটা তড়াক করে লাফিয়ে প্যারাপেটে উঠছে, আবার আরেক লাফে

নামছে! বাচ্চা-মানুষ তো, বেমালুম ভুলে গেছে ব্যথার কথা।

পরদিন কুকুরগুলোকে ছাড়া হলো না। তার বদলে সমতল প্রাঙ্গণে দৌড় করানো হলো ওদের ঘণ্টা কয়েক। কেউ থামলেই চাবুক মারে অটার ও জাপানি কেয়ারটেকার। কুকুরগুলোকে পাহারায় পাঠানো হলো না দেখে খুশিই হলো কিশোর-মুসা-ফারিহা। কারণ, ওদের ধারণা, আজই কোনও এক সময় ঝরনার ধারে এসে পৌঁছবেন ডিক কার্টার। সুইটির জিনের নীচে কিশোরের নোট পেয়ে ওদের উদ্ধারের ব্যবস্থা করবেন।

কিন্তু কী করে? লতা-ঝোপ সরিয়ে পাহাড়ের ভিতরে যদি বা ঢুকতে পারেন, দড়ির মই নামাবার উপায় তিনি জানবেন কী করে? কালো পানির নীচে ওই হুইলটা খুঁজে না পেলে উপরে উঠতে পারবেন না আঙ্কেল।

তা ছাড়া উঠেই যদি এদের হাতে ধরা পড়েন, তা হলে বন্দির সংখ্যা বাড়বে আরেকজন, এ-ছাড়া আর কোনও লাভ হবে না।

সারাটা দিন একজন প্যারাট্রুপারকেও দেখা গেল না পাহাড়ের ছাতে। আজ রাতে যাকে ডানার কার্যকারিতা পরীক্ষা করে দেখতে হবে, সে-ও এল না। এক জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে রোদে পুড়ল হেলিকপ্টারটা।

সন্ধ্যায় খাবার দিয়ে গেল একজন জাপানি, একটি কথাও বলল না ওদের সঙ্গে। গার্ডকে আড়াল করে রবিনের জন্য একটা প্যাকেট তৈরি করে পাঠিয়ে দিল ওরা। আজকাল আর প্যারাপেটে চাপড় দিতে হয় না, পিঠে খাবারের প্যাকেট বাঁধা হলেই রওয়ানা হয়ে যায় ডিম্পল রবিনের খুপরির উদ্দেশে। খাবারে মুখ দেয়ারও চেষ্টা করে না—সম্ভবত ভাগ পায় ওখানে খাবার পৌঁছে দিলে।

এদিকে হাসি মুছে গেছে মুসার মুখ থেকে। এখন পর্যন্ত কিকোর কোনও খবর নেই। আজ দুপুরের দিকে সবার অলক্ষে পাহাড়ের ভিতর নামার চেষ্টা করতে গিয়ে ধরা পড়ে গিয়েছিল; কিল-গুঁতো মেরে টেনে-হিঁচড়ে ফিরিয়ে এনেছে ওকে দুই জাপানি। সেই থেকে আকাশের দিকে উদাস দৃষ্টি মেলে দিয়ে শুয়ে রয়েছে ও চিত হয়ে। বিকেলে রবিনের চিঠিতে অবশ্য জানা গেছে, কাহিল হলেও বেঁচে আছে কিকো। খুব ভোরে নাকি ওর বন্ধ দরজার কাছে এসে অনেকবার 'মুসা-মুসা' বলে ডেকেছে। তারপর ওর মায়ের অনুকরণে কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙাবার চেষ্টা করেছে, 'ওঠ্, মুসা, কত ঘুমাস? স্কুলে যাবি না?' তারপর নিজের খিদের কথা জানিয়েছে, 'খাও, লক্ষ্মী ছেলে; খাও তো, সোনা!' দরজা বন্ধ বলে কিছুই করতে পারেনি রবিন। ফিরে গেছে কিকো সিঁড়িতে লোকজনের সাড়া পেয়ে।

এইটুকু শুনেই ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছে মুসা। অনেক বুঝিয়ে ওকে শান্ত করেছে কিশোর ও ফারিহা।

রাতে প্রাঙ্গণে আজ আবার জ্বলে উঠল বাতি। পাহাড়ের মাথায় উঠে এল অটার, উলরিখ, সেই প্যারাট্রুপার, গালে কাটা দাগওয়ালা পাইলট ও তার সহকারী। তাদের সঙ্গে এল জনা পাঁচেক জাপানি।

সবার শেষে রাজসিক ভঙ্গিতে উঠে এলেন সাজ-পোশাক আর উঁচু মুকুট পরা পাহাড়ের রাজা, দেখলে বোঝাই যায় না এ-লোক সেই থুত্থুড়ে বুড়ো বৈজ্ঞানিক। চত্বরের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। তাঁর পিছন পিছন একটা বাক্স বয়ে নিয়ে এল চারজন জাপানি। রাজার পায়ের কাছে নামিয়ে রাখল ওরা বাক্সটা।

নিচু হয়ে ঝুঁকে বাক্সের ডালা তুললেন রাজা। ভিতর থেকে বের করলেন একজোড়া সোনালি ডানা। উড়ন্ত চিলের ডানার মত দু'পাশে ছড়ানো, তবে আকারে তার চেয়ে অনেকটা বড়।

কীভাবে ওটা ব্যবহার করতে হবে বুঝিয়ে দিচ্ছেন রাজা।

'এই ডানাদুটো তোমাকে ভাসিয়ে রাখবে শূন্যে, বুঝলে। হেলিকপ্টার থেকে লাফ দেওয়ার পরপরই এই যে, এই সাদা বোতামটায় একটা টিপ দেবে, বুঝলে। এটায় টিপ দেয়ার সাথে সাথেই টের পাবে, বন্ধ হয়ে গেছে নীচে নামা, মাধ্যাকর্ষণের টান আর নেই–বাতাসের মত হালকা বোধ করছ। ডানা মেলে রাখলে ভেসে থাকবে, ডানা ঝাপটালে এগোতে পারবে সামনে, এক ডানা ব্যবহার করলে মোড় নিতে পারবে ডাইনে-বামে, বুঝলে।' হাসলেন তিনি তৃপ্তির হাসি। 'এবার এসো, আমি নিজ হাতে পরিয়ে দিচ্ছি তোমার পাখা।'

ভুরু কুঁচকে দেখছে লোকটা ডানাগুলো–এগোল না। 'ইয়ে, মানে, ব্যস, এই দুটোই পতন ঠেকাবে আমার?'

'আর কিছু লাগবেই না,' মধুর হেসে বললেন রাজা। 'এই ডানাদুটোর মধ্যে শক্তিশালী রশ্মি আটকানো আছে, বুঝলে। বোতাম টেপার সঙ্গে সঙ্গে ওগুলো ছুটে যাবে নীচের দিকে, পৃথিবীর আকর্ষণ আর তোমাকে টানতে পারবে না। লাইফ-জ্যাকেট যেমন পানিতে ভাসিয়ে রাখে, চেষ্টা করলেও ডোবা যায় না–ঠিক তেমনি বোতাম টেপা থাকলে চেষ্টা করলেও তুমি মাটিতে পড়তে পারবে না। তোমার যখন নামতে ইচ্ছে করবে, তখন আর একবার ওই বোতামে একটা টিপ দিলেই ধীরে ধীরে গ্লাইড করে নেমে আসতে পারবে নীচে, বুঝলে।'

'বুঝলাম, কিন্তু আমার ধারণা ছিল নতুন ধরনের কোনও প্যারাশুটের

কার্যকারিতা পরীক্ষা করে দেখার জন্যে আনা হয়েছে আমাকে এখানে,' বলল প্যারাট্রুপার। 'এই রকম আজেবাজে একটা খেলনা-পাখা হাতে বেঁধে আকাশ থেকে লাফিয়ে পড়তে হবে, এমন কথা আমাকে বলা হয়নি।'

'এটা আজেবাজে কোনও খেলনা-পাখা নয়!' তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রতিবাদ করল অটার। 'পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীর সেরা আবিষ্কার এটা! দু'-এক মাইল ওড়ার পর তুমি যখন মাটিতে নেমে আসবে, দেখবে উলরিখ আর আমি হাজির হয়ে গেছি। কুকুর থাকবে সঙ্গে, কাজেই তোমাকে খুঁজে পেতে কোনও অসুবিধা হবে না। তারপর ভেবে দেখো, অঢেল টাকা-পয়সা, আর প্রথম কয়েকজন উড়ন্ত মানুষের একজন হিসাবে দুনিয়া-জোড়া খ্যাতি, সম্মান...'

'ওসব কিচ্ছু আমার দরকার নেই, মিস্টার!' ভয় পেয়েছে প্যারাট্রুপার। 'চেয়ে দেখুন, বড়সড়, ওজনদার মানুষ আমি; যতই রশ্মি বা যা-খুশি ভরা থাক, ওই ঠুনকো পাখা আমাকে ভাসিয়ে রাখতে পারবে না। ওটা নিয়ে লাফিয়ে পড়ব!—পাগল পেয়েছেন নাকি আমাকে?'

'ধরো ব্যাটাকে!' চেঁচিয়ে উঠল অটার ক্রুদ্ধ কণ্ঠে। উলরিখ আর দুইজন জাপানি চেপে ধরল প্যারাট্রুপারকে। ধস্তাধস্তি করল লোকটা, কিন্তু শিম্পাঞ্জী উলরিখের গায়ে অসুরের শক্তি, ওর হাত থেকে ছুটতে পারল না কিছুতেই। ডানাদুটোর সঙ্গে আঁটা মাঝখানের চওড়া অর্ধ-বৃত্তাকার চামড়ার বেল্ট প্রথমে পরানো হলো ওর পিঠে, বগলের নীচ দিয়ে কয়েকটা স্ট্র্যাপ এনে বাকল্‌স্ দিয়ে আটকানো হলো ওর বুকের সঙ্গে; তারপর দুই হাতে ডানা-দুটো পরিয়ে কনুই আর কব্জির সঙ্গে বেল্ট দিয়ে বেঁধে দিলেন রাজা নিজ হাতে।

'ওকে হেলিকপ্টারে তুলে নিয়ে রওনা হয়ে যাও,' বলল অটার। 'উলরিখ, তুমিও ওঠো। সময় হলেই ব্যাটাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলবে নীচে। গর্দভ না হলে ঠিকই টিপ দেবে বোতামে, তখন নিজেই টের পাবে উড়তে পারার কী মজা!'

টেনে-হিঁচড়ে লোকটাকে তোলা হচ্ছে, এমনি সময়ে কথা বলে উঠল পাইলট:

'আমার মনে হয়, বস্, এই লোকটা অতিরিক্ত ভারী। গতবারের লোকটাও ভারী ছিল। আপনাদের আর একটু ভাল করে ভেবে দেখা উচিত। পাখাগুলো এর দ্বিগুণ লম্বা হলে একটা কথা ছিল। গবেষণার কাজে সাহায্য করতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু জোর করে ধরে

একজনকে হেলিকপ্টার থেকে ফেলে দেয়াটা ঠিক গবেষণার আওতায় পড়ে না।'

'তুমি কি তা হলে এই লোকটাকে নিতে অস্বীকার করছ?' রাগে সাদা হয়ে গেছে অটারের মুখ।

'ঠিক ধরেছেন, বস্,' বলল পাইলট। বোঝা গেল সে-ও রেগে উঠছে। 'ছোট-খাট কাউকে দিয়ে চেষ্টা করান। গতবার মনে হলো আপনাদের গবেষণা সফল হয়ে গেল বুঝি, কিন্তু প্রথম এক মিনিট কি দুই মিনিট। তারপর? তারপর চোখের সামনে...'

'তার মানে, তুমি একে নিচ্ছ না?' পাইলটের কথাটা আর শেষ করতে দিল না অটার।

'ঠিক ধরেছেন, বস্। ওর ইচ্ছের বিরুদ্ধে ওকে আমি নেব না। কিছুতেই না।'

তেড়ে গেল অটার পাইলটের দিকে, যেন মারবে। উলরিখ টেনে ধরে রাখল তাকে। হাসল পাইলট, 'আমার সঙ্গে গোলমাল করে সুবিধে করতে পারবেন না, বস্। আমি অনেক বেশি জানি। আমার ফিরতে দেরি হলে আরও অনেকেই অনেক কিছু জানবে। বুঝতে পেরেছেন?'

হেলিকপ্টারে উঠে পড়ল পাইলট সহকারীকে নিয়ে। গর্জে উঠল ইঞ্জিন। অটারকে দেখে মনে হচ্ছে রাগের ঠেলায় ভিরমি খাবে। জানালা দিয়ে বাইরে ঝুঁকে হাত নাড়ল পাইলট। বলল, 'চলি, বস্! আগামীবার অন্য কেউ আসবে, আমি ছুটিতে যাচ্ছি। আমার চেয়ে কম স্পর্শকাতর কাউকে পাঠাবার চেষ্টা করব। তার পরেও বলছি: ছোট-খাট কাউকে বেছে নিন।'

খাড়া উঠে গেল হেলিকপ্টার, কিছুদূর উঠেই পশ্চিম দিকে রওয়ানা হলো, কয়েক মিনিটের মধ্যে মিলিয়ে গেল আওয়াজ।

আগাগোড়া পুরো নাটকটা দেখল কিশোর-মুসা-ফারিহা। শুনল সব কথা। অনিচ্ছুক লোকটাকে যে আকাশ থেকে লাফ দিতে হলো না, সেজন্য কৃতজ্ঞ বোধ করল ওরা পাইলটের প্রতি।

এরপর বেশ কিছুক্ষণ বিতর্ক চলল পাহাড়ের মাথায়। ডানা দুটো খুলে নেওয়া হলো প্যারাট্রুপারের গা থেকে। লোকটাকে পাহারা দিয়ে রাখল দু'জন জাপানি। কথা হলো অটার, উলরিখ আর পাহাড়ের রাজার মধ্যে। পাখাগুলো বাক্সে ভরা হলে রাজা বললেন, 'ঠিক আছে, আমি রাজি। হয়তো ঠিকই বলেছে পাইলট লোকটা। কিন্তু হালকা প্যারাট্রুপার পাবে কোথায়? ওরা ছাড়া অত ওপর থেকে আর কে রাজি হবে লাফ দিতে?

দেখো খুঁজে পাও কি না। আমার কোনও অসুবিধে নেই, বুঝলে।'

'এই ছোকরাগুলোর একটাকে পাঠাব ভাবছি,' বলল অটার। কথাটা শুনে চমকে উঠল কিশোর-মুসা-ফারিহা। 'ওই বেয়াদব ছোকরাটা, যেটাকে না খাইয়ে রেখে ভদ্রতা শেখানো হচ্ছে, ওকেই ডানা পরে লাফ দিতে বাধ্য করব আমরা।'

হাসি ফুটল উলরিখের মুখে। বলল, 'হ্যাঁ, ঠিক বলেছ! ওর পরেও আরও তিনটে থাকল হাতে!'

পনেরো

রাতে ভাল ঘুম হলো না কারও। পরদিন সকালে ফারিহা যখন ডিম্পলকে দিয়ে পাঠাবে বলে স্যান্ডউইচ তৈরি করছে, এমনি সময়ে পাহাড়ের মাথায় উঠে এল রবিন।

প্রাথমিক উল্লাসের পর সবার চেহারা মলিন হয়ে যেতে দেখে ব্যাপার কী জানতে চাইল রবিন। একটু ইতস্তত করে সব খুলে বলল কিশোর।

'বুঝলাম,' সব শুনে বলল রবিন, 'এইজন্যেই আজ ভাল নাস্তা দিয়েছে আমাকে। জবাইয়ের আগে তাজা করে নিচ্ছে খাসিটাকে। মনটা যাতে ভাল থাকে সেজন্যে আসতে দিয়েছে পাহাড়ের ছাদে। যাই হোক, আমার মনে হয় না ওদের ইচ্ছে পূরণ হবে। তার আগেই পৌঁছে যাবে আঙ্কেল। তোমার কী মনে হয়, কিশোর?'

'আমারও তা-ই মনে হয়,' বলল কিশোর। 'তবে আঙ্কেল এত দেরি করছে কেন বুঝতে পারছি না। কোনও কারণে আঙ্কেল আসতে পারছে না ধরে নিয়ে আমাদেরই এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে।'

'সেটা কীভাবে?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'এখনও জানি না। ভাবছি।' বুড়ো আঙুল দিয়ে দেখাল ও পাহাড়ের ভিতর নামার মুখে পাহারারত দুই জাপানিকে। 'এই দুজনের চোখ ফাঁকি দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।'

তিন দিন কেটে গেল, আঙ্কেলের পথ চেয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাল ওরা বিনকিউলার চোখে তুলে, কিন্তু কোথাও কোনও সার্চ পার্টির হদিশ পাওয়া গেল না। হতাশায় ছেয়ে গেল ওদের মন। এদিকে ছয় ঘণ্টা পর পর বদল হচ্ছে প্রহরী, সতর্কতায় সামান্য ঢিল নেই ওদের। ফাঁকি

দেওয়ার সুযোগ রাখেনি ওরা।

সেই রাতেই ঘুম ভেঙে গেল হেলিকপ্টারের শব্দে, লাফিয়ে উঠে বসল ওরা চারজন। দেখল, চারটে ল্যান্ডিং-লাইট জ্বালা হয়েছে, দিনের মত আলোকিত পাহাড়ের মাথা। ধীরে নেমে এল যান্ত্রিক ফড়িং।

মাথার উপর রোটর ব্লেড থেমে যেতেই ককপিটের সিট ছাড়ল দুজন লোক। আগের একজন লোকও নেই, এরা সম্পূর্ণ নতুন। মস্তবড় গগলস আর কপাল-ঢাকা পিক্‌ড্ ক্যাপ পরে রয়েছে পাইলট, স্বাস্থ্যবান সহকারীর গম্ভীর চেহারায় নিষ্ঠুর ভাব–দেখলে মনে হয় অবলীলায় মানুষ খুন করতে পারে লোকটা।

অটার ও উলরিখ উঠে এল কয়েকজন জাপানিকে নিয়ে।

'এখানে চার্জে কে আছেন? আপনি?' জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল পাইলট অটারের দিকে চেয়ে। সে মাথা ঝাঁকাতে বলল, 'মিচেল ছুটিতে, ওর বদলে এসেছি আমি, ফাকিমুর আমিতাপা।'

'কী বললেন?' নাম শুনে অবাক হয়েছে অটার।

'হ্যাঁ, নামটা একটু অদ্ভুতই,' আবার বলল পাইলট নামটা, 'ফাকিমুর আমিতাপা। আমি বসনিয়ার তিগো অঞ্চলের মুসলমান। উফ্, ঠিক জায়গা খুঁজে পেতে যা কষ্ট হয়েছে! কপাল জোরে পেয়ে গেছি। যাক, এর নাম মার্ক স্টিফেন, আমার বন্ধু ও সহযোগী। এবার অর্ডার অনুযায়ী সব মাল এসেছে কি না বুঝে নিন।'

জাপানিরা বড়বড় বাক্স আর স্টিলের পাত দিয়ে বাঁধা ক্রেট নামাল কপ্টার থেকে। পাইলটও নেমে এল সহকারীকে নিয়ে।

'আপনাদের খাবার দেয়া হয়েছে নীচে টেবিলে,' বলল অটার। 'আজ রাতটা এখানে থেকে কাল ফিরে যাচ্ছেন তো?'

'না।' মাথা নাড়ল পাইলট। 'আজ রাতেই ফিরতে হবে। আমাদের ওখানে কী এক ব্যাপারে ইনকোয়ারি হচ্ছে, এখনই ফিরে যেতে হবে আমাদেরকে।'

'আপনাকে কি বলেছে মানে, আপনি জানেন ...' ইতস্তত করছে অটার উলফ।

'কী ব্যাপারে বলুন তো? ওহ্-হো, সেই যে এক প্যারাট্রুপার হেলিকপ্টার থেকে ঝাঁপ দিতে চায়?' সহজ গলায় বলল পাইলট। 'হ্যাঁ, জানি। মিচেল বলেছে আমাকে। আমার কোনও আপত্তি নেই। কেউ যদি স্বেচ্ছায় লাফ দিতে চায়, আমি তাতে বাগড়া দিতে যাব না।'

'এজন্যে অবশ্যই অনেক টাকা দেয়া হবে আপনাদের,' বলল ঈগল-

চক্ষু গম্ভীর গলায়। 'গতবার যা দেয়া হয়েছিল, তার দ্বিগুণ। এবার ঝাঁপ দেবে একটা অল্পবয়সী ছেলে। বুঝতে পেরেছেন? আমাদের গবেষণার জন্যে...'

হাত তুলে বাধা দিল পাইলট। 'অল্পবয়সী ছেলে মানে?'

'এই ধরুন, পনেরো-ষোলো বছর বয়সের এক কিশোর,' বলল অট্যার। 'এখানেই আছে সে। আমি আবিষ্কারক ভদ্রলোককে খবর দিচ্ছি।' একজন জাপানিকে দুর্বোধ্য ভাষায় কিছু বলল অটার। বন্দুকের গুলির মত ছুটে চলে গেল লোকটা পাহাড়ের ভিতর। 'এবার তা হলে চলুন, কিছু মুখে দেবেন।'

একগাল হাসল পাইলট, মাথা নাড়ল। 'দেরি করার উপায় নেই, বস্। জলদি ছেলেটাকে আনার ব্যবস্থা করুন।'

ধড়াস-ধড়াস করছে মুসার বুক, ফারিহার হাঁটু কাঁপছে। স্বাভাবিক রয়েছে কেবল কিশোর ও রবিন। রাগে জ্বলছে রবিনের গা। ঠিক আছে! লাফ দেবে ও, যা হয় হোক, কিছুতেই ভয় পাবে না। যদিও পাখাগুলো সত্যিই ভাসিয়ে রাখতে পারবে কি না, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে ওর। যতদূর সম্ভব, এদের গবেষণা এখন পর্যন্ত প্রাথমিক পর্যায়েই রয়েছে।

আলোর বৃত্তের বাইরে ছিল বলে এতক্ষণ ওদের দেখতে পায়নি পাইলট। একজন জাপানি রবিনকে নিয়ে হেলিকপ্টারের দিকে চলেছে, সঙ্গে চলে এল বাকি তিনজনও।

পাহাড়ের মাথায় উঠে এলেন রাজা। বেশি তাড়াহুড়ো করায় পরচুলা পরতে ভুলে গেছেন, মুকুটটাও বাঁকা হয়ে রয়েছে বলে চকচকে টাকের একটা অংশ দেখা যাচ্ছে। তবে জমকালো সাজ-পোশাক পরায় ত্রুটিটা তেমন ধরা যাচ্ছে না।

রাজার পিছন পিছন ডানাদুটো রাখার বাক্সটা নিয়ে এল দুইজন। যত্নের সঙ্গে নিজ হাতে পাখা দুটো বের করলেন রাজা। এগিয়ে যাওয়ার আগে প্রাণের বন্ধু কিশোরের দিকে চাইল রবিন। ওর হাতে চাপ দিয়ে নিচু গলায় বলল কিশোর, 'কোনও ভয় নেই, রবিন। দেখো, কিচ্ছু হবে না তোমার।'

কিশোরের অভয়বাণী শুনে চমকে তাকাল সবাই ওর মুখের দিকে। আর কিছু বলল না কিশোর, একটু হেসে মাথা ঝাঁকাল শুধু। মাথা উঁচু করে সোজা হেঁটে রাজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল রবিন। ডানাদুটো ওকে পরিয়ে দিয়ে কীভাবে কী করতে হবে সব বুঝিয়ে দিলেন রাজা। সাদা

বোতামের গুরুত্বের কথাটা বললেন বারবার। মাথা ঝাঁকিয়ে বার কয়েক ডানা ঝাপটাল রবিন, তারপর রবিন পাখির অনুকরণে ডাক দিল: চিচিচিচিচিচিচি চিক চি চি চিচিক।

রবিন বিন্দুমাত্র ভয় পায়নি মনে করে খুব খুশি হলো অটার ও উলরিখ। মনে হয় গত প্যারাট্রুপারের মত গোলমাল পাকাবে না ছেলেটা। যদি বেঁকে বসত, তা হলে কিছুতেই একে হেলিকপ্টারে তুলতে রাজি হত না উদ্ভট নামের এই পাইলটটা!

কিন্তু মনের গভীরে ভয়ে কুঁকড়ে গেছে রবিন।

হঠাৎ উপস্থিত সবাই তাজ্জব হয়ে গেল ফারিহার কাণ্ড দেখে। এগিয়ে গিয়ে রাজার বাহুতে একটা হাত রাখল ও।

'ইয়োর ম্যাজেস্টি! ডানা দুটো পরীক্ষার জন্যে আমাকে ব্যবহার করলে ভাল হয়। রবিনের চেয়ে অনেক হালকা আমি। আপনার গবেষণা সফল করবার সুযোগ পেলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করব।'

হাঁ করে চেয়ে রইল তিন গোয়েন্দা ফারিহার মুখের দিকে। বলে কী! পাইলট ও তার সহকারীও চেয়ে রয়েছে বিস্মিত দৃষ্টিতে। ওর চিবুকে সস্নেহে আঙুল ছোঁয়ালেন রাজা।

'কী নাম তোমার, খুকি?'

'আমার নাম ফারিহা তাবাস্‌সুম হোসেইন। সুযোগটা দেবেন আমাকে, ইয়োর ম্যাজেস্টি?'

'এই ছেলেটি সুযোগটা হারাতে রাজি হলে আমার কোনও আপত্তি নেই, বুঝলে,' বললেন রাজা।

সবাই চাইল রবিনের দিকে। ধীর পায়ে ফারিহার পাশে এসে দাঁড়াল রবিন। একটা ডানা বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরল ওর কাঁধ। বলল, 'ছোট্ট বোন আমার, আমি তোমার কাছে চির-কৃতজ্ঞ হয়ে থাকলাম। তবে এবারের মত আমিই যাচ্ছি। যদি সত্যিই এগুলো দিয়ে ওড়া যায়, তা হলে আমি এই পাহাড়ের ওপর দিয়ে একটা চক্কর মেরে একবার দেখা দিয়ে যাব। আর যদি আমার কিছু ঘটে, চিন্তা কোরো না, কদিন পরেই সুযোগ পাবে তুমি, উড়তে বাধ্য করবে ওরা তোমাকে। বিদায়!'

ফুঁপিয়ে উঠল ফারিহা। পাইলট ও তার সহযোগীর পিছু নিয়ে উঠে পড়ল রবিন হেলিকপ্টারে। ডিম্পলও যাচ্ছিল ওর সঙ্গে, কিন্তু ওকে মেরে তাড়িয়ে দিল অটার। কপ্টারে উঠে জানালা দিয়ে ডানা নাড়ল রবিন বন্ধুদের উদ্দেশে, তারপর অটারের দিকে ফিরে বিকট ভঙ্গিতে মুখ ভ্যাঙাল। রেগে-মেগে এগোতে যাচ্ছিল অটার, এমনি সময় স্টার্ট নিল

ইঞ্জিন, মাথার উপর আস্তে ঘুরতে শুরু করল রোটর ব্লেড, ক্রমে বাড়ছে বেগ। উঠে গেল ওটা শূন্যে, বাঁক নিয়ে হারিয়ে গেল পশ্চিম দিকে।

মস্ত একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল মুসার বুক চিরে। বুকটা ফেটে যেতে চাইছে ওর রবিনের জন্য। কিশোর ওর কাঁধে হাত রাখতেই হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠল ও। ফোঁপাচ্ছে ফারিহাও।

'অনেক ভরসা করেছিলাম আঙ্কেল আসবে,' কাঁদতে কাঁদতে বলল মুসা। 'কিন্তু এতদিন পেরিয়ে গেল, এলই না। কী হলো, কিশোর? কী হলো মানুষটার?'

ছাউনিতে ফিরে নিচু গলায় বলল কিশোর, 'এসেছিলেন তো আঙ্কেল। চিনতে পারনি তোমরা?'

'না তো! কখন এলেন, কীভাবে?' কান্না ভুলে ছানাবড়া হয়ে গেছে মুসা ও ফারিহার চোখ।

'পাইলটের ছদ্মবেশে।'

'তাই নাকি? ছদ্মবেশে ছিলেন? আমরা তো চিনতে পারলাম না, তুমি চিনলে কী করে?'

'চিনলাম তাঁর নাম শুনে। নিজের নাম কী বললেন খেয়াল করোনি?'

'নাহ্!' বলল ফারিহা। 'কী একটা যেন উদ্ভট নাম বলেছিল লোকটা।'

'উদ্ভট হতে যাবে কেন? ওই নামের মধ্যে দিয়েই তো নিজের পরিচয় জানিয়ে গেলেন আমাদেরকে।'

'কী যেন ছিল নামটা?' এবার মুসার প্রশ্ন।

'ফাকিমুর আমিতাপা। বসনিয়ার তিগো অঞ্চলের মুসলমান।'

'এতে কী বোঝা গেল?' এখনও বুঝতে পারছে না মুসা বা ফারিহা।

'নামটা আসলে আমাদের নামের আদ্যাক্ষর। ফা ও তা দিয়ে হয় ফারিহা তাবাস্‌সুম, কি আর পা দিয়ে আমি, র আর মি দিয়ে হয় রবিন মিলফোর্ড। এখন বলো মু আর আ দিয়ে কী হয়?'

চোখ জোড়া ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে মুসার। ফিসফিস করে বলল, 'মুসা আমান! সত্যিই তো! তিগো, মানে, তিন গোয়েন্দার কথাও বলে গেছেন আঙ্কেল। তার মানে?'

'ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে এখন আমাদের। রবিনকে উদ্ধার করেছেন, ঠিক সময়মত আমাদেরও উদ্ধার করবেন। নিজে এসে এখানকার অবস্থাটা বুঝে গেলেন। এবার নিশ্চয়ই একটা উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন।'

ষোলো

বিরাট একটা বোঝা নেমে গেছে ওদের মাথার উপর থেকে। আর চিন্তা নেই, এসে গেছেন আঙ্কেল। সবচেয়ে বড় কথা রবিনকে হেলিকপ্টার থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করতে হচ্ছে না।

ছাউনির নীচে যে-যার বিছানায় বসে পড়ল।

'ভাবছি, হেলিকপ্টারের কথা মাথায় কী করে এল আঙ্কেলের!' বলল মুসা। 'আমরা তো তন্ন-তন্ন করে খুঁজছি জঙ্গল-পাহাড়-উপত্যকা। অথচ উনি একেবারে পাহাড়ের মাথায় এসে হাজির!'

'কেন, কিশোর তো ওর চিঠিতে সবই খোলাসা করে লিখেছিল,' বলল ফারিহা। 'কুকুর, পলাতক নিগ্রো, রবিনের বন্দি হওয়া, পাহাড়ের কোন্ অংশে গিয়ে অদৃশ্য হয়েছিল ওরা, পাহাড়ের মাথায় হেলিকপ্টার নামা—সবই লিখে সুইটির জিনের নীচে গুঁজে রাখা হলো না?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, মনে পড়েছে। সেইজন্যেই কুকুরগুলো নাগাল পায়নি ওঁর। নোট পেয়েই আলটুরাস এয়ারফিল্ডে গিয়ে বাকিটুকু জেনে নিয়েছেন আগের পাইলট মিচেলের কাছ থেকে।'

'কী করবেন এখন আঙ্কেল ডিক?' জানতে চাইল ফারিহা। 'ফিরে আসবেন আমাদের উদ্ধার করতে?'

'নিশ্চয়ই আসবেন,' জোর দিয়ে বলল কিশোর। 'রবিনকে নিরাপদ কোথাও নামিয়ে দিয়ে ফিরে আসবেন আমাদের জন্যে। কে জানে, হয়তো আজ রাতেই।'

'তবে রবিন দেখিয়েছে সাহস কাকে বলে!' বলে উঠল মুসা। 'ও তো আর জানত না, উদ্ধার পেতে চলেছে—ওর জন্যে গর্ব হচ্ছে আমার!'

'আমারও,' বলল কিশোর। 'তবে আমাদের ফারিহাও কোনও অংশে কম দেখায়নি। ওর জন্যেও গর্ব হচ্ছে আমার।'

কিশোরের প্রশংসায় কালচে মানুষ বেগুনী হয়ে গেল ফারিহা, ঝকঝকে সাদা দাঁত বেরিয়ে পড়েছে সব কটা। মুসা গুঁতো দিল কিশোরের পাঁজরে।

'দেখো-দেখো, প্রশংসা পেয়ে ছেমরির হাসি দেখো!'

'প্রশংসার জন্যে না!' বলল ফারিহা। 'আমি যে কী ভয় পেয়েছিলাম

তা তো তোমরা জান না, তাই হাসছি। ঠকাঠক বাড়ি খাচ্ছিল আমার দুই হাঁটু!'

হাসছে মুসা, কিন্তু কিছুক্ষণ পরপরই কীসের যেন ছায়া পড়ছে ওর মুখে। বুঝতে পারল কিশোর, ঘুরেফিরে কিকোর কথা মনে আসছে ওর। সত্যিই তো, কোনও খবর নেই, গেল কোথায় কাকাতুয়াটা? এত বেশিদিন মুসাকে ছেড়ে থাকেনি ও আর কখনও। কোথায় খাওয়া পাচ্ছে কে জানে! না কি ধরা পড়ল?

'দেখি, ল্যান্ডিং লাইটের সুইচটা কোথায়,' বলে উঠে দাঁড়াল মুসা। 'আজই যদি আসেন, বাতিগুলো জ্বালার দরকার পড়বে।'

'হেলিকপ্টারের আওয়াজ পাবে না ওরা?' জিজ্ঞেস করল ফারিহা। 'আওয়াজ পেয়েই যদি হুড়মুড় করে উঠে আসে সবাই?'

'পাহাড়ের ভেতর থেকে কিছুই শোনা যাবে না,' বলল কিশোর। 'খেয়াল করে দেখো, আমরা ছাড়া আজ আর কেউ নেই ওপরে। আমাদেরকে পাহারা দেয়ারও প্রয়োজন বোধ করছে না ওরা এখন। কোনও সমস্যা হবে বলে মনে হয় না।'

'কোথায়?' বলল মুসা। 'সুইচটা তো পাই না। কিশোর, তোমার টর্চটা দেবে?'

কিশোরের টর্চ জ্বেলে ভাল করে খুঁজে দেখল মুসা, পাওয়া গেল না সুইচ। শেষে টর্চ নিভিয়ে ফেরত দিল ওটা কিশোরকে।

'পেলাম না সুইচ। এটাই এখন একমাত্র ভরসা।' একটু থেমে বলল, 'আমি নীচে গিয়ে একটু দেখে আসব, কিকোকে পাওয়া যায় কি না?'

'না, মুসা,' রাজি হলো না কিশোর। 'এর ফলে আমরা সবাই বিপদে পড়তে পারি। তার চেয়ে আর্মড্ ফোর্স যখন রেইড করবে, আমরাও আসব তাদের সঙ্গে।'

'ততদিনে না-খেয়েই তো মরে যাবে বেচারা!'

'উঁহুঁ!' মাথা নাড়ল কিশোর। 'এই কয়দিনে যদি মারা না গিয়ে থাকে, তা হলে ধরে নিতে হবে যে, কোনও না কোনও কৌশলে নিজের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা নিজেই করে নিয়েছে কিকো। আর দুটো দিন দেরি হলে কোনও ক্ষতি হবে না ওর।'

দু'-মিনিট কিশোরের অকাট্য যুক্তি মনে মনে নেড়ে-চেড়ে দেখল মুসা, তারপর হাসল। বলল, 'ঠিকই বলেছ, কিশোর। ব্যাটা যেমন চালাকের ধাড়ি, ওকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করার কোনও মানে হয় না। ঠিক আছে, তোমরা শুয়ে পড়ো—আমি পাহারায় থাকছি। দুই ঘণ্টা পর তুলে দেব তোমাকে।'

রাজি হলো না কিশোর। 'প্রথম পাহারায় থাকব আমি। কিছু চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। শুয়ে পড়ো তোমরা, আমি জাগছি।'

কথা না বাড়িয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল মুসা ও ফারিহা।

জেগে বসে থাকল কিশোর। আকাশটা আজ মেঘলা। এক-আধটা তারা দেখা দিয়েই লুকাচ্ছে মেঘের আড়ালে। আধঘণ্টা চুপচাপ বসে থাকার পর অস্পষ্ট ভাবে হেলিকপ্টারের ক্যাটক্যাটে আওয়াজ কানে এল ওর।

বোঝা গেল রবিনকে কাছেই কোথাও নামিয়ে দিয়ে ফিরে আসছেন আঙ্কেল ওদের উদ্ধার করতে। কাল সকালে অটার যখন দেখবে সব পাখি উড়ে গেছে, তখন তার চেহারার কী অবস্থা হবে ভেবে হাসি পেল কিশোরের।

বাতির সুইচটা পাওয়া যায় কি না নিজে একবার খুঁজে দেখল কিশোর। ঢাকনি দিয়ে ঢাকা ছোট একটা গর্তের ভিতর রয়েছে বলে কিশোরের চোখেও পড়ল না ওটা।

কাছে এসে পড়ল হেলিকপ্টার। মাথার উপর আসতেই টর্চ জ্বেলে সঙ্কেত দিল কিশোর। আবছা ভাবে দেখতে পেল উঠে বসেছে মুসা, ডাকছে ফারিহাকে। উঠে পড়ল ডিম্পলও। উঠেই তিড়িংবিড়িং কয়েকটা লাফ দিল ও, টের পেয়েছে সবার ভিতরের উত্তেজনা।

আকাশের পটভূমিতে আবছা ভাবে দেখা যাচ্ছে মস্ত ফড়িংটা, নামছে ধীরে ধীরে। কিন্তু বাতি নেই বলে ঠিক মাঝখানে নয়, একটু বামে সরে নামছে।

কোথায় যেন লাগল, খড়মড় আওয়াজ তুলে কিশোরদের দিকে কাত হলো কিছুটা। লাফিয়ে সরে গেল ওরা আরেক দিকে।

'তোমরা কোথায়, কিশোর-মুসা-ফারিহা?' আঙ্কেলের পরিচিত গলা শোনা গেল, জ্বলে উঠল একটা জোরাল টর্চ।

'এই যে, ডানদিকে,' বলল কিশোর। 'ঠিক সময় মতই এসেছেন, ছাতে আর কেউ নেই! রবিন ভাল আছে?'

'এক্কেবারে সেইফ অ্যান্ড সাউন্ড। পাহাড়ের পাশেই অপেক্ষা করছে ও মার্ক, মানে, আমার সঙ্গে যে লোকটা এসেছিল, তার সঙ্গে। জলদি উঠে পড়ো, গোলাগুলির আগেই কেটে পড়তে চাই।'

এক মিনিটের মধ্যে টপাটপ উঠে পড়ল ওরা তিনজন।

'অন্ধের মত নেমেছি,' বললেন আঙ্কেল। 'কোথায় যেন লাগল। যন্ত্রের কোনও ক্ষতি হলো কি না কে জানে!'

'আপনি তো বামে সরে গেলেন,' বলল কিশোর।

'তুমি তো ওদিকেই টর্চ দেখালে। মাঝখানে দাঁড়িয়ে আলো দেখানো উচিত ছিল।'

'আর আমার মাথার ওপর নেমে আমাকে চ্যাপটা করে দেয়া উচিত ছিল!' হাসল কিশোর। 'একপাশে দাঁড়িয়ে আলো তো আমি চত্বরের মাঝখানেই ফেলেছিলাম।'

'অথচ আমি তোমার হাতের টর্চটাকেই সেন্টার ধরে নিয়েছিলাম। যাক, কপালে দুর্ভোগ থাকলে খণ্ডাবে কে! খুব বেশি ক্ষতি না হলেই বাঁচা যায় এখন।' সামনের যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করলেন আঙ্কেল। 'সবাই রেডি? রওনা দিলাম তা হলে!'

ফুট দুয়েক উঠেই বাঁক নিতে শুরু করল হেলিকপ্টার।

'আরে! কী হলো! এরকম করে কেন?' আবার নামিয়ে আনলেন তিনি ওটাকে ছাতের উপর। 'এরকম তো কথা ছিল না!'

আবার চেষ্টা করে দেখলেন আঙ্কেল, কিন্তু না, পাগলামির লক্ষণটা একই রকম আছে। 'মনে হয়, স্টিয়ারিং-গিয়ারে কোনও গোলমাল হয়েছে। কেন যে মার্ককে নীচে রেখে এলাম!' টর্চ নিয়ে নীচে নেমে গেলেন ডিক কার্টার, কিশোরও গেল সঙ্গে।

একটু পরেই কিশোরের গলা শোনা গেল, 'এই দেখুন, আঙ্কেল, পাহাড়ের এই দাঁতটাকে আহত করেছেন, আর নিহত করেছেন কপ্টারটাকে।'

ভাল করে দেখলেন আঙ্কেল, আধঘণ্টা মেরামতের চেষ্টা করলেন হেলিকপ্টারের বাঁকা হয়ে যাওয়া পেনিয়ন, তারপর ফিরলেন কিশোরের দিকে। 'কও তো, মিয়া—কী করি এখন?'

'অস্ত্র আছে সঙ্গে?'

'নাহ্! দরকার পড়বে না মনে করে আনিনি।'

'তা হলে দড়ির মই ছাড়া আর কোনও উপায় নেই, আঙ্কেল। চলেন, কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই আর একবার চেষ্টা করে দেখি মইটা নামানো যায় কি না।'

'ঠিক বলেছ,' হেলিকপ্টারের দরজা দিয়ে মুখ ঢুকালেন আঙ্কেল। 'চলে এসো তোমরা। মই বেয়ে নামতে হবে আমাদের। চলো, কুইক!'

পাহাড়ে ঢোকার খোলা মুখের দিকে চলল ওরা দ্রুত পায়ে। হেলিকপ্টারে উঠে ফারিহা ভেবেছিল, বুঝি মুক্তি পাওয়া গেল। বাহনটা বিকল হয়ে যাওয়ায় মনটাই দমে গেছে ওর। কত কিছুই তো ঘটতে পারে

এখন। কারও চোখে ধরা পড়ে যেতে পারে ওরা, কেউ পাহাড়ের মাথায় গিয়ে হেলিকপ্টার দেখে হই-হল্লা করে সবাইকে জাগিয়ে তুলতে পারে। দড়ির মই যদি নামানো না যায় তা হলেও এত কিছু করে লাভ হবে না কিছু।

'আরে! ল্যাঙ মারে কে?' বলেই ডিম্পলকে দেখে হেসে ফেললেন আঙ্কেল। 'তুমি আছ এখনও? আমাদের দলের একজন, না? তা, কিকোর কী খবর? ওর সাড়া পাচ্ছি না যে?'

'হারিয়ে গেছে,' বলল মুসা উদাস কণ্ঠে। 'আমরা ধরা পড়ার পর থেকে জানি না ও কোথায় আছে। হয়তো কেউ বন্দি করে খাঁচায় পুরে রেখেছে, কিংবা পাহাড়ের ভেতর লুকিয়ে আছে কোথাও, অথবা মারা পড়েছে ওদের হাতে।'

'না-না!' বলে উঠল ফারিহা। 'এসব অলক্ষুণে কথা বোলো না। কিকোকে ধরা বা মারা অত সহজ না। হয়তো আজই পেয়ে যাব ওকে।'

পাথুরে সিঁড়ি বেয়ে নেমে চলল ওরা দ্রুতপায়ে।

সতেরো

গলিতে এসে দেখা গেল কোন্ দিকে যেতে হবে, বোঝা খুব মুশকিল। বাতিগুলো সব নিভানো। ডিম্পলকে অনুসরণ করে লাভ নেই, কারণ ও যে পথ চেনে সেটা কুকুরদের বেরোবার পথ।

আন্দাজের উপর ভর করে এগোতে হচ্ছে, কাজেই মুসাকে রাখা হলো সবার আগে। নিজের টর্চটা ধরিয়ে দিল কিশোর ওর হাতে। কিন্তু মুসার আন্দাজ মত এগিয়েও কোনও লাভ হলো না। ঘণ্টাখানেক হাঁটার পর টের পেল ওরা, হারিয়ে গেছে পাহাড়ের গোলক ধাঁধায়। নীচের দিকে নামছে ওরা, ক্রমে বাড়ছে ঢাল।

'আচ্ছা,' বলে উঠল ফারিহা, 'আমরা সেই গর্তের দিকে যাচ্ছি না তো? ওই যেখানে মেঝেটা সরাচ্ছিল কয়েকজন লাঠি দিয়ে?'

'চলো, দেখা যাক,' বলল কিশোর। 'ওখানে পৌঁছতে পারলে কাজ হবে—তার পরের রাস্তা আমরা চিনি।'

'ঠিক বলেছ!' বলল মুসা। এবং পরবর্তী মোড়টা ঘুরেই থমকে দাঁড়াল সেই উঁচু গ্যালারিতে।

নীচের দিকে তাকিয়ে চোখ ধাঁধিয়ে গেল ওদের। কেউ নেই ওখানে, তবু আপনাআপনি খানিকটা সরে গেল মেঝে, ফাঁকে দেখা গেল অত্যুজ্জ্বল আলো। সেই সঙ্গে মনে হলো হালকা হয়ে গেছে ওদের শরীর। ফাঁকটা বুজে যেতেই হালকা ভাবটা দূর হয়ে গেল। হঠাৎ পিছন ফিরল কিশোর।

'চলো, এবার সেই মই-ঘরে যাওয়ার রাস্তা পাওয়া গেছে।'

খাড়াই বেয়ে একটা তেরাস্তার মোড়ে পৌঁছে বামে চলল ওরা। কিছুদূর গিয়ে পর্দা টাঙানো ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ওরা। ফিসফিস করে বলল মুসা, 'এটা রাজার শোবার ঘর।'

পর্দা সামান্য ফাঁক করে ভিতরে চোখ রাখলেন আঙ্কেল। চমৎকার সাজানো ঘরটা দেখে নিয়ে নিচু গলায় বললেন, 'বুড়ো একটা লোক ঘুমাচ্ছে বিছানায়–মস্ত উঁচু কপাল।'

'ওই লোকটাকেই দামি পোশাক পরিয়ে রাজা বানায়,' বলল কিশোর। 'লোকটা বিরাট বৈজ্ঞানিক।'

'এই ঘর এড়িয়ে মই-ঘরে পৌঁছবার আর কোনও প...'

কিশোরকে মাথা নাড়তে দেখে থেমে গেলেন আঙ্কেল।

'এই ঘরের ভেতর দিয়েই যেতে হবে আমদের, পা টিপে,' বলল ও। 'এর পর রাজার খাবার ঘর, তারপর সিংহাসন রাখা রাজসভা। তারপর পাওয়া যাবে মই-ঘরে যাওয়ার পথ।'

কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করলেন আঙ্কেল, তারপর বললেন, 'তা হলে খুব সাবধানে একজন একজন করে পা টিপে যেতে হবে আমাদের। ডিম্পলকে সামলাবে কে?'

'আমি,' বলল ফারিহা। কোলে তুলে নিল বাচ্চাটাকে। 'আমিই যাই সবার আগে।'

একে-একে শোবার ঘর পেরিয়ে চলে এল সবাই খাবার ঘরে। পুরু কার্পেট বিছানো থাকায় শব্দ হলো না। টেবিলে আজ কিছু নেই দেখে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মুসা। এগোল সিংহাসন রাখা বিশাল হলঘরের দিকে। কিন্তু রাজসভায় ঢুকতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল ওরা। ভিতর থেকে বিদঘুটে সব আওয়াজ আসছে।

ড্রাগন আঁকা পর্দা সরিয়ে উঁকি দিলেন আঙ্কেল, তারপর ফাঁকটা বুজিয়ে দিয়ে পিছন ফিরে হাসলেন। ঘরের মাঝখানে লম্বা টেবিল বিছানো হয়েছে, তার উপর শুয়ে বেঘোরে নাক ডাকাচ্ছে প্যারাট্রুপাররা।

সবার একবার করে ভিতরটা দেখা হয়ে গেলে দেওয়ালের গা হাতড়ে বাতির সুইচটা খুঁজে বের করলেন আঙ্কেল। চাপা গলায় বললেন, 'ঘরের

আলো নিভিয়ে দিয়ে হলঘর পেরিয়ে যাব আমরা। সবাই ডানদিক ঘেঁষে যাব। কেউ যদি জেগেও যায়, আঁধারে দেখতে পাবে না আমাদের। পায়ের শব্দ পেলেও ক্ষতি নেই, ভাববে ওদেরই কেউ বুঝি বাথরুম যাচ্ছে।'

মৃদু 'ক্লিক' শব্দ তুলে নিভে গেল ঘরের বাতি। মিনিট দুয়েক অপেক্ষা করে আঙ্কেলের পিছু নিয়ে সাবধানে পার হয়ে এল ওরা হলরুম। মেঝেতে নরম কার্পেট থাকায় শব্দ হলো না একটুও।

গ্যালারিতে এসে বিশাল ল্যাবরেটরির বিপুল কর্মকাণ্ড দেখে হাঁ হয়ে গেল আঙ্কেল।

'কী হচ্ছে এখানে, আঙ্কেল?' জিজ্ঞেস করল ফারিহা।

ধাতব তার, হুইল, কাঁচের জার, ক্রিস্টাল-বাক্স, আলো—সব একনজরে দেখে নিয়ে আঙ্কেল বললেন, 'আমার ধারণা, এসবের মাধ্যমে এক ধরনের শক্তি বা এনার্জিকে অন্য ধরনের শক্তিতে রূপান্তরিত করা হচ্ছে, যাতে সেটাকে কাজে লাগিয়ে...'

'যেমন ডানার ভেতর বন্দি করে ভেসে থাকা যায়?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'সেই রকমই কিছু,' বললেন আঙ্কেল। 'বাপ্-রে-বাপ্! আশ্চর্য একটা ব্রেন কাজ করছে এসবের পেছনে!'

গলি-পথ ধরে কয়েকটা মোড় নিয়ে মই-ঘরে এসে পৌঁছল ওরা। এদিকের গলিগুলোর মোড়ে মোড়ে টিমটিমে বাতিগুলো কেন যেন জ্বালানো রয়েছে। সবার মাথায় একটাই চিন্তা—মইটা নামানো গেলেই, ব্যস—মুক্তি আর পনেরো মিনিটের ব্যাপার। কিন্তু ওটা নামানোর কৌশল, ওরা তো পারেনি, আঙ্কেল কি বের করতে পারবেন?

ছোট্ট ঘরটায় ঢুকে হাতের টর্চ তাক করল মুসা দেয়ালের দিকে। 'এই যে, আঙ্কেল। এইখানে গুটানো রয়েছে...আরে!'

ধপাস করে আওয়াজ হলো। কীসে যেন পা বেধে পড়ে গেছে ফারিহা শক্ত মেঝেতে। চট্ করে ওকে ধরে ফেললেন আঙ্কেল। বললেন, 'দেখো তো, মুসা, কীসে পা বাধল ওর!'

মেঝেতে আলো ফেলেই তাজ্জব হয়ে গেল ওরা। নামানো রয়েছে দড়ির মই। দেয়াল থেকে বেরিয়ে মেঝের ফাঁক গলে নেমে গেছে নীচে। ওটাতেই হোঁচট খেয়েছে ফারিহা। ব্যথা পেয়েছে হাঁটুতে, কিন্তু টুঁ-শব্দ বের করেনি মুখ দিয়ে।

মই নামানো দেখে খুশিতে লাফিয়ে উঠল ওদের হৃৎপিণ্ড।

'চলেন, আঙ্কেল!' বলল মুসা। 'দেরি না করে এক্ষুনি নামতে শুরু করি!'

'কেউ পাহাড় থেকে বেরিয়েছে আজ,' বলল কিশোর। 'ফিরে আসবে বলে ঝুলিয়েই রেখেছে মইটা। ভাবছি কে হতে পারে—অটার? উলরিখ? না কি জাপানিদের কেউ? ওদের সঙ্গে দেখা হয়ে না গেলেই বাঁচা যায়!'

'মুসা, তুমি যাও প্রথমে,' বললেন আঙ্কেল ডিক।

মই বেয়ে কয়েক ধাপ নামল মুসা। বলল, 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম—চললাম। তোমরা আমার কিকোটার জন্যে একটু দোয়া কোরো। ওকে এই পাহাড়ের ভেতর একা ফেলে যেতে আমার খুব কষ্ট লাগছে।'

মুসার মাথাটা অদৃশ্য হয়ে যেতেই আঙ্কেল বললেন, 'এবার কিশোর, তারপর ফারিহা, সবার শেষে আমি। আরে, ডিম্পল গেল কোথায়?'

'ওর ভিন্ন রাস্তা জানা আছে, আঙ্কেল,' বলল ফারিহা। 'একটু আগেই আমার কোল থেকে নেমে রওনা হয়ে গেছে ও।'

ধাপের পর ধাপ নেমে যাচ্ছে মুসা। ভাবছে, অন্ধকারে নীচটা দেখা যাচ্ছে না বলে ভালই হয়েছে; দেখা গেলে মাথা ঘুরত। দুই মিনিট নামার পর হঠাৎ নীচের দিক থেকে একটা কাঁপন অনুভব করল ও মইয়ে। স্থির হয়ে গেল মুসা।

'খাইছে! কে যেন উঠে আসছে ওপরে!'

আঠারো

নীচের কাঁপনের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েই দ্রুত উপরে উঠতে শুরু করল মুসা। মাথার উপর কিশোরের নড়াচড়া টের পেয়ে চাপা গলায় বলল, 'কিশোর, ওপরে চলো! কে যেন উঠছে মই বেয়ে!'

দ্বিরুক্তি না করে আবার উঠতে শুরু করল কিশোর। ফারিহা কাছাকাছি আসতে তাকেও সাবধান করল। আঙ্কেল সবে নামতে যাচ্ছিলেন, ফারিহার মাথা উঠে আসছে দেখে বুঝে গেলেন যা বোঝার, হাত বাড়িয়ে সাহায্য করলেন এক-এক করে ওদের সবাইকে উপরে উঠতে। তারপর মইয়ে হাত দিয়ে অনুভব করলেন, সত্যিই, কাঁপছে মই—উঠে আসছে কে যেন।

'প্যাসেজে চলো!' বললেন আঙ্কেল, 'এখন ধরা পড়া চলবে না।

লুকোচুরি খেলতে হবে আমাদের। নীচের লোকটা চলে গেলে আবার চেষ্টা করে দেখব আমরা।'

প্যাসেজটা যেখানে তিন ভাগ হয়ে গেছে সেখানে চলে এল ওরা দৌড়ে। সবচেয়ে বেশি অন্ধকার গলিটায় ঢুকে পড়ল সবাই। কিন্তু ঢুকেই থমকে দাঁড়ালেন আঙ্কেল। পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে! কারা যেন আসছে এদিকে। চট্ করে বেরিয়ে এল ওরা মেইন প্যাসেজে। এখানেও পায়ের শব্দ—পিছন থেকে। অর্থাৎ, মই বেয়ে উঠে পড়েছে, যে লোকটা আসছিল। দ্বিতীয় গলিতে ঢুকল এবার ওরা। ঢুকে দেখল, দু'পাশে অসংখ্য গুহা রয়েছে এই গলিতে; একটা থেকে যাওয়া যায় আরেকটায়।

'দাঁড়াও এখানে!' চাপা গলায় বললেন ডিক কার্টার।

কিন্তু গলিতে ঢোকার আগেই শত্রুপক্ষ দেখে ফেলেছে ওদের অন্তত একজনকে। চিৎকার শোনা গেল: 'অ্যাই, কে ওখানে? এক্ষুনি বেরিয়ে এসো!' চিৎকারটা এখানে-ওখানে বাড়ি খেয়ে প্রতিধ্বনি তুলে কলজে কাঁপিয়ে দিল কিশোর-মুসা-ফারিহার।

সাড়া দিল না ওরা। একটা গুহার আঁধারে দাঁড়িয়ে থাকল চুপচাপ। গুহাটা যথেষ্ট গভীর, কিন্তু টর্চের আলো ফেললে ধরা পড়ে যাবে ওরা।

গুহামুখের সামনে দিয়ে চলে গেল দু'জন। কিন্তু আরও লোকের গলা শোনা যাচ্ছে—এগিয়ে আসছে এদিকেই। অর্থাৎ ধাওয়া শুরু হয়ে গেছে পুরোদমে। গলা শুনে বোঝা যাচ্ছে, অন্তত চার-পাঁচজন খুঁজছে ওদের। গুঙিয়ে উঠলেন আঙ্কেল, 'ইশ্, আর একটু হলে ওদের হাত ফসকে বেরিয়ে গিয়েছিলাম প্রায়! চলো, দেখি এর চেয়ে ভাল গুহা পাওয়া যায় কি না।'

কিন্তু ওরা নড়ে ওঠার আগেই গুহামুখের কাছে একটা টর্চের উজ্জ্বল আলো এসে পড়ল। মূর্তির মত স্থির হয়ে গেল ওরা, শ্বাস নিতেও ভুলে গেছে। আলোটা আরও কাছে চলে আসছে। আরও কাছে। আলোটা ঠিক যখন মুসার জুতোর উপর পড়তে যাচ্ছে, এমনি সময়ে বাধা পেল টর্চধারী। চমকে ওঠায় লাফিয়ে সরে গেল আলোর রশ্মি। কাছেই কোথাও থেকে কথা বলে উঠেছে কেউ।

'যাও, এক্ষুনি হাত-মুখ ধুয়ে এসো! বদমাশ কোথাকার!'

লাফিয়ে উঠল মুসার হৃৎপিণ্ড। কিকো! বেঁচে আছে তা হলে! নিশ্চয়ই পথ হারিয়ে দিনের পর দিন প্যাসেজ আর গুহায় ঘুরে বেড়াচ্ছে বেচারা, জানে না ওরা ওর এত কাছে রয়েছে। আলো দেখেছে, সেই সঙ্গে লোকজনের কথাবার্তার আওয়াজ শুনেছে, তাই অভ্যাসবশে যোগ দিয়েছে

আলোচনায়।

একহাতে ওর বাহুতে চাপ দিয়ে মুসাকে সাবধান করলেন আঙ্কেল, যেন কিকোর নাম ধরে ডেকে না ওঠে।

'হ্যাচ্চো, হ্যাচ্চো! ডাক্তার! ডাক্তার ডাকো!' বলে উঠল কিকো। তারপর ধমকে উঠল, 'কী হলো, কথা কানে যায় না? অ্যাই গাধা, ওদিকে কোথায় যাস?'

অটারের তীক্ষ্ণ কণ্ঠ শোনা গেল, 'এই গুহায়! উলরিখ, এই গুহায়! জলদি এসো! কথা শুনতে পেয়েছ তুমি?'

'কীসের কথা?' আরেকটা টর্চ হাতে এগিয়ে এলো উলরিখ।

'এদিকে! কথা বলছিল, খুব সম্ভব দুইজন! তুমি এখানেই টর্চ ধরে দাঁড়াও, আমি দেখছি একপাক ঘুরে।'

টর্চ হাতে হাঁটতে শুরু করল অটার উলফ্, গুহার গায়ের ছোটখাট গর্তগুলোও বাদ দিচ্ছে না। প্রমাদ গনলেন ডিক কার্টার। এখন এখান থেকে অন্য গুহায় যাওয়ার কোনও উপায় নেই।

জোরসে একটা হাঁচি মারল কিকো। তারপর কেশে উঠল খক-খক করে। তল্লাসী ফেলে পাঁই করে ঘুরে আলো ফেলল অটার শব্দের উৎসের দিকে।

'খবরদার! বেরিয়ে এসো বলছি!' চেঁচিয়ে উঠল সে ধমকের সুরে, 'নইলে খারাবি আছে কপালে!'

ভয় পেল কিকো। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাবু হয়ে গেছে বেচারা। অটারের রাগী গলা শুনে আতঙ্কিত হয়ে উড়ে চলে গেল পাশের গুহায়, জানে না, ওর প্রাণপ্রিয় মুসা কত কাছে রয়েছে। ওদের কপাল ভাল যে জানে না, টের পেলে উড়ে এসে মুসার কাঁধে বসত। আর তার ফলে ধরা পড়ে যেত ওরা সবাই।

পাশের গুহা থেকে স্পষ্ট ভেসে এল ওর কথা।

'কতবার বলেছি তোমাকে, পা মুছে ঘরে ঢোকো!' বলেই জোরে একটা হিক্কা তুলে বলল, 'পার্ডন প্লিজ!'

'কী ঘটছে এসব!' বলে উঠল অটার, টর্চ নিয়ে ছুটল পাশের গুহার দিকে। 'এই গলাটাই তো কদিন ধরে শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে! গলার আওয়াজ যেখানে আছে, দেহটাও সেখানে থাকতেই হবে। আজ আমি এর শেষ দেখে ছাড়ব!' বলেই পিস্তল বের করে গুলি করল।

বদ্ধ জায়গায় বিকট আওয়াজ হলো গুলির। উলরিখকে নিয়ে পাশের গুহায় চলে গেল অটার। আবার গুলি করল কিকোর গলার আওয়াজ

লক্ষ্য করে। কিন্তু কিকোর বিদ্রূপের হাসি ভেসে এল আরও দূর থেকে।

'হা-হা-হা-হা-হা! আবার কথা বলে! কোনও কথা শুনতে চাই না আমি! চুপ, চোপরাও! ব্যাড বয়, নটি বয়!'

আবার গুলির শব্দ শোনা গেল।

গুলির প্রতিটা শব্দে চমকে চমকে উঠছে মুসা। ওর মনে হচ্ছে: এই বুঝি মারা পড়ল কিকো।

এইবার মোটর সাইকেল স্টার্ট দিল কিকো। পাগল হওয়ার দশা হলো অটার ও উলরিখের। কিকোকে দেখতে পাচ্ছে না ওরা, কারণ ওরা মানুষ খুঁজছে নীচে, আর কিকো রয়েছে শূন্যে ছাদের কাছাকাছি, এক তাক থেকে উড়ে গিয়ে বসছে আরেক তাকে।

ওদের লুকানো গুহার ভিতর দিয়ে 'সার, সার' বলতে বলতে পাগলের মত দৌড়ে অটার-উলরিখের কাছে চলে গেল একজন জাপানি। এরা পরিষ্কার শুনতে পেল, হাঁপাতে হাঁপাতে বলছে লোকটা, 'ছেলে-মেয়েরা সব পালিয়েছে, সার! কেউ নেই! ফেরত এসেছে হেলিকপ্টার, দাঁড়িয়ে রয়েছে একা পাহাড়ের মাথায়! কেউ নেই ওখানে!'

কয়েক মুহূর্তের নীরবতা। তারপর উঁচু গলায় একগাদা বিদেশী শব্দ উচ্চারণ করল অটার, যার একটি শব্দও বোধগম্য হলো না আঙ্কেল বা কিশোর-মুসা-ফারিহার কাছে।

এবার উলরিখের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল।

'বকা-বাহ্যিতে কোনও লাভ হবে না, অটার। কুকুর! কুকুর লেলিয়ে দিতে হবে এখন। নিশ্চয়ই মই বেয়ে নেমে গেছে ওরা। তুমি আজ বাইরে যাওয়ার সময় মইটা ঝুলন্তই রেখে গেছিলে, তাই না? কুকুর ছাড়ো, ওরাই ধরে নিয়ে আসবে তিনটেকে।'

'কিন্তু পাইলটের কী হলো? ওই ব্যাটা গায়েব কেন?' বলে আবার দুর্বোধ্য ভাষায় কী সব বলল অটার। আবার এই গুহার মধ্য দিয়ে বুলেটের বেগে বেরিয়ে গেল জাপানি। খুব সম্ভব কুকুরগুলোকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য।

'বাবারে, গেছি! ডাক্তার, ডাক্তার ডাকো!' করুণ সুরে বলল কিকো। পরমুহূর্তে টানেলে ঢোকা রেল ইঞ্জিনের আওয়াজ করল। উন্মাদের মত আচরণ শুরু করল অটার, চারদিকে টর্চের আলো ফেলে খুঁজছে কিকোকে, কোথাও একটু সন্দেহজনক ছায়া দেখলে গুলি করছে। পিস্তলের গুলি শেষ না হওয়া পর্যন্ত থামল না সে।

এবার শুরু হলো বিতর্ক। অটার-উলরিখ এবং আরও দুই কি

তিনজন কয়েকটা ভাষায় তর্ক জুড়ে দিল। কিন্তু সে-সব শোনার জন্য অপেক্ষা করলেন না আঙ্কেল, কিশোরের পিঠে আস্তে করে ঠেলা দিয়ে ছুট দিলেন মই-ঘরের দিকে।

হ্যাঁ, এখনও ঝুলছে দড়ির মই। আগের মতই প্রথমে মুসা আর সবার শেষে আঙ্কেল নামতে শুরু করল মই বেয়ে। নামার আগে বার দুয়েক বিচিত্র এক সুরে শিস দিল মুসা। হয়তো শুনতে পায়নি কিকো, কিংবা অটার ও তার দলবলকে ভয় পাচ্ছে–কোনও সাড়া পাওয়া গেল না তার তরফ থেকে। অনন্তকাল নামার পর সবাই শক্ত জমিতে পা দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ওঠার চেয়ে নামতে কষ্ট অনেক কম হয়েছে, তারপরও হাঁপাচ্ছে ওরা প্রত্যেকে।

বিশ্রামের সুযোগ দিলেন না আঙ্কেল, সবাইকে নিয়ে ছুটলেন সরু ফাটলের দিকে। কুকুরগুলোকে ছেড়ে দেওয়া মাত্র হুড়মুড় করে নেমে আসবে নীচে। দশ-দশটা অ্যালসেশিয়ানকে সামাল দেওয়ার সাধ্য তাঁর বা মার্ক স্টিফেনের নেই। বাইরে অপেক্ষা করছে রবিন আর মার্ক।

ভোর আসছে পাহাড় ডিঙিয়ে। সূর্য দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু তার সোনালি আভা ছড়িয়ে পড়ছে পুব আকাশে। পাহাড়ের ফাটল দিয়ে বেরিয়ে এল ওরা। লতা-ঝোপের পর্দা সরিয়ে বাইরের মুক্ত বাতাসে এসেই হাসি ফুটল সবার মুখে।

'চলে এসো,' ডাকলেন আঙ্কেল। কণ্ঠস্বরে তাড়া। 'রবিন আর মার্ককে ঝরনার ধারে রেখে এসেছি–ওই যেখানে তোমরা ডিম্পল-এর মাকে বেঁধে রেখেছিলে।

দ্রুতপায়ে হাঁটছে ওরা, এমনি সময়ে পিছন থেকে কর্কশ গলা ভেসে এল, 'অ্যাই ব্যাটা, কোথায় যাস!' পরমুহূর্তে ঝুপ করে মুসার কাঁধে এসে বসল কিকো। কড়া চোখে আঙ্কেলের দিকে চেয়ে বলল, 'পড়ো তো, খোকা। বলো…'

নিতান্ত বাধ্য ছেলের মত বললেন আঙ্কেল, 'বিএটি ব্যাট, সিএটি ক্যাট!'

কিকোও কম যায় না, বলল, 'ইয়াহ্! দ্যা'স রাইট!'

কিছুক্ষণ মুসার গালে মাথা ঘষে আদর করল কিকো, মুসা বিড়বিড় করে কী সব বলছে ওর কানে, ও-ও বলছে মুসাকে। সবাই মজা পেল ওদের এই সোহাগ বিনিময় দেখে। সবাই একবার করে আদর করল কিকোর ঝুঁটি চুলকে দিয়ে। আঙ্কেলও।

'তুমি আমাদের প্রাণ বাঁচিয়েছ, কিকো!' বললেন তিনি। 'ওদেরকে

পাশের গুহায় সরিয়ে না নিলে ঠিক ধরা পড়তাম আমরা। কিন্তু আমাদের খুঁজে পেলে কী করে বলো তো?'

কিকো খুশি হয়ে বলল, 'ঘুমাতে যাও, পাজি ছেলে, ঘুমাতে যাও! নইলে ঘাড় মটকে দেব! হ্যাঁচ্চো! হ্যাঁচ্চো! দূরো!'

সবাই খুশি, কিন্তু পলায়নের গতি কমাল না কেউ। ওরা জানে দশ-দশটা ভয়ঙ্কর অ্যালসেশিয়ান আসছে তাড়া করে। মুসা বুঝতে পারল, ওর শিস ঠিকই শুনেছিল কিকো—অটার আর উলরিখ একটু সরতেই আর দেরি করেনি, মই-ঘরের ফাঁক গলে উড়ে চলে এসেছে।

হঠাৎ ফারিহা লক্ষ করল ডিম্পল নেই ওদের আশপাশে।

ওকে এদিক-ওদিক চাইতে দেখে আঙ্কেল বললেন, 'এসে যাবে, চিন্তা কোরো না। কিকোর মত ও-ও এসে পড়বে।'

ঝরনার কাছে এসে পড়েছে, এমনি সময়ে উল্লসিত গলা শোনা গেল রবিনের।

'এই যে! আমরা এখানে! মুসা, কিশোর, ফারিহা, আঙ্কেল! আরে! কিকোও ফিরে এসেছে দেখছি! বাহ্! কিন্তু হেলিকপ্টার গেল কোথায়? তোমাদের জন্যে সেই থেকে অপেক্ষা করছি তো করছিই!'

উচ্ছ্বসিত রবিনের পিছনে বুকে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে রয়েছে খুনি চেহারার, গোমড়ামুখো মার্ক স্টিফেন। আর ওদের ঘিরে পাগলের মত লাফ-ঝাঁপ দিচ্ছে মাস্টার ডিম্পল। রবিনকে ফিরে পেয়ে তার খুশির সীমা নেই। কিন্তু···কিন্তু আত্মা কাঁপানো ডাক কীসের?

'কুকুর!' বলল মুসা। 'কুকুর লেলিয়ে দিয়েছে ওরা, বুলেটের বেগে আসছে ছুটে।'

উনিশ

দশটা অ্যালসেশিয়ানের সম্মিলিত গর্জন নির্জন পাহাড়ি অঞ্চলে কী ভয়ানক ভীতির সঞ্চার করতে পারে, টের পেল তিন গোয়েন্দা। ওদের শিরদাঁড়া বেয়ে ভয়ের স্রোত বয়ে গেল। ফারিহার মুখ থেকে রক্ত সরে গিয়ে ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে, দুই চোখ বিস্ফারিত।

দৃষ্টি বিনিময় হলো আঙ্কেল ও মার্ক স্টিফেনের মধ্যে। তাঁদের চেহারা থেকেও সদ্যমুক্তির আনন্দ সম্পূর্ণ তিরোহিত। মার্ক স্টিফেনের

মতই কঠোর, অভিব্যক্তিহীন দেখাচ্ছে এখন আঙ্কেলের মুখও। দশটা মানুষ-শিকারী বুনো কুকুরের বিরুদ্ধে কিছুই করার নেই তাঁদের।

'চলেন,' বলল কিশোর, 'ঝরনার ভেতর দিয়ে পানি ঠেলে এগোই। তাহলে কুকুরগুলো আমাদের গন্ধ পাবে না আর। ছুটন্ত পানিতে কিছুদূর গিয়ে দেখতে পারি আমরা লুকানোর কোনও জায়গা পাওয়া যায় কি না।'

'চলো,' বললেন আঙ্কেল। 'এভাবে রক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনা যদিও খুবই কম, তবু এ ছাড়া আর কী-ই বা আছে করার। ওই ব্যাটা হেলিকপ্টারটা যদি ওরকম গোত্তা না খেত, তা হলে এতক্ষণে পগার পার হয়ে যেতাম আমরা। ফারিহা, আমার হাত ধরো। কোনও ভয় নেই, কুকুর কাছে চলে এলে তুমি আমার কাঁধে উঠবে।'

সবাই নেমে পড়ল ছোট্ট ঝরনার হাঁটু পানিতে। পানিটা খুব ঠাণ্ডা। দূর থেকে ভেসে এল কুকুরের ডাক। খানিক পর এল বেশ অনেকটা কাছ থেকে। চলন্ত পানিতে হেঁটে হয়তো কুকুরের নাককে ফাঁকি দেয়া যাবে, কিন্তু চোখ? আর কিছুটা এগোলেই তো কুকুরগুলো স্পষ্ট দেখতে পাবে ওদের। এখুনি যদি লুকানোর কোনও জায়গা বা উঁচু কোনও গাছ পাওয়া না যায় তা হলে খবর আছে।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে লুকানোর জায়গা খুঁজে পেল মুসার তীক্ষ্ণ চোখ। পাহাড়ের গায়ের গোল একটা গর্ত থেকে বেরিয়ে ছোট একটা ঝোপের কিনারা ঘুরে এই ঝরনার সঙ্গে মিশেছে আরেকটা ছোট ঝরনা। বাঁক ঘুরে ওই গর্তের দিকে চলল মুসা সবাইকে নিয়ে।

ঢুকতে হলো হামাগুড়ি দিয়ে, কিন্তু ভিতরে বেশ প্রশস্ত জায়গা পাওয়া গেল, সবাই এঁটে যাবে। পাহাড়ের গায়ের ছোট একটা গর্ত দিয়ে তুমুল বেগে বেরিয়ে আসছে পানি।

'গুড!' বললেন আঙ্কেল খুশি হয়ে। 'কুত্তাগুলো আমাদের গায়ের গন্ধ হারিয়ে বাড়ি ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত এটাই আমাদের বাড়ি।'

যে যেখানে পারল বসে পড়ল ওরা। আরও অনেক কাছে চলে এসেছে কুকুরের ডাক। ছোট্ট জায়গায় নিজেদেরকে বেশ নিরাপদ মনে হচ্ছে ওদের।

পকেট থেকে কয়েকটা চকোলেট বের করলেন আঙ্কেল, বললেন, 'ভুলেই গেছিলাম এগুলোর কথা।' সবাইকে চকোলেট ভাগ করে দিলেন তিনি, কিকোও বাদ পড়ল না।

'থ্যাঙ্কিউ!' বলে একটা ডানা বাড়িয়ে দিল কিকো আঙ্কেলের দিকে।

ওটা আলতো করে ধরে ঝাঁকিয়ে দিতেই মন দিল সে সুস্বাদু চকোলেটে। মার্ক স্টিফেনের নিষ্ঠুর মুখে এক চিলতে হাসি ফুটেই মিলিয়ে গেল।

'কী মনে হয়, আঙ্কেল?' জিজ্ঞেস করল মুসা, 'আমাদের গন্ধ হারিয়ে ফেলেছে? আওয়াজটা মনে হচ্ছে যেন এক জায়গায় থেমে রয়েছে?'

'তাই তো মনে হয়,' বললেন আঙ্কেল। 'সন্দেহ নেই, কুকুরগুলো বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে—ঝরনা পেরিয়ে দেখছে আর কোনও ঘ্রাণ পাওয়া যায় না। আমরা যে পানি মাড়িয়ে উজানে উঠে এসেছি সেটা বোঝার ক্ষমতা ওদের না থাকলেই বাঁচা যায়।'

এতক্ষণে মুখ খুললেন মার্ক স্টিফেন। গলার আওয়াজটা গমগম করে উঠল গুহার ভিতর। 'কিন্তু ওদের সঙ্গের লোক ঠিকই আন্দাজ করতে পারবে। আমি হলে পারতাম। পানির কাছে গন্ধ হারিয়ে যাওয়া মানেই, শিকার হয় উজানে গেছে, নয়তো ভাটিতে।'

'তা হলে তো মহা মুশকিল!' বলে উঠল ফারিহা। 'ওই অটার লোকটা সাঙ্ঘাতিক ধূর্ত। ও ঠিকই বুঝে ফেলবে যে আমরা লুকিয়ে আছি এখানে।'

'এবার কিন্তু এদিকে আসতে শুরু করেছে ওগুলো!' বলল মুসা। সবাই কান পাতল। ঠিকই বলেছে মুসা, আরও কাছ থেকে আসছে কুকুরের ডাক।

'তার মানে,' বলল কিশোর, 'অটার বা উলরিখ পৌঁছে গেছে। ওগুলোকে নিয়ে আসছে উজানে।'

'কাছাকাছি এলেই আমাদের ঘ্রাণ পেয়ে যাবে ওরা!' বলল রবিন। 'ওদের নাককে কিছুতেই ফাঁকি দেওয়া সম্ভব না।'

'আমি কিন্তু ঝরনার পানিতে ওদের ছপ্-ছপ্ পায়ের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি!' বলল মুসা। 'কান পাতো, তোমরাও শুনতে পাবে।'

ও বলার পর সবাই শুনতে পেল এবার। একদম কাছে চলে এসেছে! অটারের তীক্ষ্ণ গলা কানে এল পরিষ্কার, 'সামনে, সামনে যা, হারামজাদারা! খুঁজে বের কর্ ওদের!'

এতক্ষণে প্রথম কুকুরটাকে দেখতে পেল ওরা। লাফিয়ে লাফিয়ে এগোচ্ছে সামনে, লাল জিভ বেরিয়ে আছে, হাঁপাচ্ছে হ্যাহ্-হ্যাহ্ শব্দে।

সোজা এসে গুহামুখের সামনে দাঁড়াল দলের ভয়ালদর্শন লিডার। ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করল না। ওকে যা করতে বলা হয়েছে তা-ই করেছে ও—খুঁজে বের করেছে পলাতকদের।

মাথা উঁচু করে নেকড়ের মত লম্বা ডাক ছাড়ল লিডার। উত্তরে চাপা,

রাগী একটা গর্জন ছাড়ল কিকো। অবাক হয়ে মাথাটা একপাশে কাত করে কান খাড়া করল লিডার। সে ভাবতেও পারেনি গুহার ভিতরে আরেকটা অ্যালসেশিয়ান রয়েছে।

লিডারের পিছনে এসে জড়ো হলো বাকি সবগুলো। জিভ বের করে হাঁপাচ্ছে। নাক কুঁচকে বাতাসে গন্ধ নিচ্ছে। রীতিমত ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে ওদেরকে।

'অবস্থা সুবিধের মনে হচ্ছে না!' চাপা গলায় সহকারীকে বললেন আঙ্কেল। বিন্দুমাত্র উত্তেজনার আভাস ফুটল না চেহারায়, চুপচাপ ভয়াল জানোয়ারগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকলেন মার্ক স্টিফেন, যেন রোজই আক্রমণোদ্যত শিকারী কুকুরের মুখোমুখি হয়ে তিনি অভ্যস্ত।

'কেউ নড়বে না,' বললেন আঙ্কেল। 'নড়াচড়া না করলে আক্রমণ করবে না ওরা, শুধু পাহারা দিয়ে রাখবে।'

ঝরনার ওপারে এসে দাঁড়াল অটার ও উলরিখ। দৌড়ে আসায় হাঁপাচ্ছে বেদম, লাল হয়ে গেছে চেহারা। গুহার ভিতর দুই-দুইজন বড় মানুষকে গুটিসুটি মেরে বসে থাকতে দেখে আঁৎকে উঠল ওরা। চট্ করে উলরিখকে টেনে নিয়ে একটা গাছের আড়ালে চলে গেল অটার। বোঝা গেল, আঙ্কেলের কাছে পিস্তল থাকতে পারে ভেবে ভয় পাচ্ছে। আড়াল থেকে তীক্ষ্ণকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল সে:

'বেরিয়ে এসো! একজন একজন করে বেরিয়ে এসো সবাই! নইলে ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ফেলবে ওরা তোমাদের। অস্ত্র থাকলে মাটিতে ফেলে দাও, হাত তুলে রাখবে মাথার ওপর! আমাদের অস্ত্র ধরা আছে তোমাদের দিকে।'

'বড় অমায়িক ভদ্রলোক, তাই না, বস্?' বললেন স্টিফেন আঙ্কেলকে। 'ওটাকে ধরতে পারলে বড় আনন্দ হবে। আমরা কি বেরোচ্ছি, না কি থাকছি এখানেই?'

'থাকছি,' সংক্ষেপে বললেন আঙ্কেল। 'আমার মনে হয় না ছোট ছেলেমেয়েদের ওপর কুকুর লেলিয়ে দেয়ার সাহস হবে ওদের।'

'এই লোক তার গোপনীয়তা রক্ষার জন্যে যা দরকার সব করবে,' বলল কিশোর।

কথাটার সত্যতা টের পাওয়া গেল একটু পরেই। কোনও উত্তর না পেয়ে এবং কারও বেরিয়ে আসার লক্ষণ না দেখে মেজাজ খারাপ হয়ে গেল অটারের। দুর্বোধ্য বিদেশি ভাষায় খ্যাক-খ্যাক করে উঠল সে, তারপর ইংরেজিতে।

'কী বলেছি, শুনেছ তোমরা। এখনই বেরিয়ে না এলে ঝাঁপিয়ে পড়ে বের করে আনবে তোমাদেরকে কুকুরগুলো। আর, আগেই সাবধান করে দিচ্ছি, ওদের দাঁতে কিন্তু সাঙ্ঘাতিক ধার; বাধা দিতে যেয়ো না।'

এরপরেও নড়ল না কেউ। ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলেছে ফারিহা। টের পেয়েছে, চঞ্চল হয়ে উঠেছে কুকুরগুলো; অটারের ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র ঝাঁপিয়ে পড়বে ওদের উপর।

হঠাৎ এগিয়ে গেল রবিন। কেউ বাধা দেওয়ার আগেই গুহার বাইরে বেরিয়ে গেল ও।

'অ্যাই ছোকরা!' ধমকে উঠল অটার, 'মাথার ওপর হাত তোল্!'

মাথার উপর হাত তুলল রবিন। চারপাশ থেকে ওকে ঘিরে ধরে শুঁকছে কুকুরগুলো। নিচু গলায় কথা বলছে ও।

'কী খবর তোমাদের? চিনতে পারছ না আমাকে? আমি রবিন। কদিন আগে আমাদের সঙ্গে ঘুমিয়েছিলে তোমরা, মনে নেই? গুড ডগস্! আমাদের বন্ধুত্ব হয়েছিল, মনে পড়ছে না?'

রবিনের একটা কথাও বুঝল না কুকুরগুলো, কিন্তু ওর গলার সুর ঠিকই বুঝতে পারল। মনে পড়ে গেছে ওদের। ছেলেটার প্রতি আশ্চর্য একটা আকর্ষণ বোধ করছে ওরা। কুঁই-কুঁই শব্দ করল দলনেতা, আদর চায়। মাথার উপর হাত তোলা থাকায় আদর করতে পারল না, একনাগাড়ে কথা বলছে রবিন নরম সুরে।

এদিকে মন্ত্রমুগ্ধের মত চেয়ে রয়েছেন মার্ক স্টিফেন ও আঙ্কেল ডিক। কিশোর ও মুসার কলজে কাঁপছে ভয়ে, পাছে রবিনের জাদু বিফল হয়!

কর্কশ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল অটার, 'আরগুলো কোথায়? এক্ষুনি বেরিয়ে আসতে বলো, নইলে কিন্তু দিলাম কুকুর লেলিয়ে!'

পিছনের দু'-পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল দলনেতা, সামনের পা দুটো রাখল রবিনের কাঁধে, চেটে দিল ওর গাল। ব্যস, বার্তা পৌঁছে গেল আর সবার মগজে। নিজেদের মধ্যে হুড়োহুড়ি লেগে গেল, কে কার আগে এসে রবিনের ঘ্রাণ নেবে, গাল চাটবে। তাই দেখে ওদিকে হাঁ হয়ে গেছে অটার ও উলরিখের মুখ।

মাথার উপর থেকে হাত নামিয়ে নিল রবিন। এখন গুলি করার সাহস হবে না অটারের। কুকুরের গায়ে লাগলে খেপে উঠতে পারে ওরা। ওদের মাথায়, পিঠে হাত বুলিয়ে ধন্য করে দিল রবিন। সেই সঙ্গে

মন্ত্রোচ্চারণের মত কথা বলে যাচ্ছে ও।

চিৎকার করে হুকুম দিল অটার কুকুরগুলোকে। 'গুহা থেকে বের কর্ সব ক'টাকে! ধরে নিয়ে আয় এখানে!'

সবকটা মাথা ঘুরল অটারের দিকে। ইতস্তত করছে ওরা। দলনেতা চাইল রবিনের দিকে। 'এসো আমার সাথে,' বলল রবিন। 'এসো, আরও বন্ধু রয়েছে ভেতরে।'

অটার ও উলরিখকে তাজ্জব করে দিয়ে রবিনের পিছু নিয়ে গুহায় ঢুকল চার-পাঁচটা অ্যালসেশিয়ান, কিশোর-মুসা আর ফারিহার হাত চেটে দিল। সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখছে এখন মার্ক ও আঙ্কেলকে, কিন্তু রবিন যখন ওঁদের গায়ে হাত রাখল, বিনা দ্বিধায় মেনে নিল নতুন দুজনকেও।

'আশ্চর্য!' বললেন আঙ্কেল ডিক, চোখে নির্ভেজাল প্রশংসার দৃষ্টি। 'রবিন, তুমি দেখছি জাদু জানো!'

'জাদু ছাড়া আর কী!' বললেন গোমড়ামুখো মার্ক স্টিফেন।

'এবার ওই বদমাশগুলোকেও একটু জাদু দেখিয়ে দেওয়া যায় না, রবিন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'ঠিক বলেছ! দেখি চেষ্টা করে।'

বাইরে থেকে অটারের উত্তেজিত চিৎকার ভেসে এল, 'ধরে আন্ ওদের! অ্যাই, হারামজাদারা! হুকুম না মানলে গুলি করে খতম করব সব কটাকে। ধরে আন্!'

অটারের কথা পাত্তাই দিল না ওরা। রবিনের নেতৃত্ব মেনে নিয়েছে ওরা, ও যা বলবে তা-ই করবে। অটারের বেতকে ভয় পায় ওরা, কিন্তু রবিনকে ভালবাসে। ভালবাসারই জয় হলো শেষ পর্যন্ত।

রেগেমেগে গুলি করে বসল অটার। কুকুরের গায়ে না, ওদের মাথার উপর দিয়ে। আশা করল, এবার তার আদেশ মানবে ওরা। চমকে লাফিয়ে উঠল অ্যালসেশিয়ানগুলো, সব কটা মাথা ফিরল অটারের দিকে। রবিন বুঝল, এ-ই সুযোগ।

'ধরো ওই দুজনকে!' বলে উঠল ও। আঙুল তুলল গাছের আড়ালে দাঁড়ানো অটার ও উলরিখের দিকে।

বিশ

অটার ও উলরিখ কিছু বুঝে ওঠার আগেই তুফান বেগে ছুটে এল দশটি সাক্ষাৎ যম। মুহূর্তে ধরাশায়ী হলো দুজন। উল্টে গেছে পাশার ছক। গুলি করার চেষ্টা করে দেখল অটার, কিন্তু ওর কব্জি কামড়ে ধরে জোরে মাথা ঝাঁকাল দলনেতা, ছিটকে দূরে গিয়ে পড়ল পিস্তল। হাতে ব্যথা পেয়ে 'কেঁউ' করে কুকুরের মত আওয়াজ করে উঠল অটার।

ততক্ষণে পৌঁছে গেছেন আঙ্কেল ও মার্ক স্টিফেন। স্টিফেনের হাতে বেরিয়ে এসেছে বিশাল এক ফোর্টিফাইভ ক্যালিবারের রিভলভার, আঙ্কেল তুলে নিলেন অটারের পিস্তলটা।

মাটির উপর দিয়ে ছেঁচড়ে দুই শয়তানকে রবিনের কাছে নিয়ে চলেছে কুকুরগুলো। শিম্পাঞ্জী উলরিখ ভয় পেয়ে হাউমাউ করে উঠল, 'ওদের ফেরাও! অ্যাই ছেলে! সারেন্ডার করছি আমি!'

কিন্তু অটার কামড়ের পরোয়া না করে ধস্তাধস্তি চালিয়ে গেল, যতক্ষণ না পাঁজর বরাবর আঙ্কেলের বুটের লাথি খেল। টেনে দাঁড় করানো হলো দুজনকে। এতক্ষণে উলরিখের মনে পড়ল, পিস্তল আছে ওর পকেটেও। আলগোছে হাত ঢোকাতে যাচ্ছিল পকেটে, রিভলভারের নল দিয়ে বাড়ি দিলেন মার্ক ওর কব্জির উপর। স্থির হয়ে গেল শিম্পাঞ্জী, মুহূর্তে হাত তুলল মাথার উপর। ওর পকেট থেকে পিস্তল বের করে নিল মুসা।

চোখ গরম করে চেয়ে রয়েছে অটার রবিনের দিকে। 'আমার বিরুদ্ধে চলে গেল এতদিনের ট্রেইনিং পাওয়া কুকুর! কী করেছ তুমি ওদের?'

'চোপ!' ধমক দিলেন আঙ্কেল।

'একদম চুপ! পা মুছে ঘরে ঢোকো!' ধমক দিল কিকোও।

কটমট করে চাইল অটার কিকোর দিকে। গলাটা চিনতে পেরেছে। এতক্ষণে বুঝতে পারছে, গত কয়েকটা দিন কথাবার্তা শুনেছে কিন্তু মানুষ দেখতে পায়নি কেন।

পিঠমোড়া করে বাঁধা হলো দুজনকে।

'এবার?' জানতে চাইল কিশোর।

'এবার মাইলখানেক হাঁটব আমরা,' বললেন আঙ্কেল। 'প্রজাপতি-উপত্যকাটা না দেখেই ফিরতে চাও নাকি?'

'কোথায়?' চেঁচিয়ে উঠল ফারিহা। 'পেয়েছেন? সত্যিই আছে ওরকম উপত্যকা?'

'আছে। ওখানেই আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে ইভান্স, ট্রেফর আর ঘোড়াগুলো।'

'কুকুরগুলো সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি না আমরা?' জানতে চাইল রবিন। 'খামারবাড়িতে পৌঁছানো পর্যন্ত আমিই নাহয় দেখাশোনা করতাম এদের? পরে আপনাদের গোয়েন্দা বিভাগ এগুলোকে কাজে লাগাতে পারবে হয়তো।'

'ঠিক বলেছ,' হাসলেন আঙ্কেল। 'ট্রেনিং পাওয়া কুকুর পেলে দারুণ খুশি হবে ওরা। এবার চলো, কুইক মার্চ। শীঘ্রিই লোকজন নিয়ে ফিরে আসতে হবে আমার এখানে। আচ্ছামত সাফ-সুতরো করতে হবে পাহাড়টা।'

'খিদেতে পেট জ্বলছে!' বলল মুসা। 'ইভান্সরা কি কিছু খাবার-টাবার এনেছে সঙ্গে করে?'

'একগাদা!' বললেন আঙ্কেল। 'মিসেস হ্যারল্ড এবার আরও দশদিনের খাবার দিয়ে দিয়েছেন সঙ্গে।'

'আর কতদূর?'

'ওই পাহাড়টা পেরিয়ে বাঁক নিলেই প্রজাপতি-উপত্যকা। ট্রেফর ব্যাটা ট্র্যাক হারিয়ে ফেলেছিল ঠিকই, কিন্তু খুব কাছাকাছিই নিয়ে এসেছিল তোমাদের।'

'আমাদের মাল-পত্র রয়ে গেছে...'

রবিনকে থামিয়ে দিয়ে আঙ্কেল বললেন, 'সব চলে গেছে প্রজাপতি-উপত্যকায়। ওখানেই পাবে তোমাদের রাকস্যাক, স্লিপিং-ব্যাগ আর খাবারের টিন।'

প্রজাপতি-উপত্যকায় পিকনিক করল ওরা বিকেল পর্যন্ত, দুই তরফের তথ্য বিনিময় হলো। কীভাবে কী হলো জানল সবাই। সব কথার শেষে ফারিহার চেহারা বেগুনি করে দিলেন আঙ্কেল ওর বন্ধু-প্রীতি ও সাহসের প্রশংসা করে। তারপর যখন রবিনকে ধরলেন, হাত জোড় করে মাফ চাইল ও, 'আমাকে লজ্জা দেয়ার চেষ্টা করবেন না, আঙ্কেল। আপনি ভাল করেই জানেন, ওটা আমার অর্জিত কোনও গুণ নয়, শুনেছি আমার

দাদাও বন্ধু ছিলেন পশু-পাখিদের।'

চমৎকার একটা দুপুর কাটাল ওরা ওখানে।

আর প্রজাপতি! ফুল! পাখি! অফুরন্ত আনন্দের উৎস! ফুলের মত দেখতে হরেক জাতের প্রজাপতি উড়ছে বাতাসে–পেইন্টেড লেডিস, কোমা, ফ্রিটিলারি, পিকক, রিংলেট, কপার, স্কিপার, হিথ–আরও কত কী! ডিম্পল মায়ের দুধ খেল, আর সারাটা দুপুর দৌড়ে বেড়াল মাঠময়। আর ফিরে ফিরে এল রবিনের আদর নিতে।

বিকেলে খাওয়া-দাওয়ার পর কুকুর আর অটার-উলরিখকে পেট পুরে খাইয়ে রওয়ানা হয়ে গেল ওরা খামার-বাড়ির উদ্দেশে। ওখান থেকে বন্দিদের নিয়ে হেড-কোয়ার্টারে চলে যাবেন মার্ক স্টিফেন। আঙ্কেল আর্মড ফোর্স নিয়ে যাবেন ওই অভিশপ্ত পাহাড়ে। প্যারাট্রুপারদের মুক্তি দেওয়া হবে, জাপানিদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবে হেড-অফিস।

আর পাহাড়ের রাজাকে রাজধানীতে নিয়ে দেখা হবে তাঁকে মানবকল্যাণের কাজে লাগানো যায় কি না।

***

অন্য ভুবনের কিশোর

শামসুদ্দীন নওয়াব

প্রথম প্রকাশ: ২০০৭

এক

খোশমেজাজে বিছানা ছাড়লাম। আজ স্কুল ব্যান্ডের ট্রাইআউট। জানালার কাছে গিয়ে শেড তুলে দিলাম। উজ্জ্বল রোদে চোখ ধাঁধিয়ে গেল। মনে হচ্ছে দিনটা ভালই কাটবে।

খালি পায়ে ড্রেসারের কাছে চলে এলাম। কেস থেকে বের করলাম ক্ল্যারিনেট। দ্রুত একবার গানটার নোটগুলো দেখে নিলাম। গত দু'সপ্তাহ ধরে চর্চা করছি গানটা। নাম: 'সানসেট ড্রিমস'। একবারও ভুল না করে বাজাতে পারলাম পুরোটা। মৃদু হাসলাম। ব্যান্ডে আমাকে না নিয়ে যাবে কোথায়?

নীচে নেমে এলাম। চাচী ডিম ভাজছে। আমার দিকে পিঠ ফেরানো। ছোট্ট এক টিভি রয়েছে কাউন্টারের উপরে। শব্দ নেই, শুধু ছবি।

'গুড মর্নিং,' বলে চেয়ারে ধপ করে বসে পড়লাম।

'সানি-সাইড আপ ডিম চলবে?' চাচী না ঘুরেই বলল।

'খুব চলবে,' বললাম। টিভিতে চোখ রাখলাম। এক লোক আবহাওয়া ম্যাপ দেখাচ্ছে। হয়তো বলতে চাইছে আজ বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। এটা আবার বলতে হয় নাকি? যে কেউ জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেই তো বুঝবে। কাউন্টারের উপরে, টিভির সামনে কিছু একটা আমার দৃষ্টি কেড়ে নিল। উঠে গিয়ে কাছ থেকে দেখলাম। হলদে-সবুজ তরলের খুদে এক পুকুর।

'এটা কী, চাচী?' আঙুল তাক করে প্রশ্ন করলাম।

'কিছু না,' বলে আমার ডিমগুলো প্লেটে ঢেলে দিল চাচী। ঘুরে দাঁড়াল আমার উদ্দেশে। 'খেয়ে নে। আমি পরে ওটা মুছে দেব।'

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। যে চাচী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে এত খুঁতখুঁতে, সে কিনা একথা বলছে! এবার চাচীর মুখের দিকে দৃষ্টি গেল আমার। কপালে ব্যান্ড এইড দেখতে পেলাম।

'কাটল কীভাবে, চাচী?' প্রশ্ন করলাম।

চাচী হাত রাখল কপালে।

'জানি না।'

অবাক কাণ্ড তো!

টেবিলে গিয়ে বসলাম। ডিমগুলোর দিকে চাইলাম। কুসুমগুলো হলদে-সবুজ, কাউন্টারের তরলটুকুর মত। গন্ধ নিলাম। আলাদা কিছু মনে হলো না।

'চাচী, কাউন্টারের ওই লিকুইডটা আমার ডিমে মিশে যায়নি তো?'

'বেশি চালাকি করিস না। ডিমগুলো ঠিকই আছে। এখন কথা না বলে খেয়ে নে। স্কুলে যাবি না?'

'মজা করছিলাম, চাচী,' বলে খাওয়ায় মন দিলাম। স্বাদ ঠিকই আছে। চাচীর আজকে হয়েছেটা কী? ঠাট্টাও বুঝতে চাইল না! খাওয়া শেষে সিঙ্কে রাখলাম প্লেটটা। লক্ষ করলাম তরলটুকু তখনও রয়েছে কাউন্টারে।

গোসলের পর চুল তখনও ভেজা ছিল, তাই ব্লো-ড্রায়ার দিয়ে শুকিয়ে নিলাম।

হঠাৎই পেটটা মোচড় দিয়ে উঠল। ডিমগুলো সত্যিই হয়তো পচা ছিল। কিংবা ব্যান্ড ট্রাইআউটের জন্য আমি হয়তো বা নার্ভাস বোধ করছি। ঠিক করলাম পেটের ব্যথাটাকে পাত্তা দেব না।

ক্ল্যারিনেট আর ব্যাকপ্যাক নিতে ঘরে যখন গেলাম, পেট রীতিমত ব্যথা করছে। ডিমে নির্ঘাত কোন সমস্যা ছিল। কী করব বুঝে পাচ্ছি না। আজ কোনমতেই স্কুল কামাই করতে চাই না।

তা ছাড়া জ্বর-টর না হলে বাসায় থাকা চাচী পছন্দ করে না। ডেস্কের উপর জিনিসপত্র রেখে নীচে নেমে এলাম।

চাচী তখনও কিচেনে।

'চাচী, আমার পেট ব্যথা করছে।'

'উপরে গিয়ে শুয়ে থাক। আমি মুসাকে ফোন করে বলে দেব আজ তুই ওর সাথে স্কুলে যাচ্ছিস না। শরীর ভাল লাগলে বিকালে যাস। তোর টিচারকে চিঠি লিখে দেব।'

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলাম না! চাচী কপালে হাত দিয়ে দেখেনি, হাজারটা প্রশ্নও করেনি। বাঁচা গেল বাবা। নিজের রুমে ফিরে গিয়ে, জামা-কাপড় পরেই শুয়ে পড়লাম।

চোখের কোণে লক্ষ করলাম, নাইট স্ট্যান্ডে ফোনটার লাল আলো টিপ-টিপ করছে। তার মানে চাচী মুসাকে ফোন করছে।

আমি টিভির রিমোট কন্ট্রোলটা তুলে নিয়ে কার্টুন ছাড়লাম। এখনও মাঝে মাঝে কার্টুন দেখি আমি—ভাল লাগে।

হঠাৎই টিভির পর্দা বড়সড় এক চোখের মত পিটপিট করতে লাগল। চোখ বুজতে চেয়ে পারলাম না। কিছু একটা আমাকে চেয়ে থাকতে বাধ্য

করল। একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম সেটের দিকে।

হলদে-সবুজ তরলের এক খুদে পিণ্ড চুইয়ে বেরোল টিভি থেকে। সেটের সামনের দিক বেয়ে হামাগুড়ি মেরে নামছে। একটু পরে, মেঝে পেরিয়ে আমার বিছানার উদ্দেশে এগোল। চিৎকার করতে চাইলাম, কিন্তু মুখ হাঁ করতে পারলাম না। নড়াচড়া করতে পারছি না।

বিছানার কিনারা বেয়ে উঠে আসছে তুলতুলে পিণ্ডটা। আড়াআড়িভাবে বিছানা পাড়ি দিয়ে আমার পায়ে সেঁটে গেল। ওটাকে ঝেড়ে ফেলতে চাইলাম, কিন্তু পা নড়ল না। পা বেয়ে জিনিসটা উঠে এল বুকে। মনে হলো ভারী এক কম্বল বুঝি শ্বাসরোধ করছে আমার। আমাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করছে ওটা। মারা যাচ্ছি আমি। শ্বাস নিতে পারছি না। নড়াচড়া করতে পারছি না।

গলা বেয়ে গালে উঠে এল দলাটা। তারপর থমকে গেল।

দুই

ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ছাড়লাম। বেঁচে আছি! এবার টের পেলাম কিলবিল করে নেমে যাচ্ছে পিণ্ডটা—গাল, গলা, বুক থেকে পায়ে। পায়ের পাতা মুক্ত হতেই অনুভব করলাম আমাকে ছেড়ে গেছে ওটা। নড়তে চড়তে পারছি আমি। বিছানা থেকে তড়াক করে লাফিয়ে নেমে দরজার উদ্দেশে দৌড় দিলাম।

হলওয়েতে দাঁড়িয়ে দেখলাম, বিছানা থেকে চুইয়ে নেমে মেঝে পেরোল পিণ্ডটা। কোন দাগ রেখে গেল না পিছনে। একটু পরে, টিভি সেটের পর্দার মধ্যে সেঁধিয়ে পড়ল। মুহূর্তের জন্য, পর্দাটা নিকষ কালো হয়ে গেল। পরমুহূর্তে কার্টুন ছবিটা ফিরে এল।

পা টিপে টিপে এগিয়ে গেলাম টিভিটা অফ করতে। ভয় হলো পাছে ভিতর থেকে কিছু একটা বেরিয়ে এসে খপ করে চেপে ধরে আমার হাত। কিন্তু সেরকম কিছু হলো না। পাওয়ার বাটন অফ করে পর্দা ঘুরিয়ে দিলাম দেয়ালের দিকে। টিভিটা অফ থাকলে ওটা বেরোতে পারবে বলে মনে হয় না। প্লাগটা খুলে ফেললাম। আপাতত টিভি দেখা বন্ধ।

ঘরের বাইরে যাচ্ছি, বাথরুমের আয়নায় প্রতিচ্ছবি দেখে দাঁড়িয়ে পড়লাম। আমার গালে আঁচড়টা কীসের? পিণ্ডটা আমার গায়ে ওঠার আগে

ছিল এটা? প্রশ্নই ওঠে না। আঁচড় পড়লে জানতাম না আমি?

বাথরুমে ঢুকে ক্ষতস্থানে একটা ব্যান্ড এইড সাঁটলাম। হঠাৎই অনুভব করলাম পেট ব্যথাটা আর নেই।

অবাক ব্যাপার, আয়নায় চোখ রেখে ভাবলাম। এখন চাচী আর আমি দু'জনেই ব্যান্ড এইড লাগিয়েছি।

একটু পরে, সিঁড়ি ভেঙে নামতে লাগলাম। অর্ধেকটা নামতে ডোরবেল বাজল। চাচী বেরিয়ে এল কিচেন থেকে। তার পিছনে ডন। ও চাচীর বোনের ছেলে। বেড়াতে এসেছে।

'আমি খুলছি,' বলে চাচী দরজা খুলল।

বারান্দায় আমার বয়সী এক ছেলে দাঁড়িয়ে। হাইটও আমার সমান। পরনে আমার মতই টি-শার্ট আর জিন্স।

প্রথমে চাচীর তারপর আমার দিকে চাইল ও।

'হাই,' বলল। 'আমার মা আর আমি রাস্তার ওপাশের বাড়িটায় নতুন এসেছি।' ধূসর শাটারওয়ালা বাড়িটা আঙুল-ইশারায় দেখাল ও। রাশেদ চাচা বছরখানেক ধরে ওটা বিক্রির চেষ্টা করছে। চাচা রিয়েল এস্টেট ব্রোকার হিসেবে কাজ করছে।

'ভেতরে এসো,' চাচী ডাকল ওকে। আমি নেমে এলাম নীচে। চাচী পড়শীদের প্রতি সবসময়ই বন্ধুভাবাপন্ন, এমনকী যাদেরকে চেনে না তাদের প্রতিও। প্রায়ই তারা এটা-সেটা ধার নিতে আসে। চাচী দরজাটা পিছনে লাগিয়ে দিল। হলঘরটায় যেন আচমকা ঠাণ্ডা জেঁকে বসল। কেঁপে উঠলাম আমি।

'তুমি কিশোরের বয়সী,' বলে আমার কাঁধ জড়িয়ে ধরল চাচী। 'এ হচ্ছে কিশোর।' আমাকে সামনে ঠেলে দিল। 'কিশোর, ও তোর নতুন বন্ধু। আর এ হচ্ছে ডন।'

হাত বাড়িয়ে দিলাম আমি। 'হাই,' বললাম।

'হাই,' বলল ও। 'আমার নাম রিচি।'

হাত মেলালাম রিচির সঙ্গে। ওর হাতটা ঠাণ্ডা আর ভেজা-ভেজা। ও হাত ছেড়ে দিলে জিন্সে মুছে নিলাম। লক্ষ করলাম ওর মুখের চেহারায় সামান্য সবুজ ভাব। অসুস্থ নাকি? মেরুদণ্ড বেয়ে হিমস্রোত নেমে গেল আমার। ছেলেটার দিকে চোখ পড়লেই ভয়-ভয় লাগছে।

এবার চাচীর গলা শুনতে পেলাম, 'তুই আর রিচি সম্ভবত একই ক্লাসের।' আমার দিকে ঘুরে দাঁড়াল। 'স্কুলের রাস্তাটা ওকে চিনিয়ে দিস।'

আমি এড়াতে চেষ্টা করলাম।

'গোটা দুয়েক ব্লক পেরোলেই স্কুল,' বলে স্কুলের উদ্দেশে হাত নাড়লাম।

কিন্তু চাচী আমাকে অত সহজে ছাড়ল না।

'তুই ওকে সাথে করে স্কুলে নিয়ে যাবি।'

অগত্যা রাজি হতে হলো আমাকে।

'বই আর ক্ল্যারিনেট নিয়ে আসি,' বলে উপরে গেলাম। চাচী আর রিচি দাঁড়িয়ে ছিল দরজার পাশে। চাচী আমাকে একটা চিরকুট দিল। টিচারকে দেওয়ার জন্য–দেরি করার কৈফিয়ত। লিখল কখন ওটা? আর জানলই বা কীভাবে আমার পেট ব্যথাটা চলে গেছে? জিজ্ঞেস তো করেনি। চাচী যেন জানতই আজ সকালে আমি স্কুলে যাব।

কিছু একটা বিচিত্র ব্যাপার ঘটছে। কিন্তু ঠিক ধরতে পারছি না কী সেটা।

রিচিকে পাশে নিয়ে দুটো করে বারান্দার ধাপ টপকালাম। কোনার দিক থেকে একটা গাড়ির হর্ন বেজে উঠল। মুসা ওর মার পাশে গাড়িতে বসা।

জানালা দিয়ে মুখ বের করে দিল ও।

'হাই, কিশোর, তোমারও দেরি হয়ে গেছে দেখছি।' জানা গেল মিসেস আমান কাজ থেকে ফিরে তারপর ওকে গাড়িতে তুলেছেন। ও ড্রাম নিয়েছে সঙ্গে। 'সরি, তোমাকে গাড়িতে নিতে পারছি না। পুরো ব্যাক সিট খেয়ে ফেলেছে ড্রামগুলো।' ট্রাফিক লাইট সবুজ হলে হাত নাড়ল ও। 'স্কুলে দেখা হবে।'

পাল্টা হাত নাড়লাম আমি। ভয়াল দর্শন রিচিকে কি ও আমার সঙ্গে দেখেছে? দেখে থাকলেও ওর ভাবে-ভঙ্গিতে প্রকাশ পায়নি।

রিচি আর আমি আরেকটা ব্লক পাশাপাশি হাঁটলাম। কারও মুখে কথা নেই। স্কুলে পৌঁছেই খসাতে হবে একে। কিন্তু হঠাৎই মনে হলো ওর সঙ্গে কিছু কথা-বার্তা তো বলা উচিত।

'তোমরা কোথা থেকে এসেছ?' নরম কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম।

'অনেক দূর থেকে।'

'অনেক দূর মানে? ইংল্যান্ড থেকে?'

'ইংল্যান্ড কোথায় আমি জানি না,' জবাব দিল ও। 'আমি এসেছি এক অন্ধকার দেশ থেকে।'

'অদ্ভুত নাম তো,' বললাম। ধারণা করলাম ইউরোপ কিংবা এশিয়ার কোনও শহরের নামের অনুবাদ এটা। আবার কথা পাড়লাম। 'তোমার বাইক আছে?'

শব্দটা যেন জীবনেও শোনেনি এমনি ভঙ্গিতে আমার দিকে চাইল রিচি। মাথা নাড়ল। 'না।'

ক্রমেই ঘোরাল হয়ে উঠছে পরিস্থিতি। দেখি আরেকবার চেষ্টা করে।

'তোমার প্রিয় খেলা কী?'

'খেলা?'

'হ্যাঁ, বেসবল কিংবা বাস্কেটবল?'

'আমরা কোনও খেলা খেলি না। আমরা যেখানে থাকতাম সেখানে আলো খুব কম।'

ব্যস, ও পর্যন্তই! আলাপ জমানোর চেষ্টার ওখানেই ইতি। দ্রুত পায়ে হাঁটতে লাগলাম আমি। কাঁধে ব্যাগ আর হাতে ক্ল্যারিনেট না থাকলে দৌড়াতাম। রিচি কী ভাবত বয়েই যেত।

এই ছেলের পাশাপাশি হাঁটতেও রাজি নই আমি। ওর মত অদ্ভুত ছেলের সঙ্গে আমার আগে কখনও পরিচয় হয়নি। স্কুলে শীঘ্রি পৌঁছতে চাইছি, একে যাতে ঝটপট খসাতে পারি।

কিন্তু একটা মোড় ঘুরতেই দেখি বুলি আর ওর বন্ধুরা মুভি হাউসের সামনে, এক লোহার গেটে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে। এক কমিক বই হাত বদল করে হাসাহাসি করছে ওরা।

বিশালদেহী ছেলে এই বুলি। অত্যাচার করে ছোটদের উপর। পকেট মানি কেড়ে নেয়। কারও পকেটে টাকা না পেলে মারধর করে।

কিন্তু আমি চাই না ও আমাকে দেখে ফেলুক। বিশেষ করে এই অবস্থায়, যখন আমার মুখে ব্যান্ড-এইড সাঁটা আর সঙ্গে রিচির মত বিচিত্র এক চিড়িয়া। আমার কিছু একটা করতে হবে—দ্রুত।

তিন

রিচির হাতা ধরে টেনে আনলাম আড়ালে।

'তোমাকে স্কুলে যাওয়ার শর্ট কাট দেখিয়ে দিচ্ছি,' বললাম। বেক-শপ আর চাইনিজ টেক-আউটের গলি ধরে হাঁটিয়ে নিয়ে গেলাম ওকে। সুপারমার্কেটের পিছনের পার্কিং লট ত্বরিত গতিতে পার হয়ে, স্কুলের পিছনদিকের প্রবেশ পথের সামনে বেরিয়ে এলাম।

স্কুলে ঢুকলাম আমরা। রিচিকে অ্যাডমিশন অফিসে ছেড়ে ক্লাসের

উদ্দেশে চললাম আমি।

কপাল আর কাকে বলে, রিচি আমার ক্লাসেই ভর্তি হয়েছে! আমাদের টিচার মিসেস হাওয়ার্ড ওকে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমার পাশের সারিতে বসানো হলো ওকে। চোখের কোণে চেয়ে দেখি আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে ও। ভাবখানা এমন যেন আমার প্রতিটি নড়াচড়া লক্ষ করতে হবে।

লাঞ্চ পিরিয়ডে মুসা আর রবিনের সঙ্গে মিলিত হলাম ক্যাফেটেরিয়াতে, আমাদের প্রিয় টেবিলটিতে। পিছন দিকের এই টেবিলে বসলে সব কিছু দেখা যায়।

'আজকে অদ্ভুত এক সকাল পার করলাম!' বললাম। টিউনা স্যান্ডউইচের মোড়ক খুললাম। ওদেরকে কিচেন কাউন্টারের তুলতুলে পিণ্ডটা, চাচীর অস্বাভাবিক আচরণ, আমাদের দু'জনেরই ব্যান্ড-এইড লাগানো–এসব কথা খুলে বললাম। টিভি থেকে বেরিয়ে এসে একটা পিণ্ড আমাকে আক্রমণ করেছে শুনে মুসা 'খাইছে' বলে উঠল।

চীয স্যান্ডউইচে কামড় দিল রবিন।

'রিচির কথা বলো।'

'পিণ্ডটার আক্রমণ থেকে বাঁচার ঠিক পরপরই ও আমার বাসায় আসে। ব্যাপারটা কেমন অদ্ভুত না?' বললাম।

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল ওরা।

বিকেলে, মিসেস হাওয়ার্ড আমাদেরকে মিউযিক রূমে পাঠালেন। স্কুল ব্যান্ডের ট্রায়ালে অংশ নিতে। আমি আর মুসা হলওয়ে ধরে হাঁটা দিলাম। আমার মুখে কথা নেই। মাথার মধ্যে শেষবারের মত 'সানসেট ড্রিমস' চলছে। মুসাও নীরব, তবে মাঝেমধ্যে বাতাসে চাপড় মারছে। ড্রাম প্র্যাকটিস করছে আরকী।

মিউযিক রূমে পৌঁছার পর, মুসা ওর ড্রাম সেট করতে গেল। আমি সামনের দিকে একটা আসন নিয়ে ক্ল্যারিনেট কোলে বসে রইলাম। একটু পরে দেখলাম রিচি এসে ঢুকল। ওর হাতে বেহালা। পেল কোথায় জিনিসটা, অবাক হয়ে ভাবলাম। আমার সঙ্গে যখন স্কুলে এল তখন তো ওটা দেখিনি। ওর হাতে কোন কিছুই ছিল না। এখন ভোজবাজির মত বেহালা এল কোথা থেকে?

পরে মনে পড়ল রিচি ক্যাফেটেরিয়াতে যায়নি। তখন হয়তো গিয়ে মিউযিক টিচার মিস্টার বেনসনের কাছ থেকে বেহালা ধার করে এনেছে। কিন্তু তা হলে কখন লাঞ্চ করল ও? আর কোথায়ই বা?

রিচির যখন পালা এল, কামরার সামনে বেহালা হাতে চলে গেল ও ওর বাজানো শুনে এগিয়ে এলেন মি. বেনসন।

'চমৎকার,' মন্তব্য করলেন। 'তুমি ব্যান্ডে থাকছ।'

আমার পালা এলে উঠে দাঁড়ালাম। ক্ল্যারিনেট ঠোঁটে ছোঁয়াতে গিয়ে হাত কেঁপে উঠল। আমার তো নার্ভাস হওয়ার কথা নয়। গত বছর ব্যান্ডে ছিলাম আমি, তখন তো নার্ভাস হইনি। তা হলে এখন হচ্ছি কেন? এর সঙ্গে নিশ্চয়ই ওই ভুতুড়ে রিচি ছেলেটার কোন সম্পর্ক আছে। ও হয়তো চায় না আমি ব্যান্ডে থাকি, তাই কোন জাদু-টোনা করেছে।

পরক্ষণে ঝেড়ে ফেললাম চিন্তাটা। কী সব আজেবাজে কথা ভাবছি। কিন্তু টিভি থেকে বেরিয়ে আসা পিণ্ডটাও কি আমার কল্পনা?

যা হোক, ভুল নোট বাজানোর পরও ব্যান্ডে জায়গা পেলাম আমি। মুসাও পেল।

ট্রায়ালের পর বাছাই করা সদস্যদেরকে মি. বেনসন জানিয়ে দিলেন, তিন সপ্তাহ পরে সিনিয়র সিটিযেন সেন্টারে আমাদের প্রথম কনসার্ট হবে। যে সব গান বাজানো হবে তার শীট আমাদের হাতে হাতে বিলি করলেন।

'বার বার প্র্যাকটিস করবে। কোন গানে যেন ভুল না হয়। বৃহস্পতিবার স্কুল ছুটির পর রিহার্সাল,' বললেন মি. বেনসন।

মুসা ওর ড্রাম স্কুলে রেখে দিল। আমি ক্ল্যারিনেট নিয়ে বাড়ির পথ ধরলাম। সঙ্গে মুসা। বলাবাহুল্য আলোচনার মূল বিষয়বস্তু হলো রিচি।

'ছেলেটাকে ভালই তো লাগল,' বলল মুসা। 'একটু লাজুক শুধু। ও কি অসুস্থ নাকি?'

'জানি না। অসুখের কথা তো কিছু বলেনি। অসুস্থ হলে বাড়ি থেকে নিশ্চয়ই ছাড়ত না। তবে ছেলেটা অদ্ভুত। ওর সাথে হাত মেলানোর চেষ্টা কোরো না।'

'খাইছে! কেন?'

'ওর হাতটা যেমন ঠাণ্ডা তেমনি স্যাঁতসেঁতে। মনে হচ্ছিল বরফের টুকরোয় হাত দিয়েছি।' এরপর ও কোত্থেকে এসেছে এবং ওর বাইক নেই সে কথাও জানালাম।

'ওরা হয়তো গরীব। বাবা-মা হয়তো বাইক কিনে দিতে পারেনি,' বলল মুসা।

এটা তো আগে ভেবে দেখিনি। এবার মাথায় ঘাই মারল আরেকটা চিন্তা।

'ও নাকি খেলাধুলো করে না,' জানালাম। 'যেখানে থেকে এসেছে

সেখানে নাকি সূর্যের আলো নেই।'

'আমরা না হয় ওকে কয়েকটা খেলা শিখিয়ে দেব,' প্রস্তাব করল মুসা। ওর বাড়ি এসে গেছে। গেট খুলে হাত দোলাল আমার উদ্দেশে। 'কাল দেখা হবে।'

'বাই,' বলে হাঁটা দিলাম। রিচিকে কিছু শেখানোর ইচ্ছা আমার নেই। ওর সঙ্গে আর দেখা হোক তাও চাই না।

বাড়ি পৌঁছে দেখি, চাচা ফিরে এসেছে। ডনের সঙ্গে ক্যারম খেলছে লিভিংরুমে। রিচির কথা তাকে খুলে বললাম।

'হ্যাঁ, ও আর ওর মা দেখতে অন্যরকম বটে,' বলল চাচা। 'কিন্তু দুনিয়ার সবাই যে একরকম হবে এমন তো কোন কথা নেই। ওদেরকে ওদের মত করেই আমাদের মেনে নিতে হবে।'

চাচার পক্ষে কথাটা বলা সহজ। কারণ তাকে তো আর রিচিকে নিয়ে স্কুলে যেতে হবে না কিংবা একই ক্লাসে বসতে হবে না।

ডিনারে বসে, চাচা আমাদেরকে রিচিদের কাছে যে বাড়িটা বিক্রি করেছে সেটার কথা জানাল।

'এখন শুধু রিচির মা আর রিচি উঠেছে,' বলল। 'রিচির বাবা আর অন্যান্য মেম্বাররা শীঘ্রি এসে পড়বে। বেশ বড় ফ্যামিলি বলে মনে হলো। কারও সাথে ওদের মিল নেই। একটা টিভি সেট ছাড়া সাথে করে আর কিচ্ছু আনেনি।'

'রিচির বাবা হয়তো বাকি জিনিসপত্র নিয়ে আসবে,' বলল ডন।

এতদিন পর্যন্ত ওরা কি মেঝেতে ঘুমাবে? মনে মনে বললাম।

চাচার দিকে চাইল চাচা।

'আমাদের বিয়েতে পাওয়া সাদা-কালো টিভিটার কথা মনে আছে, যেটা আমার অফিসে রেখেছি? আজ বিকেলে ওটা নষ্ট হয়ে গেছে।'

হতেই পারে। বয়স তো আর কম হয়নি। শনিবার চলো মলে যাই। তোমার জন্যে একটা টিভি আর আমার জন্যে একটা নতুন ব্লেডার কিনে আনি,' চাচা বলল।

'ঠিক হ্যায়,' চাচা বলল।

আমি একবার ভাবলাম চাচাকে বলি আমার টিভিটা নিক। আমি মনে হয় ওটা আর দেখব না। কিন্তু শেষমেশ চুপ করে থাকলাম। হয়তো দু'এক সপ্তাহ পর মত বদলাতেও পারে আমার।

হঠাৎই আমার গালের দিকে নজর গেল চাচার।

'কী রে, তুই আর তোর চাচী নতুন ব্যান্ড-এইড ক্লাব খুলেছিস নাকি?'

প্রশ্ন করল।

মৃদু হাসলাম শুধু। মুখে কিছু বললাম না। কীভাবে কেটেছে বললে তো বিশ্বাস করবে না। আমি অবশ্য এখনও নিশ্চিত নই পিণ্ডটার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক আছে কিনা।

পরদিন সকালেও ব্যান্ড-এইডটা রয়ে গেল। শাওয়ার সেরে বেরোতেই ফোন করল মুসা।

'আমি আজকে স্কুলে যাচ্ছি না,' বলল। 'রাতে ফোন করে জানিয়ে দিয়ো কী কী মিস করলাম।'

'ঠিক আছে, কোনও চিন্তা কোরো না,' বলে রিসিভার রেখে দিলাম। ঝটপট নাস্তা করে তৈরি হয়ে নিলাম স্কুলের জন্য। তারপর আগেভাগে বেরিয়ে এলাম বাড়ি থেকে। রিচি ছেলেটার সামনে কোনওমতেই পড়া চলবে না।

গেট পেরিয়ে পাঁচ ফিট গেছি কি যাইনি, কে যেন আমার নাম ধরে ডাকল। ঘুরে দাঁড়ালাম। রিচি! আজও ওর সঙ্গে স্কুলে যেতে হবে। আমার পুরো মুখটা কেন ব্যান্ড-এইডে ঢেকে গেল না, খোদা!

হাঁটা ধরলাম আমরা। রিচি সোৎসাহে বলে চলল কাল স্কুলে ওর কত ভাল লেগেছে, স্কুলইয়ার্ডে লাঞ্চ করতে গিয়ে কতই না আনন্দ হয়েছে এসব কথা। আমি সারাটা পথ কাঁটা হয়ে রইলাম, কোন বন্ধুর সঙ্গে যেন দেখা হয়ে না যায়।

কিংবা বুলি ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের সঙ্গে।

চার

কিন্তু বিধি বাম। মেইন স্ট্রীট পেরোতেই আমাদের দিকে হেঁটে আসতে দেখলাম...বুলি আর তার দুই বন্ধুকে! চট করে এদিক-ওদিক চেয়ে পালানোর পথ খুঁজলাম, কিন্তু পেলাম কোথায়?

ঘুরে দাঁড়িয়ে দৌড় দিতে পারি, ভাবলাম। কিন্তু বুলিকে দেখেছি ছেলেদেরকে ধাওয়া দিতে। ভয়ানক ক্ষিপ্র গতি ওর। আর আমি তা নই। রিচির দিকে চাইলাম। ওকে দেখে মনে হলো না এক ফুটও দৌড়তে পারবে। তার মানে বুলির পাশ কাটিয়ে যাওয়া ছাড়া গতি নেই। এবং ওর মুখের চেহারা দেখে বুঝতে পারছি আজকে বিপদ আছে।

'ঝামেলা হতে পারে,' ফিসফিস করে রিচিকে বললাম। 'কথা যা বলার আমি বলব।' হয়তো বুলিকে টাকা দিয়ে দিলেই ছাড়া পেয়ে যেতে পারি।

জিন্সের পকেটে হাত ঢুকালাম। দুপুরে না খেয়ে থাকতে হবে ভাবতে ভাল লাগছে না, কিন্তু ফাটা ঠোঁট কিংবা কালসিটে পড়া চোখের চেয়ে তো সেও ভাল।

'এদেরকে কালকে দেখেছিলাম না?' রিচি জিজ্ঞেস করল।

ও জানল কীভাবে? আমরা তো কাল অতটা কাছে যাইনি যে মুখগুলো ও চিনে রাখবে। আর আমি তো কিছু বলিওনি।

'কীভাবে...' প্রশ্ন করতে শুরু করেছিলাম।

কিন্তু আমাকে থামিয়ে দিল ও।

'চিন্তা কোরো না,' বলল। 'ওরা আমাদের কিছু করবে না।'

বুলি বন্ধুদেরকে পিছনে নিয়ে গটগট করে এগিয়ে এল। কোমরে দু'হাত রেখে দু'ফুট দূরে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'দুটো ছুঁচোকে দেখা যাচ্ছে,' বলল ও। 'কে আগে পয়সা বের করবে?'

আমাদের দিকে পালা করে চোখ বুলাল ও। ওর বন্ধুরা হেসে উঠল ওর কথা শুনে।

চোখের কোণে দেখলাম, রিচি প্যান্টের পকেট থেকে হাত বের করেছে। মুঠো পাকিয়ে হাতটা বাড়িয়ে ধরল বুলির উদ্দেশে। মুঠো খুলতেই হলদে-সবুজ এক তুলতুলে পিণ্ড উড়ে গিয়ে মেখে গেল বুলির মুখে। কালকে কিচেন কাউন্টারে ঠিক এ জিনিসই দেখেছিলাম আমি। রিচি এটা পেল কোথায়?

'আঘ!' চেঁচিয়ে উঠল বুলি। দু'হাতে মুখ ঢেকে পিণ্ডটা খসানোর চেষ্টা করছে। বন্ধুরা ওর দিকে এক ঝলক চেয়েই ঘুরে দৌড় দিল উল্টো পথে। রীতিমত যুদ্ধ করে অবশেষে পিণ্ডটা খসাতে পারল বুলি। মাটিতে ওটা ছুঁড়ে মারল ও, তারপর ঘুরেই দিল দৌড়।

'ও আর কখনও আমাদেরকে জ্বালাতে আসবে না,' বলল রিচি। ঝুঁকে পড়ে তুলে নিল পিণ্ডটা। চালান করে দিল পকেটে। 'চলো।'

ওর কথা আমার বিশ্বাস হলো না। বুলি এর বদলা না নিয়ে ছাড়বে না। আমার স্কুলে যাওয়া কাল থেকে বন্ধ। কে জানে, অন্য কোনও স্কুলে ভর্তি হতে হয় কিনা।

রিচিকে অনুসরণ করলাম। মাথায় খেলা করছে, বন্ধুদেরকে কীভাবে ব্যাখ্যা করব আজকের ঘটনাটা। আমাদের স্কুলে খবর খুব দ্রুত রটে যায়। বুলি নিশ্চয়ই বলবে রিচি ওর মুখে কোনও ধরনের আঠা ছুঁড়ে মেরেছিল।

রিচিকে এজন্য মার খেতে হবে ওর হাতে, এ কথাও বলতে ভুলবে না।

'তোমার চাচার সাথে দেখা করে গেলে কোনও অসুবিধা আছে?' আচমকা প্রশ্ন করল রিচি।

চমকে ঘুরে দাঁড়ালাম। আমরা চাচার অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে। রিচি চাচার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে কেন?

পাঁচ

'আমার মা নতুন বাড়িটা সম্পর্কে কিছু কথা জানতে বলেছে,' জানাল রিচি।

'ফোনে জেনে নিলে হত না? স্কুলে দেরি হয়ে যাবে তো।'

'আমাদের বাসায় এখনও টেলিফোন লাগেনি,' বলল রিচি। 'প্লিজ, কিশোর। এক মিনিট লাগবে। ব্যাপারটা খুবই জরুরী।'

'ঠিক আছে,' বললাম। ভিতরে ঢুকলাম আমরা।

চাচার সেক্রেটারি জানাল চাচা কামরায় আছে। চাচা বসে ছিল ডেস্কের পিছনে। আমাদেরকে দেখে হাত থেকে কাগজপত্র নামিয়ে রাখল।

'তোরা হঠাৎ? কী ব্যাপার বল।'

কেন এসেছি জানিয়ে বসে পড়লাম বড় চেয়ারটায়।

রিচি আমার পাশে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। একটা হাত তুলে আঙুল তাক করল চাচার উদ্দেশে। অবিশ্বাস্য কাণ্ড! আঙুলটা ওর ক্রমেই লম্বা হতে লাগল। ঠেকল গিয়ে চাচার গলায়। নড়তে পারছি না আমি। কী দেখছি এটা! চাচাও নড়াচড়া করছে না। হলদে-সবুজ আঙুলটা চাচার চিবুকে আঁচড় কেটে থেমে গেল। এবার সরে আসতে লাগল পিছন দিকে। চাচার চিবুকে এখন এক বিন্দু রক্ত।

চোখ পিটপিট করে রিচির দিকে চাইলাম। ওর আঙুলটা এখন স্বাভাবিক আকার ফিরে পেয়েছে। চাচার উদ্দেশে চেয়ে হাসছে ও।

'ধন্যবাদ, মিস্টার পাশা,' এমনভাবে বলল যেন অস্বাভাবিক কিছুই ঘটেনি। 'মা নিশ্চয়ই আপনাকে ধন্যবাদ জানাবে।'

চাচাকে কেমন জানি বিভ্রান্ত দেখাল। মাথা ঝাঁকিয়ে যেন চিন্তা-ভাবনাগুলোকে স্বচ্ছ করতে চাইল।

'এ আর এমন কী,' বিড়বিড় করে আওড়ে, ফোনের রিসিভার তুলে নেওয়ার জন্য ঘুরল। এবার ওটার দিকে চেয়ে বোধহয় অবাক হয়ে গেল

কেন তুলেছে, শেষমেশ আবার নামিয়ে রাখল।

'রাস্তায় একটা জিনিস ভুলে ফেলে এসেছি,' রিচি বলল আমাকে। 'স্কুলে তোমার সাথে দেখা হবে,' ঘুরে দাঁড়িয়ে হনহন করে বেরিয়ে গেল ও।

'কিছু বুঝলে?' প্রশ্ন করলাম চাচাকে। এখনও বিভ্রান্ত আর বিহ্বল দেখাচ্ছে তাকে।

'কী?'

'রিচির আঙুল কেমন লম্বা হয়ে গেল,' বললাম। 'ডেস্ক পেরিয়ে তোমার চিবুকে গিয়ে ঠেকেছিল। চামড়া ছিলে নিয়েছে। তুমি দেখনি?'

'অসম্ভব! হতেই পারে না,' বলল চাচা। চিবুকে আঙুল ছুঁইয়ে রক্তবিন্দুটা দেখল। 'তুই কী আবোল তাবোল বকছিস! শেভ করতে গিয়ে কখন কেটে গেছে কে জানে।'

'চাচা, তুমি আজ সকালে শেভ করেছ। রক্ত এতক্ষণে শুকিয়ে যাওয়ার কথা। তা ছাড়া আমি দেখেছি কাজটা রিচির।' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম।

'এসব তোর কল্পনা,' চাচা বলল। এসময় ফোন বাজলে ধরার জন্য ঘুরল।

তার মানে চাচাকে মোহাবিষ্ট করে কাজটা করেছে রিচি। চাচা যে জন্য কিছুই টের পায়নি। তাকে এখন বোঝাতে চেয়ে লাভ নেই। বুঝবে না। বিশ্বাস করবে না আমার কথা। ঠিক যেমন আমি গতকাল বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। অফিস ছেড়ে বেরিয়ে এলাম আমি।

স্কুলে সারাক্ষণ রিচির কথাই মাথার মধ্যে ঘুরল। একটার পর একটা প্রশ্ন খেলে গেল মনে। চাচার মুখে আঁচড় কাটল কেন ও? আমার আর চাচীর মুখ কাটল কীভাবে! রিচির আঙুল অমন লম্বা হলো কী করে? তুলতুলে পিণ্ডগুলো আসলে কী? রিচিরা কোথা থেকে এসেছে? এবং কেনই বা? রিচি ছেলেটা আসলে কে?

ব্যান্ড প্র্যাকটিসে মন দিতে পারলাম না। এতটাই খারাপ বাজালাম, মি. বেনসন আমাকে বাড়ি চলে যেতে বললেন। লকার থেকে বইয়ের ব্যাগ বের করে, দরজা লাগিয়ে তালা মেরে দিলাম।

দরজার উদ্দেশে পা বাড়িয়েছি, দেখতে পেলাম প্রিন্সিপালের অফিস থেকে বেরিয়ে এল বুলি। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। আজ সকালে রিচির সঙ্গে ওর যা হয়েছে, ও নিশ্চয়ই আমার উপর প্রতিশোধ নেবে। আমার দোষ, আমি ওখানে উপস্থিত ছিলাম। এ ছাড়া ও হয়তো রিচিকে আমার বন্ধু

ভেবেছে।

কিন্তু বুলি সে সব কিছুই করল না। আমার দিকে একবার চাইল, তারপর ঝট করে ঘুরে, উল্টো দিকে হাঁটা দিল শশব্যস্তে। ওর মুখের চেহারায় অদ্ভুত এক অভিব্যক্তি দেখেছি। মনে হচ্ছিল ও আমাকে দেখে ভয় পেয়েছে।

বিশ্বাস হতে চাইছে না আমার! রিচি ঠিকই বলেছিল। বুলি আমাদের কাউকে আর জ্বালাতন করতে আসবে না।

বাড়ি ফেরার পথে, রিচি আর ওর লম্বা আঙুলের কথা ঘুরপাক খেল মাথায়। ঠিক এ জিনিসই বেরিয়ে এসেছিল আমার টিভি থেকে, কিচেন কাউন্টারে এটাই দেখেছি আমি, এবং বুলির মুখে রিচি একই জিনিস ছুঁড়ে দিয়েছিল। এগুলোর মধ্যে কোনও না কোনও ভাবে পরস্পর সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু এগুলো আসলে কী? রকি বীচে এল কীভাবে?

রিচির বাসায় নিশ্চয়ই কোনও সূত্র পাওয়া যাবে। ঠিক করলাম, ওদের জানালা দিয়ে উঁকি দেব। দেখা যাক না, যদি কিছু জানা যায়।

বাসার কাছে এসে, বাঁয়ে মোড় নিয়ে রাস্তা পেরোলাম। রিচিদের বাসার সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম মিনিট খানেক। বাসায় কেউ আছে বলে মনে হলো না। ফাঁকা ড্রাইভওয়ে ধরে এগিয়ে, নিঃশব্দে বাড়ির পিছনদিকে চলে এলাম।

একতলার জানালাটা অনেক উঁচু। পায়ের পাতায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়েও কাজ হলো না। ব্যাকইয়ার্ডের চারধারে নজর বুললাম। ফেন্সের গায়ে ঠেস দিয়ে রাখা এক পুরানো বাক্স চোখে পড়ল। যখন বুঝলাম আমার ভার সইতে পারবে তখন বয়ে এনে দেয়ালের গায়ে ঠেকালাম। এবার উঠে দাঁড়ালাম ওটার উপর। জানালায় খড়খড়ি রয়েছে, তবে ভিতরটা দেখা যায়।

ফাঁকা এক কিচেন দেখতে পেলাম। ফাঁকা মানে একদম খালি! চেয়ার, টেবিল, ফ্রিজ কিচ্ছু নেই।

ঠিক এমনিসময় আমার পিছনে শুনতে পেলাম পায়ের আওয়াজ।

ছয়

পাঁই করে ঘুরে দাঁড়ালাম। আমার চাচীর মত উচ্চতার এক মহিলা। সোনালী চুল। তবে গায়ের চামড়া রিচির মতই রোগাটে। ইনি নিশ্চয়ই রিচির মা।

'ওহ্, আমি দুঃখিত,' তুতলে বললাম।

মহিলার কাছে ব্যাপারটা অস্বাভাবিক লেগেছে বলে মনে হলো না। চওড়া হাসলেন।

'তুমি নিশ্চয়ই রিচিকে খুঁজছ,' বললেন। 'ও ওর ঘরে আছে। ভিতরে এসো, দুধ আর কুকি খাও দু'জন মিলে।'

আমি ভিতরে যেতে চাই না। শুধু উঁকি মারতে চেয়েছিলাম।

হঠাৎই কেমন ভয়-ভয় করতে লাগল। মনে হলো ভয়ঙ্কর কিছু একটা আমার কপালে ঘটে যেতে পারে। এক দৌড়ে বাড়ি চলে যেতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু পারলাম না। কেউ–কিংবা কিছু একটা–আমাকে বাধ্য করল রিচির মাকে অনুসরণ করতে। আমাকে নিয়ে বাড়ির সামনের দিকে চলে এলেন তিনি। পা রাখলেন সিঁড়িতে।

দরজা খুলে গেলে তাঁকে অনুসরণ করে ভিতরে ঢুকলাম। ভদ্রমহিলা লিভিংরুমে দাঁড়িয়ে, রিচিকে নেমে আসতে বললেন গলা ছেড়ে।

'এখানে দাঁড়াও, ও এখুনি এসে পড়বে। দুধ আর কুকি আছে, নিয়ে নাও,' বললেন। এবার সিঁড়ির পিছনে, কিচেনে গিয়ে ঢুকলেন।

দুধ কোথায়, ভাবলাম। কিচেনে ফ্রিজ নেই। লিভিংরুমের দরজার পাশে ক্ল্যারিনেট আর বইয়ের ব্যাগ নামিয়ে রাখলাম। চারধারে দৃষ্টি বুলালাম। চাচার কথাই ঠিক। শুধু একটা টিভি সেট। টিভির উপরে, এক ট্রেতে শ্যাওলা-সবুজ কুকি আর যেন পিস্তাচিও সিরাপ গোলানো দু'গ্লাস দুধ। এবার সত্যি ভয় পেতে শুরু করেছি আমি। ভদ্রমহিলা জানলেন কীভাবে আমি যে আসছি?

সবকটা শেড নামানো। কামরাটা অন্ধকার। শিউরে উঠলাম। ঠাণ্ডা! লিভিংরুমের ভিতরে ছাতাপড়া গন্ধ। সারা বছর জানালা না খুললে যেমনটা হয় আরকী। মানুষ এরকম জায়গায় বাস করে কীভাবে? এসময় মনে পড়ল, রিচি বলেছিল অন্ধকার এক দেশে থাকত ওরা। মনে হচ্ছে ভুতুড়ে

কোনও গুহায় আটকা পড়েছি আমি। এখান থেকে শিগ্‌গির বেরিয়ে যেতে হবে।

মেঝে থেকে জিনিসপত্র তুলে নিতে ঝুঁকেছি, অমনি রিচি নেমে এল উপরতলা থেকে। দরজা আগলে দাঁড়াল।

'হাই, কিশোর,' বলল।

'ওহ...হাই,' বললাম। 'তোমার মা আমাকে ভিতরে নিয়ে এসেছেন।'

'তুমি আসাতে আমি খুব খুশি হয়েছি,' বলল ও। 'আমার কাছে কখনও কোনও বন্ধু আসেনি।'

একবার ভাবলাম যে বলি আমি ওর বন্ধু নই এবং আমি নিজে থেকে আসিনি, ওর মা নিয়ে এসেছেন। কিন্তু শেষমেশ চুপ করে থাকলাম। ছেলেটার আশ্চর্য ক্ষমতা রয়েছে। তার প্রমাণ তো ইতোমধ্যেই পেয়েছি। কী দরকার ওকে ঘাঁটানোর? শেষে হয়তো পকেট থেকে আঠাল পিণ্ড বের করে আমাকে জানেই মেরে ফেলবে।

কিন্তু আমার সটকাতে হবে এখান থেকে। ঘর ছাড়ার জন্য আড়াআড়ি এক পা এগোলাম।

'কে এসেছে?' লিভিংরুম থেকে ভেসে এল কার যেন গমগমে কণ্ঠস্বর। চরকির মত ঘুরে দাঁড়ালাম। টিভির সামনে এক লোক দাঁড়িয়ে। চাচার বয়সী। তবে গায়ের চামড়া হলদে-সবুজ। ঠিক রিচি আর ওর মার মতন।

লোকটা এল কোত্থেকে? আমি যখন ঘরে ঢুকি তখন কি লিভিংরুমের আঁধারে ঘাপটি মেরে বসে ছিল? নাকি এইমাত্র টিভির ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে?

রিচিকে অবশ্য এতটুকু চমকিত মনে হলো না।

'হাই, ড্যাড। এ আমার বন্ধু কিশোর। আমরা একই ক্লাসে পড়ি,' বলল ও।

রিচির বাবা এগিয়ে এলেন। হাত বাড়িয়ে দিলেন আমার উদ্দেশে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও হাত ঝাঁকিয়ে দিতে হলো আমার। রিচির মত এঁরও হাত ঠাণ্ডা আর স্যাতসেঁতে।

'ড্যাড আজই এসেছে,' জানাল রিচি।

'খুব ভাল লাগছে এসে,' জানালেন ভদ্রলোক।

রিচির মা এসময় ফিরে এসে যোগ দিলেন আমাদের সঙ্গে। টিভির উপরে রাখা ট্রেটা আঙুল-ইশারায় দেখালেন।

'দুধ আর কুকি খাচ্ছ না কেন? খাও।'

রিচি দুধের গ্লাস আর কুকির জন্য হাত বাড়াল। কুকিটা মুখে পুরে গিলে নিল ও। লম্বা এক ঢোকে সাবড়ে দিল অর্ধেক গ্লাস দুধ।

'ওয়াও! প্রিয় খাবার আমার,' বলে হাতের পিঠে মুখ মুছল। আমার দিকে চাইল। 'তুমি নেবে না?'

সবুজ ডিম খেয়ে পেট ব্যথা করার কথা মনে পড়ল। কে জানে, হয়তো এদের দুধ আর কুকি খেলেও একই দশা হবে। আমি আর ওই কষ্ট পেতে চাই না। মাথা নেড়ে ঝটপট বলে দিলাম, 'না। আজকে সকাল সকাল ডিনারে বসব আমরা। তখন খেতে না পারলে চাচী খুব রাগ করবে।'

'আমাদের ছোট ছেলেটা এখনও এসে পৌঁছয়নি,' বললেন রিচির মা। 'খুব চিন্তায় আছি আমরা।'

'কবে আসবে?' প্রশ্ন করলাম। খাওয়ার প্রসঙ্গটা পাল্টানোতে খুশি হলাম।

'এখনও জানি না,' বললেন রিচির বাবা।

'ও কি রিচির বড় না ছোট?'

'বড়,' জানালেন রিচির মা।

'ছোট,' একই সঙ্গে বললেন রিচির বাবা।

'বাচ্চা। তোমার ভাই ডনের বয়সী,' বলল রিচি।

ঠিক এসময় আমি পালানোর একটা পথ খুঁজে পেলাম।

'আমি এখন যাই। ডন সারাদিন একা থাকে কিনা, ওকে একটু সঙ্গ দেয়া দরকার,' বললাম। মুহূর্তের জন্য মনে হলো, আমাকে ওরা ছাড়বে না। কিন্তু কেউ আমাকে বাধা দিল না। মেঝে থেকে ক্ল্যারিনেট আর বইয়ের ব্যাগ তুলে নিলাম।

রিচি আমাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল।

'স্কুলে দেখা হবে,' বলল।

'আবার এসো কিন্তু,' পিছন থেকে চেঁচিয়ে বললেন রিচির মা।

রাস্তা পেরিয়ে বাসায় চলে এলাম। আজব পরিবার! রিচির বাবা-মা জানেন না ছেলের বয়স। রিচির ভাইটাও এদের মত বিচিত্র কিনা কে জানে। জানালা দিয়ে দেখলাম ব্যাকইয়ার্ডে ডনকে দোলনায় বসিয়ে ঠেলছে চাচী।

ডনের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম। কেন জানি মনে হচ্ছে রিচির ভাইয়ের সঙ্গে ওর কোনও ধরনের যোগসূত্র আছে।

ওরা চাচা, চাচী আর আমার কাছ থেকে রক্ত নিয়েছে। ওদের এখন

বাবা, মা আর আমার বয়সী এক ছেলে রয়েছে।

ওরা কি ডনকে এমন কিছু করবে যাতে ছোট ছেলেকে বাসায় নিয়ে আসতে পারে?

সাত

মুসাকে ফোন করলাম। ক্লাসে কী কী পড়িয়েছে জানিয়ে দিলাম। আর খুলে বললাম রিচির বাসার সব ঘটনা। ওর বাবা-মা নিজের ছেলের বয়স জানে না শুনে 'খাইছে!' বলে উঠল মুসা।

'আমার ধারণা ওরা ডনের কোনও ক্ষতি করবে, যাতে ছোট ছেলেটাকে নিয়ে আসতে পারে,' আমার সন্দেহের কথা বললাম।

'কেন বলছ এ কথা?'

'প্রথমে চাচীর কপালে আঁচড় পড়ল। তারপর টিভি থেকে পিণ্ডটা বেরিয়ে এসে আক্রমণ করল আমাকে। তার ঠিক পরপরই রিচি আর ওর মা বাড়িটা কিনে নিল চাচার কাছ থেকে।'

'তাতে কী?'

'এরপর রিচির আঙুল চাচার চিবুক থেকে চামড়া তুলে নিল। এবং তার পরই ওর বাবা হাজির হয়ে গেল বাড়িতে। এখন ওরা বলছে রিচির ছোট ভাই আসছে। রিচি ডনকে দেখে গেছে। তাই আমার মন বলছে ওরা ডনের সাথেও অস্বাভাবিক কিছু একটা করবে।'

আমরা দু'জনে আরও কিছুক্ষণ আলোচনা করলাম। কী ঘটতে পারে কল্পনা করতে চেয়ে ব্যর্থ হলাম।

'রবিনকে সব জানিয়ে রেখো,' বলে রিসিভার রেখে দিলাম।

বাকি দিনটুকু ভেবে ভেবে পার করলাম। কিন্তু কোনও কূল-কিনারা করতে পারলাম না।

পরদিন সকাল। নাস্তা করতে নীচে নেমে এলাম। বসে পড়লাম চাচার পাশে। ডনও রয়েছে।

চাচা খবরের কাগজটা নামিয়ে রেখে আমার দিকে চেয়ে মৃদু হাসল।

'কীরে, আজকের জন্যে নতুন কোন প্ল্যান-ট্ল্যান আছে নাকি?'

যদি বলি আজ আমার মূল কাজ হচ্ছে ডনের যেন কোনও ক্ষতি না হয়

সেদিকে লক্ষ রাখা, তবে চাচা মাথা-মুণ্ডু কিছুই বুঝবে না।

'তেমন কিছু না,' বললাম। 'আজকে বাড়িতেই থাকব।'

'তোর বন্ধু রিচির সাথে কোনও প্ল্যান করিসনি?' চাচা কফির কাপে চুমুক দিয়ে বলল।

মাথা নাড়লাম আমি।

'রিচি মোটেই আমার বন্ধু নয়, আর ওর সাথে আমার কোনও প্ল্যান জীবনেও হবে না!'

'ও কিন্তু তোকে কালকে ওই ছেলেগুলোর হাত থেকে বাঁচিয়েছে,' বলল চাচী। এক গ্লাস কমলার রস এনে রাখল টেবিলে। 'ওর মা আমাকে বলেছে।'

'কী হয়েছিল, কিশোর ভাই?' কৌতূহল প্রকাশ করল ডন। 'বলো না।'

'বলার মত কিছু না,' বললাম। রিচির মা নিশ্চয়ই চাচীকে বলেনি বুলিকে কীভাবে ভয় দেখিয়েছে তাঁর ছেলে, ভাবলাম। চাচীর দিকে চাইলাম। অদ্ভুত এক অভিব্যক্তি তার মুখের চেহারায়। চাচী হয়তো জানে, যেমন জানত আমার পেট ব্যথাটা চলে গেছে।

'আমি আজকে বাড়িতেই থাকব,' আবারও বললাম। চুমুক দিলাম কমলার রসে।

চাচা কফির কাপে আরেক চুমুক দিয়ে পিছনে চেয়ার সরাল।

'বাড়িগুলো বিক্রির ব্যবস্থা করতে হবে,' জানাল। চাচা শনি-রবিবারও কাজ করে। এ দুটো দিন অনেকে বাড়ির খোঁজে আসে।

'আজকে আমরা শপিং মলে যাচ্ছি ভুলে যেয়ো না,' বলে চাচাকে দরজা অবধি এগিয়ে দিতে গেল চাচী।

টিভি কাউন্টারের দিকে চোখ গেল আমার। শব্দ ছাড়া চলছে আজও। হঠাৎই ওটার সামনে, কাউন্টারে হলদে-সবুজ এক পিণ্ড দেখতে পেলাম। আমি জানি এটা সেদিনেরটা নয়। ওটা আমি স্কুল থেকে ফেরার আগেই উধাও হয়ে গিয়েছিল।

দু'মুহূর্ত পরে আবার তাকিয়ে দেখি পিণ্ডটা আগের জায়গায় নেই।

সরে গেছে।

আবার চাইলাম। আমার চোখের সামনে এগিয়ে গেল, শুঁড় বাড়িয়ে দিয়েছে অক্টোপাসের মত। ডন খাওয়ায় ব্যস্ত। লক্ষ করেনি। ও দেখুক সেটা চাইও না।

কাউন্টারের পাশ ঘেঁষে মেঝেতে নেমে এল ওটা। সোজা এগোচ্ছে হাইচেয়ারটার উদ্দেশে!

'আচমকাই উপলব্ধি করলাম, রিচির ভাই কীভাবে আসছে এখানে। এই পিণ্ডটা কোনওভাবে নিয়ে আসবে ওকে। অন্যান্য পিণ্ডগুলো যেভাবে রিচি আর ওর বাবা-মাকে এনেছে। কোন সন্দেহ নেই, রিচিরাই এটাকে পাঠিয়েছে আমাদের বাড়িতে। আর এটা এখানে পৌঁছেছে কাউন্টারে রাখা টিভিটার মাধ্যমে! এখন ওটা আসছে ডনকে লক্ষ্য করে।

মনে পড়ল টিভি থেকে বেরিয়ে পিণ্ডটা আমার গায়ে ওঠার পর কেমন লেগেছিল আমার। আমি চাই না ডনেরও একই অভিজ্ঞতা হোক। যে করে পারি ঠেকাতে হবে পিণ্ডটাকে।

চাচীর অ্যাপ্রন দিয়ে ওটাকে আঘাত করতে পারি। কিন্তু হাত উঠল না। চিৎকার করে চাচীকে ডাকব, কিন্তু মুখে রা ফুটল না। পিণ্ডটার দিকে চেয়ে রইলাম। দেখতে পেলাম মেঝের বুকে কিলবিল করে ক্রমেই ডনের দিকে এগিয়ে আসছে ওটা।

'কী হয়েছে, কিশোর ভাই, তোমাকে এমন দেখাচ্ছে কেন?' বলল ডন।

'কিছু না,' বললাম।

হলদে-সবুজ শুঁড় বাগিয়ে ডনের চেয়ারটা লক্ষ্য করে এগিয়ে আসছে পিণ্ডটা। মনে সাহস জড় করে, পাড়া দিয়ে ধরলাম ওটাকে। জুতোর তলায় পিষতেই 'হুশ' করে এক শব্দ উঠল।

'কী করছ, কিশোর ভাই?'

'পোকা মারছি,' জানালাম।

পিণ্ডটা তরল হয়ে ছড়িয়ে পড়ল আমার জুতো ঘিরে। এগোতেই লাগল।

বৃষ্টির পানির মধ্যে জুতো পরে হাঁটলে এরকম শব্দ হয়। আমি বুঝে গেছি পিণ্ডটা কী দিয়ে তৈরি—পানি।

'পেয়েছি,' মনে মনে বললাম। কী করে এগুলোকে ঠেকাতে হবে এখন জানি আমি।

আট

এক দৌড়ে সিঁড়ি ভেঙে উঠে গেলাম উপরের বাথরুমে। ডন আমার পিছু নিল। ব্লো ড্রায়ারটা খুলে নিয়ে তরতর করে নেমে এলাম নীচে। টিভির পাশের ইলেকট্রিকাল আউটলেটে প্লাগ ঢুকিয়ে চালু করে দিলাম। সবচেয়ে

গরম ধাপে সেট করেছি। পিণ্ডটার উদ্দেশে তাক করে ধরলাম গরম বাতাস।

নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেল ওটার। এপাশ-ওপাশ শরীর মোচড়াল, গরম বাতাস এড়ানোর জন্য। তারপর ধীরে ধীরে, ছোট হতে হতে মিলিয়ে গেল। কিচেনের মেঝেতে লেপ্টে রইল শুধু সবুজ এক দাগ।

'এগুলোর হাত থেকে বাঁচতে হলে আমাকে ডেকো,' ডনকে বললাম। 'আমি হলাম খুনে কিশোর।'

আমার কথা শুনে হেসে ফেলল ডন। ও তো জানে না পিণ্ডগুলো কত ভয়ঙ্কর। আমি অবশ্য বলে দিয়ে ওকে ভয় দেখাতে চাইলাম না।

হঠাৎ মনে হলো, রিচিরা আরও পিণ্ড পাঠাতে পারে। যাতে না পাঠায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। একটাই পথ আছে।

চাচী ইতোমধ্যে ফিরে এসেছে। একবার আমার, একবার ডনের আর একবার মেঝের দাগটার দিকে চাইল। তাকে এখনও ঘোরগ্রস্ত দেখাচ্ছে। মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে যেন বুঝতে পারছে না কোথায় রয়েছে। অনেকটা সেরকম–চাচাকে যেমন দেখেছি তার অফিসে। রিচির আঙুল স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার পরের কথা বলছি।

'কী হয়েছে?' চাচী প্রশ্ন করল অচেনা কণ্ঠে।

'পরে বলব,' বলে চাচীর পাশ কাটিয়ে চলে এলাম। 'মুসাকে ফোন করব।'

আমার রূম থেকে ফোনটা করতে হবে। আমি চাই না চাচী শুনে ফেলুক। বিশ্বাস তো করবে না। তাকে দোষ দেওয়া যায় না। আমাকে বললে আমিও করতাম না। কে কবে শুনেছে পানি ভরা কোনও পিণ্ড নড়াচড়া করতে পারে কিংবা কারও আঙুল লম্বা হয়ে যায়। এসব শুধু গল্প-উপন্যাসেই ঘটে। দুটো করে সিঁড়ি টপকে উঠে এলাম। ব্লো ড্রায়ারটা রেখে দিলাম বাথরুমে।

মুসা বাসাতেই ছিল।

'মার সাথে ঘর পরিষ্কার করছি,' জানাল। 'এক ঘণ্টার মধ্যেই হয়ে যাবে।'

আমার অতক্ষণ অপেক্ষা করার উপায় নেই।

'তোমাকে এখুনি আসতে হবে। কথা আছে। আমি রবিনকেও আনাচ্ছি।'

'মাকে জিজ্ঞেস করে দেখি,' বলল মুসা। 'একটু ধরো।' খানিক পরে ফিরে এল ফোনে। 'মা বলেছে লিভিং রূমটা হয়ে গেলেই ছেড়ে দেবে। তুমি ঠিক আছ তো?'

'না,' বললাম। 'অদ্ভুত কিছু একটা ঘটছে এখানে। তোমরা এলে সব জানাব। জলদি এসো!''

লাইন কেটে দিয়ে ফোন করলাম রবিনকে।

দশ মিনিটের মধ্যে চলে এল ওরা। বারান্দায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলাম ওদের জন্য।

'কী ব্যাপার?' বলে নথি বসে পড়ল সিঁড়ির সবচাইতে উঁচু ধাপে।

'রিচির বাসার কোনও এক মেম্বার আমার বাসায় একটা পিণ্ড চালান করেছে। কিচেনের টিভিটার মাধ্যমে,' বললাম। 'ওটা ডনকে আক্রমণ করতে চেয়েছিল। ওরা এভাবেই রিচির ভাইকে রকি বীচে নিয়ে আসতে চাইছে, ওদের অন্ধকার দেশ থেকে।'

'খাইছে! ডন ব্যথা পায়নি তো?'

'কাছে ঘেঁষতে দিলে তো,' জানালাম। 'জিনিসটা পানি দিয়ে তৈরি। ব্লো ড্রায়ার দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছি।'

'ওরা কি আবার চেষ্টা করবে?' নথির প্রশ্ন।

'আমার তাই ধারণা,' জানালাম। 'ওদেরকে থামাতে হবে। আমি আবার রিচিদের বাসায় গেলে হয়তো একটা না একটা উপায় বের করতে পারব।'

'খাইছে! তুমি আবার ওখানে যেতে চাও?'

'ভয় পাচ্ছি এটা ঠিক। কিন্তু আরও বেশি ভয় লাগছে ওরা যদি ডনের কোনও ক্ষতি করে দেয়। এর পরের বার হয়তো চরম আঘাত হানবে, এমনকী মেরেও ফেলতে পারে।'

'তা করবে না,' জোর দিয়ে বলল নথি। 'রকি বীচের মানুষ কেউ কাউকে খুন করে না।'

'ওরা সত্যিকারের মানুষ না!' বলে উঠলাম। 'সত্যিকারের মানুষদের গায়ের চামড়া ওরকম হলদে-সবুজ হয় না। পিণ্ডগুলো আর ওরা খুব সম্ভব একই জিনিস দিয়ে তৈরি।'

চুপ মেরে গেল দুই গোয়েন্দা।

শেষমেশ উঠে দাঁড়াল মুসা।

'আমরা তিনজন একসাথে যাব। তিনজনকেই তো আর ওরা মেরে ফেলতে পারবে না।'

রিচি ওর বাবা-মার সঙ্গে ব্যাকইয়ার্ডে, ঘাসের উপর বসে ছিল। মনে একটু স্বস্তি পেলাম। দিনের আলোয় আমাদেরকে নিশ্চয়ই টেনে-হিঁচড়ে

ঘরে নিয়ে যেতে পারবে না।

আমি স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করলাম।

'তোমার ভাই এসে পৌঁছেছে?'

মাথা নাড়ল রিচি।

'না, এখনও এসে পৌঁছতে পারেনি।'

অসহায় বোধ করলাম। এবার কী কথা বলব?

'কী, বলেছিলাম না?' ফিরতি পথে বন্ধুদের উদ্দেশে বললাম। 'প্রমাণ হয়ে গেল, ডনের মাধ্যমে ভাইকে এখানে আনতে চেয়েছিল ওরা। কিন্তু আমি পিণ্ডটাকে গায়েব করে দেয়ায় পারেনি।'

ডনের কিছু হয়নি এতেই আমার স্বস্তি। কিন্তু কেন জানি আমার মন বলছে, রিচি আর ওর উদ্ভট পরিবারের সঙ্গে আমার মোকাবেলার এখনও বাকি আছে।

ঠিকই ভেবেছিলাম আমি।

দু'সপ্তাহ পর, তিন বন্ধু ফিরছিলাম ব্যান্ড প্র্যাকটিস থেকে। রবিন এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে থেকে, বাজনা শুনে উৎসাহ জুগিয়েছে। কনসার্টের আগে, সিনিয়র সিটিযেন হলে এটাই ছিল আমাদের শেষ রিহার্সাল। পিছন থেকে রিচি ডাকছে শুনতে পেলাম।

'অ্যাই, কিশোর! অ্যাই, মুসা! অ্যাই, রবিন!'

আমরা থমকে দাঁড়িয়ে ঘুরে তাকালাম। একটু পরে, রিচি ওর বেহালা নিয়ে আমাদের নাগাল ধরল।

'সুখবর আছে,' বলল ও। 'আমার দাদা-দাদী আসছে।'

'কালকের কনসার্ট ওঁরা দেখতে পারবেন?' রবিন জিজ্ঞেস করল।

'না, তারা কনসার্ট শেষ না হলে আসতে পারবে না।'

হাঁটছি আমরা, মুখ বন্ধ। রিচির কথাটা নিয়ে উল্টেপাল্টে ভেবে দেখছি আমি। ওর দাদা-দাদী কনসার্ট শেষ না হলে আসতে পারবে না। আসবে না বলেনি, বলেছে আসতে পারবে না। যেভাবে ওর বাবা আসতে পারছিল না, যতক্ষণ না আমরা চাচার অফিসে যাই। টিভি থেকে বেরিয়ে পিণ্ডটা আমার উপর হামলা না করা পর্যন্ত রিচির দেখা মেলেনি। ওর ভাই আসতে পারছে না আমি পিণ্ডটার হাত থেকে ডনকে বাঁচিয়েছি বলে।

কনসার্টের রাতে, তিন বন্ধু একসঙ্গে সিনিয়র সিটিযেন সেন্টারে গেলাম।

'কনসার্টের সময় রিচির ওপর নজর রাখতে হবে,' বিল্ডিংটার কাছাকাছি পৌঁছে আমি বললাম।

'কাজটা সহজ হবে না,' বলল মুসা। 'আমাদেরকে তো মিস্টার বেনসনের ব্যাটনের দিকেও খেয়াল রাখতে হবে।'

'আমি চেষ্টা করব নজর রাখতে,' বলল রবিন। 'আমি তো শুধুই দর্শক।'

'কেন জানি মনে হচ্ছে,' নীচের ঠোঁটে চিমটি কেটে বললাম, 'আজকে কনসার্টে কিছু একটা ঘটবে। খুব খারাপ কিছু।'

নয়

লাইব্রেরির পাশে, মেইন স্ট্রীটে সিনিয়র সিটিযেন সেন্টার। পাথরে তৈরি নিচু এক বিল্ডিং। সামনে হুইলচেয়ার র‍্যাম্প রয়েছে। যাঁরা হাঁটতে পারেন না তাঁদের যাতে ভিতরে ঢুকতে অসুবিধা না হয়।

গেটের বাইরে তিন বন্ধু দাঁড়িয়ে ছিলাম। স্কুল বাস এসে থামল। মি. বেনসন মুসার ড্রামগুলো নামিয়ে দিলেন। আঁকাবাঁকা পথে কয়েকবার আসা-যাওয়া করতে হলো সব কটা ড্রাম ভিতরে নিয়ে যেতে। অন্যান্য ব্যান্ড সদস্যরাও যার যার যন্ত্রপাতি নিয়ে চলে এসেছে।

মিউযিক রুমে অর্ধবৃত্তাকারে আমাদের চেয়ারগুলো সাজানো হলো। এক কোণে এক পিয়ানো রয়েছে এবং অপর কোণে জায়গা ছাড়া হয়েছে মুসার ড্রামগুলোর জন্য।

এরপর দর্শকদের জন্য সারি বেঁধে চেয়ার সাজালাম আমরা। যে যার মত বসে ইন্সট্রুমেন্ট টিউন করছি, কামরাটা ভরে উঠতে লাগল ধীরে ধীরে।

দর্শকদের দিকে চাইলাম। দাদা-দাদীর ছড়াছড়ি।

সহসা উপলব্ধি করলাম, রিচি কেন বলেছিল কনসার্ট শেষ না হলে ওর দাদা-দাদী আসতে পারবেন না। তারমানে আঙুল লম্বা করতে যাচ্ছে ও! ঘুরে তাকালাম ওর দিকে। অনেক দূরে, স্ট্রিং সেকশনে বসে আছে ও। ওখান থেকে কিছু করা সম্ভব নয়।

সবাই কনসার্ট শুরুর জন্য যখন অপেক্ষা করছে, লম্বা এক মহিলা উঠে দাঁড়িয়ে হেঁটে এলেন কামরার সামনের দিকে। আমাদের দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন। তিনি এই সেন্টারের পরিচালিকা।

'আপনাদের সবাইকে স্বাগতম,' বললেন। 'বিরতির সময় আমাদের মেম্বাররা আপনাদেরকে পুরো সেন্টার ঘুরিয়ে দেখাবে।'

ব্যস, বুঝে গেলাম আমি রিচি কখন কাজে নামবে। ওকে ঠেকাতে হবে আমার। কিন্তু কীভাবে?

মি. বেনসন আমাদের সামনে, নিজের জায়গা নিলেন। তিনি ব্যাটন উঁচালে শুরু হয়ে গেল কনসার্ট।

বাজনায় মন দিতে পারলাম না আমি। মাথায় ঘুরছে শুধু রিচিকে ঠেকানোর চিন্তা।

এক সময় কনসার্টের প্রথম পর্ব শেষ হলো। আমার মাথায় তখনও কোনও বুদ্ধি আসেনি। আমরা উঠে দাঁড়িয়ে বাউ করলাম। দর্শকরা হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানালেন। এরই ফাঁকে মুসাকে ইশারা করলাম। হাততালি থামলে ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল।

'কী ব্যাপার!' ফিসফিস করে প্রশ্ন করল ও।

'শুধু আমার সাথে সাথে থেকো,' বললাম। 'বিরতির সময় কাজটা সারবে ও।'

সেন্টারের সদস্যরা আমাদেরকে ঘিরে ধরে দু'তিনটে দল তৈরি করল। এক খাটো, বয়স্কা মহিলা, মিসেস ক্যাম্পবেল আমাদের গাইড হলেন।

'তোমরা আমার সাথে এসো প্লিজ,' বললেন তিনি। ঘুরে দাঁড়িয়ে মিউযিক রুমের দরজার উদ্দেশে হাঁটা দিলেন। মুসা, রবিন আর আমি অনুসরণ করলাম। আমি থমকে দাঁড়িয়ে রিচির কব্জি চেপে ধরলাম। ওকে বললাম আমাদের সঙ্গে থাকতে। এতে করে ওর উপর চোখ রাখতে পারব।

মিউযিক রুম থেকে বেরিয়ে আলোকিত এক হলওয়েতে ঢুকলাম। দেয়ালগুলো ফ্রেমে বাঁধানো পেইন্টিং ও ফটোগ্রাফ দিয়ে সাজানো।

'এগুলো আমাদের মেম্বারদের কাজ,' জানালেন মিসেস ক্যাম্পবেল। 'কোনও কোনওটা পুরস্কারও জিতেছে।'

এরপর এক 'বিউটি সেলুন'-এ নিয়ে গেলেন আমাদেরকে। সদস্যদের কেউ কেউ নাকি যুবা বয়সে হেয়ারড্রেসার ছিলেন। এবার ঢুকলাম বিশাল এক কিচেনে। সদস্যদের অনেকে এখানে আসেন খাওয়া-দাওয়া করতে। অ্যাপ্‌ল্ পাইয়ের সুগন্ধে ম ম করছে রান্নাঘরটা। মুসা 'উলস' করে জিভে পানি টানল।

ঠিক এসময়, চোখের কোণে দেখতে পেলাম নড়ে উঠল রিচির বাহু। তারমানে এখুনি কাজটা করতে চলেছে ও! বাহু উঁচিয়েছে ছেলেটি। ওর লম্বা আঙুল এগোচ্ছে মিসেস ক্যাম্পবেলকে লক্ষ্য করে। ভদ্রমহিলার চোখজোড়া আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে গেল। বন্ধুদের দিকে চাইলাম। নড়তে ভুলে গেছে ওরা। একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে রিচির ক্রমবর্ধমান আঙুলের দিকে।

এক্ষুনি কিছু একটা করতে হবে আমাকে। মিসেস ক্যাম্পবেল বয়স্কা মহিলা। ভয় পেলে হার্ট অ্যাটাক হওয়া বিচিত্র নয়। আমি তা হতে দিতে পারি না। আমার পায়ের পাতায় দৃষ্টি স্থির করলাম আমি।

এক মুহূর্ত পরে আমার ডান পা আগে বাড়ল। অনুসরণ করল বাঁ পা। আমি মুক্ত। মুসা আর রবিন ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রয়েছে সামনের অবিশ্বাস্য দৃশ্যটার দিকে। ওদেরকে মোহগ্রস্ত করে রেখেছে রিচি। কাজেই মিসেস ক্যাম্পবেলকে বাঁচানোর দায়িত্ব আমাকেই নিতে হচ্ছে।

মাথায় খেলে গেল বিউটি সেলুনের কথা। মিসেস ক্যাম্পবেলকে বাঁচাতে যা দরকার তা আমি ওখানেই পাব। কিচেন থেকে ছুটে বেরোলাম। হল পেরিয়ে ঢুকে পড়লাম সেলুনের খোলা দরজা দিয়ে। কাউন্টারের উপরেই পেয়ে গেলাম জিনিসটা—ব্লো ড্রায়ার! ছোঁ মেরে ওটা তুলে নিয়ে দৌড়ে ফিরে এলাম কিচেনে।

এসে যখন পৌঁছলাম, রিচির আঙুল তখন মিসেস ক্যাম্পবেলের পা লক্ষ্য করে এগোচ্ছে। কিচেনের দেয়ালে ইলেকট্রিকাল আউটলেট খুঁজলাম মরিয়ার মত। খুঁজে পেয়ে, ব্লো ড্রায়ারটার প্লাগ ঢুকিয়ে ফুল ব্লাস্ট দিলাম।

'কী করছ তুমি, কিশোর?' চেঁচিয়ে উঠল রিচি। ওর আঙুল সঙ্কুচিত হয়ে সরু হয়ে গেল। 'আমার দরকার অল্প একটু চামড়া। ওঁর কোন ক্ষতি হবে না, কিন্তু মস্ত উপকার হবে আমার দাদা-দাদীর।'

এখন পরিষ্কার বুঝতে পারলাম, ডনের কাছ থেকে কী চেয়েছিল পিণ্ডটা; কেন চাচা, চাচী আর আমার মুখে আঁচড় কেটেছে। আমাদের কাছ থেকে খানিকটা করে চামড়া তুলে নিয়েছে। শিউরে উঠলাম। রিচিরা আসলে মানুষ নয়। পানি জাতীয় এক ধরনের তরল দিয়ে তৈরি ওদের দেহ। আমাদের চামড়া দরকার ওদের ছদ্মবেশ ধরার জন্য। ওরা কোন্ অন্ধকার দেশ থেকে এসেছে? নিশ্চয়ই এই পৃথিবীর কোনওখান থেকে নয়।

ব্লো ড্রায়ারের নয্‌ল্ তাক করে ধরলাম রিচির উদ্দেশে।

'না, কিশোর! প্লিজ!' আর্তনাদ ছাড়ল ও।

কিন্তু আমার উপায় নেই। গরম বাতাস চালু করতেই একটু একটু করে কুঁচকে মিলিয়ে গেল রিচি। মেঝেতে পড়ে রইল শুধু গোল এক দাগ—ওর চিহ্ন। ড্রায়ারটা বন্ধ করে দিলাম।

মুসা, রবিন আর মিসেস ক্যাম্পবেল এসময় মাথা ঝাঁকিয়ে চারধারে দৃষ্টি বুলাতে লাগলেন।

'ওহ, ডিয়ার,' বললেন ভদ্রমহিলা। 'কী যেন মনে করতে পারছি না।'

'কী হয়েছে, কিশোর?' প্রশ্ন করল রবিন।

'পরে বলব,' ফিসফিস করে বললাম।

'আমাদের সাথে আরেকটা ছেলে যে ছিল ও কোথায়?' মিসেস ক্যাম্পবেল জিজ্ঞেস করলেন।

'ওর জরুরী কাজ আছে। তাই চলে গেছে,' জানালাম।

'খাইছে!'

'ও সত্যিই চলে গেছে,' মিউযিক রূমে ফেরার পথে বন্ধুদের উদ্দেশে বললাম।

কেউ খেয়াল করল না, রিচি আমাদের সঙ্গে কনসার্টে যোগ দেয়নি। পরে, তিন বন্ধু একসঙ্গে বাড়ির পথে রওনা হলাম। ওদেরকে খুলে বললাম কিচেনের ঘটনা। জানালাম ব্লো ড্রায়ার অন করাতে কীভাবে উবে গেছে রিচি।

'এখন আর একটা মাত্র কাজ বাকি,' বললাম। 'রিচির বাবা-মার হাত থেকে রক্ষা পেতে হবে।'

পরস্পর মুখ তাকাতাকি করলাম আমরা।

দশ

'কাজটা না করে উপায় নেই,' বললাম ওদেরকে। 'নইলে এভাবে আরও লোক আনতেই থাকবে ওরা। আগে হোক পরে হোক, কেউ না কেউ গুরুতর জখম হবে, এমনকী মারাও পড়তে পারে।'

'খাইছে! কিন্তু এভাবে ব্লো ড্রায়ার দিয়ে তুমি মানুষকে উধাও করে দিতে পারো না।'

'রিচিকে তো দিলাম। তা ছাড়া ওরা তো আসলে রক্ত-মাংসের মানুষ না। মানুষের পোশাক পরা পানির তৈরি জীব। এটা তোমাদের মনে রাখতে হবে।'

'ঠিক আছে। চলো তবে। আমার ব্লো ড্রায়ারটাও নিয়ে নেব,' বলল মুসা। 'দু'জনে তা হলে এক সঙ্গে ওদের বিরুদ্ধে লড়তে পারব। একজন বেঁচে গিয়ে আমাদের ওপর চড়াও হতে পারবে না।'

বাহ, আরও ভাল হলো।

আমার বাড়িতে আগে গেলাম। চাচা-চাচী লিভিংরূমে টিভি দেখছিল। আমাদেরকে ঢুকতে দেখে মুখ তুলে চাইল।

'কনসার্ট কেমন হলো?' চাচী জিজ্ঞেস করল।

'দারুণ!' বলে রবিনের দিকে চাইলাম। 'তুমি কনসার্টের কথা বলো, আমি ওপর থেকে এখুনি আসছি।'

'ঠিক আছে,' বলে চাচীর পাশে বসল রবিন আর মুসা। 'সিনিয়র সিটিযেনরা খুব খুশি হয়েছেন।'

আমি দুটো করে ধাপ টপকে উঠে এলাম উপরে। বাথরুম থেকে তুলে নিলাম ব্লো ড্রায়ারটা। জিনিসটা কোমরে গুঁজলাম। পকেটে ঢুকালাম কর্ড। খুনে কিশোর এখন তৈরি!

আমাকে নামতে দেখে উঠে দাঁড়াল বন্ধুরা।

'আমি একটু মুসার বাসায় যাচ্ছি,' চাচা, চাচীর উদ্দেশে বললাম।

'দেরি করিস না,' বলল চাচী। চাচা হাত নেড়ে আবার মন দিল টিভিতে।

'ঠিক আছে,' বলে, তাড়া দিয়ে বন্ধুদের নিয়ে বাসা ছাড়লাম। এক দৌড়ে মুসার বাসায় চলে এলাম আমরা। আন্টি, মানে মুসার মা সিনেমা দেখতে গেছেন এক বান্ধবীর সঙ্গে। ফলে কোথায় যাচ্ছি বলার প্রয়োজন পড়ল না। এবার সোজা রিচির বাসা। সদর দরজায় টোকা দিলাম।

সাড়া দিলেন রিচির মা।

'রিচি এখনও কনসার্ট থেকে ফেরেনি,' বললেন। 'এসো, ভেতরে এসো।'

আমাদেরকে লিভিংরুমে নিয়ে এলেন। টিভি সেটটা ছাড়া এ ঘরে আজও কোনও আসবাবপত্র দেখলাম না। রিচির বাবা দাঁড়িয়ে ছিলেন টিভির সামনে।

'তোমাদেরকে দেখে খুশি হলাম,' বললেন। এবার তাঁর দৃষ্টি পড়ল ব্লো ড্রায়ারের দিকে। আমার জিন্সের পকেট থেকে বেরিয়ে আছে। 'তোমার পকেটে ওটা কী?'

চোখ নামালাম আমি। উনি জিনিসটা চেনেন না এটা হতে পারে? আমি ওটা এক টানে বের করে তাঁর উদ্দেশে তাক করে ধরলাম। যা ভেবেছিলাম কাজটা তার চাইতে সহজই হবে মনে হচ্ছে।

'এটা হলো ব্লো ড্রায়ার,' বললাম। 'এটা থেকে গরম বাতাস বেরিয়ে এসে চোখের পলকে চুল শুকিয়ে দেয়।'

'কিংবা নেল পালিশ করার পর নখ,' বলল নথি।

'কীভাবে কাজ করে দেখবেন?' বলে ইলেকট্রিকাল আউটলেটের জন্য চারধারে চোখ বুলালাম। আমাকে অনুসরণ করে সবাই চলে এল ঘরের

কোণে। মেঝের একটু উপরে আউটলেট খুঁজে পেলাম। ঝুঁকে পড়ে ড্রায়ারটার প্লাগ ঢুকালাম। মুসাও ওরটার প্লাগ ঢুকাল।

'রেডি?' প্রশ্ন করলাম মুসাকে। ও মাথা ঝাঁকাল। 'তিন বলার সাথে সাথে অন করে দেব আমরা। এক...দুই...তিন!'

দু'জনেই একসঙ্গে বোতাম টিপে দিলাম। একজোড়া নযল্ দিয়ে দমকা হাওয়ার মত বেরিয়ে এল গরম বাতাস। একই সময়ে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানল ও দুটো।

রিচির মা সঙ্কুচিত হতে শুরু করতেই চেঁচিয়ে উঠলেন, 'প্লিজ, আমাদেরকে ছেড়ে দাও। আমরা কারও ক্ষতি করতে আসিনি।'

'আমরা চেয়েছিলাম শুধু রোদের তাপ উপভোগ করতে,' আর্তস্বরে বললেন রিচির বাবা। প্রায় অর্ধেক হয়ে গেছেন তিনি। 'মাটির তলায়, আমাদের পৃথিবীটা ভীষণ ঠাণ্ডা আর স্যাঁতসেঁতে।'

'আমরা মানুষের কাছ থেকে অল্প একটু চামড়া নিয়েছি শুধু,' রিচির মা চেঁচালেন। 'নিজেদের পরিচয় গোপন করার জন্যে মানুষের মত সেজে থেকেছি। তোমাদের সামান্য চামড়াকে আমরা নিজেরাই বাড়িয়ে নিয়ে শরীর ঢেকেছি।'

'এখানে এলেন কীভাবে?' নথির প্রশ্ন।

'টিভির মধ্যে দিয়ে,' রিচির বাবার জবাব। 'আমরা যেখানে থাকি তার সাথে এর সরাসরি রাস্তা আছে।'

মিনিট খানেক পরে, হলদে-সবুজ দুটো দাগ কেবল লেপ্টে রইল মেঝেতে। মুসা আর আমি ড্রায়ার অফ করে, প্লাগ বের করে নিলাম সকেট থেকে।

এরপর তিন বন্ধু ঘর ত্যাগ করে দরজা ভেজিয়ে দিলাম। পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করলাম আমরা। ঠিক খুশি নই কেউই, তবে স্বস্তিবোধ করছি।

দু'দিন পর। মুসা একটু সকাল সকাল আমার বাসায় এসে হাজির। আমার নাস্তা খাওয়া তখনও শেষ হয়নি। চাচা কফির কাপে চুমুক দিচ্ছিল। চাচী মুসাকে এক বাটি সিরিয়াল দিল।

চাচা খবরের কাগজ নামিয়ে রাখল।

'জানিস, কালকে না অদ্ভুত এক ঘটনা ঘটেছে। রিচিদের বাসার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। ভাবলাম একবার ঢুঁ মেরে যাই।' সরাসরি আমার দিকে চাইল চাচা। 'কিন্তু কাউকে পেলাম না। পুরো বাড়ি খাঁ-খাঁ করছে। এমনকী টিভিটাও নেই। দেখে মনে হলো স্রেফ হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে গোটা পরিবারটা।'

চাচী এসময় টেবিলে এসে বসল।

'রিচিকে ইদানীং দেখেছিস?' আমাকে প্রশ্ন করল।

আমি আর মুসা মুখ চাওয়াচাওয়ি করে মাথা নাড়লাম।

কত সহজেই না আমরা উদ্ভট ঘটনাটা ভুলে যেতে বসেছি। রিচি, ওর অদ্ভুত হলদে-সবুজ চামড়া, ওর বাবা-মা, ফাঁকা বাড়ি, যেখানে একটা টিভি ছাড়া আর কিছু নেই–ইতোমধ্যেই আমাদের স্মৃতিতে ম্লান হয়ে যেতে শুরু করেছে।

'আমার মনে হয় ও যেখান থেকে এসেছিল সেখানেই ফিরে গেছে,' বললাম। 'অন্ধকার, বহু দূরের কোনও দেশে।'

***

আলোচনা

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা, এই বিভাগে রহস্যসংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত, কোনও রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারো।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবে। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবে না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবে।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবে: স্থান সঙ্কুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, ঠিকানা অসম্পূর্ণ বা বিষয়বস্তু পুরনো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা দিয়ে বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবে না। ঠিক আছে? —কা. আ. হোসেন।

মোঃ রফিকুল ইসলাম (রফিক)

ছোলনা, পো: বোয়ালমারী, জে: ফরিদপুর। মোবা: ০১৭১৯-০৬৯৭২৭।

আমি তিন গোয়েন্দা সিরিজের একজন ভক্ত। হে...হে...কিন্তু অন্ধ ভক্ত নই। তিন গোয়েন্দার সঙ্গে আমার পরিচয় '০৭ সনের প্রথম দিকে। ইতিমধ্যে ৫৬টি হজম করেছি। মুসা চরিত্রটি আমার খু-উ-ব ভাল লাগে। বিদায়, মুসা! উপহার দেবার জন্য নওয়াব ভাইকে অসংখ্য ধন্যবাদসহ শুভেচ্ছা।

★ ধন্যবাদ পৌঁছে গৈল।

সৌরভ

১৩/২ আওরঙ্গজেব রোড, মোহম্মদপুর, ঢাকা ১২০৭।

হ্যালো, কাজীদা, আমাকে মনে আছে? আমি খুলনার সেই সৌরভ। ওই যে, আপনাকে বাঁচানোর দায়িত্ব নিয়ে সঞ্চিতা আপু, সিলভিয়া আপুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলাম। এবার কিন্তু আমি টুনি আপুর বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণা করব। কেন আপু? তিন গোয়েন্দাকে আমরা সবাই খুবই ভালবাসি, তবে অন্যান্য আপুদের নিরাশ করে তুমি একাই তিনজনকে বগলদাবা করবে, বা তো হতে পারে না। তুমিই বলো, এটা কি অবিচার নয়?

ভলিউম-৯১ অসম্ভব সুন্দর হয়েছে। নওয়াবদাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, আমাদের এত সুন্দর তিনটি গল্প উপহার দেয়ার জন্য। তবে প্রচ্ছদের শ্রীমুখটা এত মায়াময় যে, যতবারই দেখছি ততবারই স্নায়ু একদম ফ্রিজ হয়ে যাচ্ছে।

কাজীদা, অনেকদিন হলো জিনা আর রাফিয়ানকে খুব মিস্ করছি। ঝামেলা আর টিটুকেও তো দেখছি না। প্লিজ, নওয়াবদা, ওদের ভুলে যাবেন না, তিন গোয়েন্দার নতুন ও পুরাতন সব চরিত্রকেই আমরা অনেক ভালবাসি।

পরিশেষে কাজীদা, নওয়াবদা, তিন গোয়েন্দা এবং তিন গোয়েন্দার সকল পাঠক পাঠিকাকে আমার বাসায় 'চিকেন সুপ' এবং 'মোসাকা' খাওয়ার দাওয়াত রইল আসার আগে শুধু একটা ফোন দিবেন। ও হো নাম্বার তো দেয়া হয়নি। থাক গোয়েন্দাগিরি করে বের করে নেবেন। 'মোসাকা' কি সেটা কিমকে জিজ্ঞেস করবেন। ওই আমাকে শিখিয়েছে কিনা!

★ তোমার পরিশেষের রহস্যময় কথাবার্তা আমার একটুও পছন্দ হলো না—মনে হলো ফাঁকি দেওয়ার তালে আছো।

রজত দাশ গুপ্ত

দ্বাদশ শ্রেণী, ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ।

তিন গোয়েন্দার সাথে আমার পরিচয় ছোট বেলায়। সেই দুই বন্ধু অভিষেক ঘোষ শান্ত আর জেনিথ বিশ্বাস শশী আমাকে এই রত্নের সন্ধান দিয়েছিল তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কাজীদা, তিন গোয়েন্দা আমার জীবনের সাথে এখন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে। শত-সহস্র চেষ্টা করলেও এই বন্ধন সহজে ছিন্ন হওয়ার নয়। এই বন্ধন আবেগের বন্ধন, ভালবাসার বন্ধন, শৈশবকে মনে পড়ার বন্ধন। শামসুদ্দীন নওয়াবদা আর রকিবদার হাতের মোহনী শক্তি শত সহস্র কিশোর-কিশোরীকে আকৃষ্ট করে চলেছে সেই ১৯৮৫ সাল থেকে। ভলিউম-৯১-তে আপনি যে কথা বলেছিলেন যে, আপনার দোয়া সর্বদা আমার সাথে থাকবে এই কথাটি আমাকে দিয়েছে নব আলোর দিশা। হারানো আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়ে নতুন উদ্যমে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছি আমি। কিন্তু একটা ব্যাপারে অনুযোগ না করে পারছি না। ভলিউমে যে আনকোরা নতুন গল্প যাচ্ছে তা আবারও হরর বা আধিভৌতিক হলে কি ভাল লাগে? তা যদি হয় বনদস্যুর কবলে, নির্জন উপত্যকা কিংবা চ্যাম্পিয়ান গোয়েন্দার মত অসাধারণ গোয়েন্দা গল্প, তা হলে পাঠক খুশি হবে। গোয়েন্দা সিরিজ যদি অন্যদিকে সর্বদা Divert হয়ে যায় তা হলে তা নিশ্চয়ই সুখের বিষয় নয়, বিষয়টি ভেবে দেখবেন।

★ ভেবে দেখলাম, কিন্তু তোমার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। সিরিজের নাম 'তিন গোয়েন্দা' —তাই বলে ওতে গোয়েন্দা ছাড়া আর কোনও গল্প থাকতে পারবে না কেন? কিশোর-মুসা-রবিন কি রোমহর্ষক অভিযান, অ্যাডভেঞ্চার, শিকার, বিভীষিকা, এস-এফ, হরর ইত্যাদি রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত থাকবে? এসব ডাইভার্শন তোমার ভাল লাগে না, বুঝলাম, কিন্তু অনেক পাঠকই তো ওইসবের জন্য অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানাচ্ছে লেখককে।

অর্পণ দাশ গুপ্ত

শ্যামলী, ঢাকা।

এইমাত্র ভলিউম-৯১ পড়লাম। খুব ভাল লাগল এ সংখ্যায় আমার চিঠি দেখে। 'ভ্যাম্পায়ারের ছায়া' নামক নওয়াবদার কোন বই পড়েছি বলে মনে হলো না। বইটি কি আনকোরা নতুন? ভুতুড়ে বাড়ির মত ভাল হরর বই পেয়ে আনন্দিত হলাম।

★ তুমি আনন্দিত হলে, কিন্তু তোমারই ভাই তাতে খুশি নয়।—হ্যাঁ ওটা

আনকোরা নতুন।

তাসনুভা ফাতেমা রেশমী

হালিশহর, চট্টগ্রাম। মেইল: Reshmi367@yahoo.com

এইমাত্র ভলিউম-৯০ শেষ করলাম, অসাধারণ। কাজীদা আমার পক্ষ থেকে নওয়াবদাকে পৃথিবী সমান ধন্যবাদ। 'সাগরে শঙ্কা'-র কাহিনিটা অসাধারণ সুন্দর হয়েছে। এ ছাড়া ভলিউম-৮৭-র 'মমি রহস্য'টাও।

আর একটা কথা, কাজীদা, দুইটা ভলিউম প্রকাশে সময়ের দৈর্ঘ্য কিছুটা কমানো যায় না?

ভাল থাকবেন। আর আমি মেইল ফ্রেন্ডে আগ্রহী। আশা করি, সেবার মাধ্যমে আমি কয়েকজন ভাল মেইল ফ্রেন্ড পাব। কাজীদা, কী বলেন?

★ তুমি কোন্‌টা চাও, তা না জেনে তো কোনও মন্তব্য করতে পারছি না, ভাই। আগে আমার জানতে হবে মেইল ফ্রেন্ড বলতে তুমি কী বোঝাচ্ছ: এমএআইএল, নাকি এমএএলই?

জান্নাতুল ফেরদাউস (সাথিয়া)

দ্বীপাঞ্চল ম্যানশন, পুরান যুগীর ঘোল, কাঁঠালী রোড, ভোলা।

মোবা: ০১৭১৫-১৯৯২১৪।

কাজী দাদু, সালাম নেবে। নিশ্চয়ই ভাল আছ। এটা তোমার কাছে আমার ২য় চিঠি। ১মটার খবর জানি না। ভলিউম ৯০-তে রনি প্রস্তাব দিয়েছিল তিন গোয়েন্দা পাঠক/পাঠিকাদের মিলনমেলা আয়োজন করার ব্যাপারে। তুমি বললে, তোমার দ্বারা এ কাজ সম্ভব নয়। কেন? আরে বাবা, আমরা আছি না! কাজী দাদু, এগিয়ে চলো, আমরা আছি, তোমার সাথে। তোমার ভয় পাওয়ার কিচ্ছু নেই। এবার তিন গোয়েন্দা পাঠক/পাঠিকাদের জন্য কয়েকটি প্রশ্ন:

১. কোন বইয়ে প্রথম কিশোরের সাথে রবিন, মুসা ও ফারিহার পরিচয় হয়?

২. কোন বইয়ে তিন গোয়েন্দা 'আলবার্তোর হীরা' উদ্ধার করে?

৩. মেরি চাচীর পুরো নাম কী?

৪. কোন বইয়ে লাতু মিয়ার সাথে তিন গোয়েন্দার পরিচয় হয়?'

★ তোমরা আছো জেনে খুবই ভাল লাগল। কিন্তু আমি তো রাজনীতি করি না, দাদু, যে ওভাবে স্লোগান দিয়ে আমাকে রাস্তায় নামাতে পারবে। কারণ, আমার ভাল করেই জানা আছে, লাঠি হাতে পুলিশ দেখলেই তোমরা মুহূর্তে হাওয়া হয়ে যাবে—সব মার পড়বে আমার পিঠে।

শতাব্দী ভট্টাচার্য তমা

সুরমা ৩৮, ষোলোঘর, সুনামগঞ্জ।

শ্রদ্ধেয় কাজীদা, প্রথমেই জ্যোৎস্না রাতের কোমল আলোয় ফোটা হাসনাহেনার শুভেচ্ছা নেবেন। আপনারা ভাল থাকলেও আমি খুব একটা ভাল নেই। কারণ, এখনকার নতুন বইগুলোতে কিশোরের ভূমিকাই বেশি। আমার যা মত, তা হচ্ছে: তিন গোয়েন্দা পরস্পরের পরিপূরক। রবিন, মুসা ছাড়া কিশোর অচল। মুসার ভূতের ভয়টা

আরও বাড়ানো দরকার এবং 'খাইছে' বলাটা আরও বেশি হলে ভাল হয়। রবিনকে আবার লাইব্রেরিতে দেখতে চাই। সবার মত আমিও চাই, জিনা ও রাফিয়ান তিন গোয়েন্দার সাথে শীঘ্রিই বাংলাদেশে আসুক। তা ছাড়া, জিনা ও রাফিয়ানের সাথে তিন গোয়েন্দা রহস্য সমাধানে গোবেল বীচে যাক। 'নির্জন উপত্যকা' ভাল, শ্যারনকেও ভাল লাগছে। আমি অষ্টম শ্রেণীতে উঠেছি। এ বছর বৃত্তি দেব, তাই আমি আপনাদের আশীর্বাদ প্রার্থী।

এখন কুইজঃ

দেখা যাক, কয়জন উত্তর দিতে পারে। তাই উত্তর পাঠালাম না।

☆ উত্তর পাঠাওনি বলে তোমার কুইজগুলো ছাপা গেল না। ...জোরালো ভঙ্গিতে তোমার মতামত জানিয়েছ, এজন্যে তোমাকে ধন্যবাদ। ...নিশ্চয়ই, আশীর্বাদ রইল—বৃত্তি পেয়ে মা-বাবা ও স্কুলের মুখ উজ্জ্বল করো।

মিজান

বি.পি.এল. সিলেট।

কাজী আঙ্কেল, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আল্লাহর রহমতে নিশ্চয় ভাল আছেন। আমি সেবা প্রকাশনী ও তিন গোয়েন্দার অতি ক্ষুদ্র পাঠক, কিন্তু দারুণ ভক্ত। তিন গোয়েন্দার 'কালোপর্দার অন্তরালে' বইয়ের প্রচ্ছদ ও পিছনের কাহিনি পড়ে সেই যে ভাল লেগেছে তা এখনও প্রতিনিয়ত উত্তরোত্তর বাড়ছে। ধীরে ধীরে সেবার সকল বই পড়লেও তিন গোয়েন্দাই আমার ফেভারিট। তা ছাড়া বইয়ে গল্পের সাথে পাঠকদের চিঠি পড়েও ভাল লাগে। এই তো, তিন গোয়েন্দা ভলিউম ৮৬ পড়লাম, হেভি মজা লেগেছে। 'পাহাড়ে বন্দি', 'বারমুডা অভিযান', 'রহস্যের হাতছানি' বইগুলো খুব ভাল হয়েছে। তা ছাড়া আলোচনা বিভাগে সিঁথি, দিশী, রিফাত, জোবায়ের সবার চিঠি আর আমাদের সিলেটের জয়-এর 'আদর্শ ছেলে' কবিতাটি অসাধারণ হয়েছে। নুসরাত জেবিন ইলু-র সুন্দর একটি ধাঁধার সুন্দর উত্তর হচ্ছে 'মানুষ'। যারা শিশুকালে হাত-পা সহ চারপায়ে খেলে, যৌবনে দুপায়ে চলে আর বৃদ্ধ কালে লাঠির সাহায্যে তিন পায়ে চলে।

কাজী আঙ্কেল, আমি এবার জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ থেকে H.S.C পরীক্ষার্থী। আমার জন্য দোয়া করবেন। সবাইকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা।

☆ তোমাকেও। ...দোয়া রইল।

মোঃ এনামুল হক (সোহাগ)

চট্টগ্রাম।

তিন গোয়েন্দার মত অসাধারণ কিশোর থ্রিলার উপহার দেওয়ার জন্য প্রথমে রকিব মামা ও নওয়াব মামাকে জানাই হাজার হাজার ধন্যবাদ এবং ধন্যবাদ সেবা প্রকাশনীকে। আমি তিন গোয়েন্দার একজন অসাধারণ ভক্ত। অনেক দিন ধরে আমি এই বই পড়ি। আজকেই শেষ করলাম ভলিউম-৮৬। পড়ে খুবই মজা পেয়েছি। সত্যিটা হচ্ছে, তিন গোয়েন্দার প্রতিটি ভলিউম আমার খুব ভাল লাগে। তিন গোয়েন্দা,

রূপালী মাকড়সা, পাহাড়ে বন্দি ইত্যাদি গল্পগুলো পড়ে আমি সবচেয়ে বেশি মজা পেয়েছি। আমি যখন এই বই পড়ি তখন মনে হয় রবিন, মুসা, কিশোরের সাথে আমিও আছি। আমার তো মনে হয় সমস্ত ঘটনা আমার সামনেই ঘটছে। একেবারে চোখে ভাসে। রবিন, মুসা, কিশোরকে আমার খুবই ভাল লাগে। বিশেষ করে কিশোরকে।

আজ আর না, সবশেষে তিন গোয়েন্দা পাঠক-পাঠিকাদের জন্য রইল আমার প্রাণঢালা শুভেচ্ছা। আরেকটা কথা, আমাদের তিন গোয়েন্দা কখনও যেন থেমে না যায়, এবং প্রতি মাসে যেন নতুন বই পাই।

☆ তোমার শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ পৌঁছে গেল।...তোমার জন্যেও শুভেচ্ছা রইল।

চন্দ্র শেখর

১২৫/৩ পশ্চিম রামপুরা, ঢাকা ১২১৯।

শ্রদ্ধেয় কাজী আঙ্কেল, এই প্রথম আমি তিন গোয়েন্দার আলোচনা বিভাগে লিখছি। অন্য সব গল্পের চেয়ে তিন গোয়েন্দা আমার অনেক প্রিয়। আমার ভাই, উৎপল সে-ও বলতে গেলে তিন গোয়েন্দার পাগল। আর আমি তিন গোয়েন্দার বই হাতে পেলে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাই। রকিব হাসান এবং শামসুদ্দীন নওয়াব আঙ্কেলকে আমার অন্তর থেকে অভিনন্দন এ রকম একটি কিশোর থ্রিলার বের করার জন্য। এই প্রশংসার দাবীদার সেবা প্রকাশনীও। যা হোক, কাজী আঙ্কেলের কাছে আমার প্রশ্ন: 'নির্জন উপত্যকা', ও 'ঘোড়াচোর কিশোর' ভলিউম আকারে কবে বের হবে? কত নম্বর ভলিউমে? আশা করি প্রশ্নের উত্তর পাব। কিশোরকে রহস্যময় শুভেচ্ছা, রবিনকে হাজার হাজার বইয়ের অভিনন্দন এবং মুসাকে ভূতের ভয় সহ ১০০% বিশুদ্ধ বাঙ্গালী খাবারের শুভেচ্ছা। শুভেচ্ছা তি.গো. সকল পাঠক-পাঠিকাকে।

☆ তোমার তিন গোয়েন্দা সংক্রান্ত মূল্যায়ন, আন্তরিক অভিনন্দন ও অসংখ্য শুভেচ্ছা জায়গামত পৌঁছে গেল। এবার আমার একটি প্রশ্নের উত্তর দাও দেখি। তুমি জানতে চেয়েছ: 'নির্জন উপত্যকা' ও 'ঘোড়াচোর কিশোর' ভলিউম আকারে কবে বের হবে, কত নম্বর ভলিউমে। কেন জানতে চাও, বলো তো। তুমি কি ওই বই দুটি পড়নি? নাম তো জানো, পড়নি কেন? শেষ হয়ে যাওয়ায় সংগ্রহ করতে পারনি দোকান থেকে? নাকি নতুন বই না কিনে ভলিউমের আশায় অপেক্ষা করতে করতে ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছ বলেই এ প্রশ্ন?

উত্তর জানার পর তোমার প্রশ্নের জবাব দেব।

মোঃ আফজাল হোসেন

ভাঠাটিকর-১৭, টিলাগড়, সিলেট।

তিন গোয়েন্দা ভলিউম ৮৭, ৮৬, ৮৫, ৮৪ বইগুলো ধারাবাহিক ভাবে পড়লাম। ভলিউমগুলোর নতুন গল্প: তালিকারহস্য, ভাইরাসআতঙ্ক, রহস্যের হাতছানি, সেরা গোয়েন্দা, শুঁটকি রাজকুমার, বিষাক্ত ছোবল গল্পগুলো ভলিউমের প্রতি আকর্ষণটা ধরে রাখতে সাহায্য করছে। নওয়াবদা'কে এজন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আশা করি নওয়াবদা এখন বিশাল প্রেক্ষাপটের উপর তিন গোয়েন্দা বই লিখতে উৎসাহিত হবেন।

আর হ্যাঁ, কাজীদা, 'মহাভারত অশুদ্ধ' হয়ে যাওয়া পাঠক/লেখক অর্পণ দাশ গুপ্ত বা তার মত আরও যাদের লেখা নকল হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে বা হতে পারে তাদের বিষয়ে আপনাদের সিদ্ধান্ত কী, সেটা কি তিন গোয়েন্দার পাঠক/লেখকদের জানাবেন? সেবা'র সবাইকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা।

★ তুমি কি চাইছ ওদেরকে শাস্তি দিই, ওদের কোনও লেখা আর না ছাপি? আমার দৃষ্টিভঙ্গি একটু ভিন্ন। অন্যের লেখা চুরি করে নিজের নামে ছেপে ওরা অন্যায় করেছে ঠিকই, কিন্তু ব্যাপারটা প্রকাশ হয়ে যাওয়ায় শাস্তি কি ওদের হয়নি? সবার প্রশংসা কুড়াতে চেয়েছিল, কিন্তু ধরা পড়ে গিয়ে তার বদলে চরম লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে গেছে ওদের। তিন গোয়েন্দার প্রতিটি পাঠক ধিক্কার দিয়েছে, মুখ টিপে হেসেছে —সেটা কি ওদের গায়ে বেঁধেনি? একজন তো ক্ষমা-টমা চেয়ে ভাল হয়ে যাওয়ার শপথ নিয়ে পরিষ্কার হয়ে গেছে। অপরজনও নিশ্চয়ই সাবধান হয়ে গেছে—অন্তত, আমি তাই আশা করি।

মির্জা সারওয়ার হোসেন

ইসলাম নগর, ঠাকুরগাঁও।

আমি তিন গোয়েন্দার ভক্ত। অনেক বই পড়েছি তিন গোয়েন্দার। সম্প্রতি 'নির্জন উপত্যকা' শেষ করলাম। এরকম একটি উত্তেজনাকর ও সুন্দর বই দেবার জন্য নওয়াব আঙ্কেলকে অনেক-অনেক ধন্যবাদ।

★ তোমার ধন্যবাদ পৌঁছে গেল নওয়াব আঙ্কেলের কাছে।

মোঃ রেজুয়ানুল ইসলাম

খাগডহর (ঘুটি), মদীনানগর, ময়মনসিংহ।

তি.গো. লেখক ও পাঠকবৃন্দ সবাইকে জানাই একরাশ তাজা ফুলের শুভেচ্ছা। আমি তিন গোয়েন্দার একজন সম্পূর্ণ সুস্থ পাঠক। আমি তিন গোয়েন্দার কাছে একটি সমস্যার কথা বলব, দয়া করে সমাধান জানাবেন।

আমাদের স্কুলের তিনজন ছাত্র মিলে তিন গোয়েন্দার বই সংগ্রহ করছি। আমরা স্কুলে বই এনে একে অন্যকে দিতে গেলে আমাদের ক্লাসের কিছু ছেলে বই কেড়ে নেয়। আমাদের একেক জনের বাড়ি দূরে দূরে অবস্থিত তাই বাধ্য হয়েই বই স্কুলে আনতে হয়। আর তখনই ঘটে বিপত্তি। এ সমস্যা সমাধানের উপায় আমাকে জানাবেন।

★ মুসা আমান জানিয়েছে—কেবল তিন গোয়েন্দার সুস্থ পাঠক হলে চলবে না, স্বাস্থ্যবানও হতে হবে। তা হলে বই কেড়ে নেয়ার সাহস হবে না কারও।

আরিফুর রহমান বাদল

কাঁঠাল বাগান কলোনি, লাকসাম, কুমিল্লা। মোবা: ০১৭২২৪৩২৫৮৬।

বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এই চিঠিটা লেখা। নির্জন উপত্যকার মোহনাকে বলছি—তোমার চিঠিটা আমার খু-উ-ব ভাল লেগেছে। মনের মাঝে কেমন যেন একটা অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছে। তুমি বন্ধু চেয়েছ, কিন্তু পূর্ণ ঠিকানা ব্যতিত কেউ তোমার বন্ধু হবে কীভাবে? আর আমার মতে, অনেক ক্ষেত্রে ছেলেরাও ভাল বন্ধু হতে পারে। বেশ

কয়েকবার আমিও বন্ধু চেয়েছিলাম আ.বি.-এর মাধ্যমে। মোটামুটি সাড়াও পেয়েছি। অনেকে ফোন করে, চিঠি লেখে। কিন্তু সেসব চিঠি কিংবা ফোনে বন্ধুত্ব করার আগ্রহের চেয়ে মজা করার আগ্রহই বেশি দেখা যায়। সবচেয়ে বড় কথা হলো, যাচাই করার পর দেখা যায় তারা শুধুমাত্র মজা পাওয়ার জন্য তি.গো. পড়ে। তি.গো.কে অনুভব করে না। তি.গো. তাদের কাছে বইয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অস্তিত্বের মাঝে নয়। কিন্তু তোমার মাঝে অর্থাৎ তোমার চিঠিতে আমি সেই অনুভবটা খুঁজে পেয়েছি। কিছু মনে কোরো না। তুমি মেয়ে বন্ধু চেয়েছ তারপরও আমি আমার বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিলাম। যদি আমাকে তোমার বন্ধু হওয়ার যোগ্য ভাবো তবে যোগাযোগ কোরো। চিঠিতে পূর্ণঠিকানা ও মোবাইল নং দুটোই দিলাম। তবে নিশ্চয়তা দিচ্ছি বন্ধু হিসেবে খারাপ নই আমি। আমি H.S.C সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি। মোহনার মত তি.গো.-এর সত্যিকার পাঠকদের জন্যও আমার বন্ধুত্বের হাত বাড়ানোই রইল। শর্ত একটাই—প্রথমে তি.গো.কে ভালবাসতে হবে। কাজীদা, মুনীমের 'সেবা এন্টারটেইনমেন্ট ক্লাব' গঠনের প্রস্তাব ভালই মনে হচ্ছে। কী বলেন?

একটা প্রশ্ন—অনীশ দাস অপুর 'সম্পূর্ণ ভৌতিক উপন্যাস' 'ভয়াল রাত' কি বেরিয়েছে? আর বেরুলে সেটার দাম কত?

☆ দামের কথা কী বলব, বইটার নামই তো শুনিনি।

নাবিল মুহতাসিম

রোড নং ১/১, বাসা নং ৪/১ আশরতপুর, চকবাজার, রংপুর।

আমার মতে সেবার সেরা কিশোরোপযোগী বইগুলো হচ্ছে–

১. **তিন গোয়েন্দা:** তিন গোয়েন্দা, মহাকাশের আগন্তুক, খুন! অথৈ সাগর, রত্নের সন্ধানে।

২. **তিন বন্ধু:** পাগলের গুপ্তধন, বিড়ালের অপরাধ, ভিনদেশী রাজকুমার।

৩. **গোয়েন্দা রাজু:** সাবাস!, চকলেট কোম্পানী।

৪. **রোমহর্ষক:** পলাতক, নিরুদ্দেশ।

৫. **কিশোর হরর:** পাশের বাড়ির ভূত, অলৌকিক শক্তি।

বি.দ্র.: এটা আমার একান্তই নিজের মতামত। পাঠক বন্ধুরা, এবার তবে একটু হাসো।

কৌতুক: নির্বাচনী প্রচারণা শেষে বাড়ি ফিরে ভৃত্যকে জননেতা বললেন, 'গা-হাত-পা ব্যথা হয়ে গেছে, একটু টিপে দে।'

'হুজুর, চিল্লাইয়া আপনের গলাডা ব্যথা হইয়া গেছে, ওইডাই না হয় টিপ্প্যা দেই,' ভৃত্যের উত্তর।

উত্তর: ১. ঝামেলা, ২. ব্রাউন্সভিলে গণ্ডগোল, ৩. মেরিয়ান পাশা ও ৪. বাংলাদেশে তিন গোয়েন্দা।

কিশোর থ্রিলার
ভলিউম-৯৩

তিন গোয়েন্দা

পিশাচের আস্তানা: শামসুদ্দীন নওয়াব

অদৃশ্য জিনিসটা টক-মিষ্টি দুর্গন্ধ ছড়ায়, তাড়া করে কিশোরকে। কিন্তু একথা কে বিশ্বাস করবে? কেউ না। তবে রবিন করল। তার কারণ, ও দেখেছে জিনিসটাকে। ফিফথ অ্যান্ড অরচার্ড স্ট্রীট থেকে একে একে হারিয়ে যাচ্ছে বাচ্চারা। ফলে, হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারল না তিন গোয়েন্দা। নিতেই হলো জীবনের ঝুঁকি।

উড়ন্ত রবিন: শামসুদ্দীন নওয়াব

ক্যালিফোর্নিয়ার উত্তর সীমান্তে পাহাড় অঞ্চলে বেড়াতে গেল তিন গোয়েন্দা ও ফারিহা আঙ্কেল ডিক কার্টারের এক আত্মীয়র খামার-বাড়িতে। ওখান থেকে ঘোড়ায় চেপে চলল ওরা বিখ্যাত প্রজাপতি-উপত্যকা দেখবে বলে। কিন্তু পথ হারিয়ে চলে গেল আরেক দিকে। তারপর? রবিনকে বন্দি করে নিয়ে গেল এক লোক পাহাড়ের অভ্যন্তরে। যে-পাহাড় থেকে লাল রঙের ধোঁয়া বেরোয়। হঠাৎ ঘিরে ধরল ওদের একপাল নেকড়ে!

অন্য ভুবনের কিশোর: শামসুদ্দীন নওয়াব

কিশোরদের পাড়ায় এসেছে বিচিত্র এক পরিবার। তাদের রয়েছে কিশোরের বয়সী এক ছেলে– রিচি। আঙুল লম্বা করতে পারে সে, পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়ায় এক ধরনের আঠাল পিণ্ড, যার ভয়ে বুলির মত মারকুটে ছেলেও কাবু। অন্ধকার দেশ থেকে নাকি এসেছে রিচিরা। কারা ওরা? কেন এসেছে রকিবিচে? কোনও ক্ষতি করে দেবে না তো তিন গোয়েন্দার?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০